শারদীয়

ভাণ্ডার

১৪০৭

এবারে আপনার জন্য আরও ৪টি আকর্ষণীয় স্কিম

বাড়ী তৈরীর জন্য ব্যক্তিগত ঋণ	ওয়াশিং মেশিন, টিভি ইত্যাদি কেনার জন্য	এন. এস. সি. এবং কে. ভি. পি. ইত্যাদি রেখে ঋণ	সোপান সঞ্চয় প্রকল্প
গৃহপ্রবেশ নির্ভাবনায়	মন খুলে কিনুন টাকা দেবে ব্যাঙ্ক	হঠাৎ প্রয়োজনে চটজলদি ঋণ	বেশী সুদ সঙ্গে বীমার সুরক্ষা

চলে আসুন আপনার একান্ত আপন ব্যাঙ্কে

■ সহজ কাগজ দ্রুত ঋণ— চটপট গৃহপ্রবেশ

মেরামত সম্প্রসারণের
পরিকল্পনা মাফিক কিস্তিতে
মাত্র ১% সুদে মেয়াদে বন্ধকি ঋণ

■ কিনুন আপনি— টাকা দেবে ব্যাঙ্ক

ব্যক্তিগত ভাবে কিনতে পারেন ওয়াশিং মেশিন থেকে শুরু করে ক্যামেরা, কিচেনার, টেলিভিশন, মিউজিক্যাল সিস্টেম প্রভৃতি।

■ সঞ্চয় সঙ্গে বীমা সুরক্ষা— বিনা খরচে

S. B. A/c-এ সবচাইতে বেশি সুদ দেওয়া ছাড়াও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা যুক্ত **SOPAN DEPOSIT SCHEME**-এ মাসোপরি মাত্র ৫,০০০ টাকা রেখে একলক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমার ব্যবস্থা।

■ হঠাৎ প্রয়োজন— তৎক্ষণাৎ ঋণ

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট, কিষাণ বিকাশপত্র, লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি জমা রেখে ৭৫% পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাবার সুযোগ

বিস্তারিত জানতে ব্যাঙ্কের হেড অফিস, কলকাতা, কোচবিহার, উঃ ২৪ পরগনা, ২৪ পরগনা শিলিগুড়িতে যে কোন শাখায় আসুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

২৪এ, ওয়াটারলু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

দূরভাষ : ২৪৮-৮৪৯১/৮৪৯২/০৮৭৪/৮৬৯২/১৭২৮

P 10,242

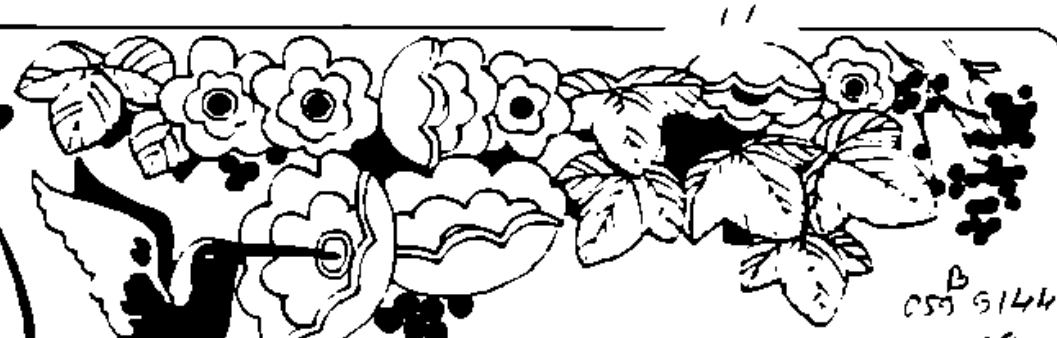

CSB 5144
B 409

সূচীপত্র

বিষয়সূচি

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত ঃ ১৩২৪ বঙ্গাব্দ / ১৯১৮খ্রিস্টাব্দ
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর — যুগ্ম সংখ্যা, ২০০০

সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ
শিশির গুপ্ত
বাপ্পা রায়
সুভাষ রাহা
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু
অম্বিকাচরণ দত্ত

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কণক মুখোপাধ্যায়
ছোটদের পৃষ্ঠার
কম্পিউটার অলঙ্করণ : প্রসেনজিৎ সিনহা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

উপন্যাস

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

মহাসিন্ধুর কথকতা

নজরুলের পত্র বিতান

মেয়েদের মত ছেলে ঘর
ছেলেদের মত মেয়ে

'শেষ'-এর কবিতা

ছোটদের পাতা

ভ্রমণ

আমার ইউরোপ ভ্রমণ — নন্দিতা রায়

গল্প

ভূত	: ড. নজরুল ইসলাম	১৫
হলুদ পাখির পালক	: ডা. দেবপ্রিয় মুখার্জি	
স্পন্ডেলাইটিস	: বিনোদ লাহিড়ী	
অসুখ	: অশোককুমার হাইত	
আশ্রয়	: কিতীশ সাঁতরা	১৪৯
বৈষ্ণবাপুরাণ	: সুব্রত বসু	১৮৩

খেলাধূলা

সফল ফুটবল সফর : এবার ভারত নতুন পথের যাত্রী	: শ্যামসুন্দর ঘোষ	১৩৩

রম্যরচনা

জলছবি	: নব্য লেখিকা	

রঙ্গকৌতুক

একটি বাংরেজি চিঠি	: বাসুদেব মুখার্জি	১৯৩

কবিতা

মানুষের মন	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১১৭
গান্ধী ও মানুষ	কৃষ্ণ ধর	১১৭
সম্পর্ক রেখা	প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ	১১৮
কথা ছিল-পূর্ণবার	সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৮
রীতি	মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	১১৮
আঁধার নয়ন	বীরেন সাহা	১১৯
একলা খেলা	: মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	১১৯
জাতক	: কমানী দাস	১২০
"ডাগ"	: উর্মি দে	১২০
মানুষ সব দেখছে	দীপেন রায়	১২০
কুয়াশা	অরুন ঘোষ গুজরা	১২১
তাকে খবর পাঠানো দরকার	: অসিতবরণ নাথ	১২১
নতুন আকাশ	: গৌতম ব্রজবাসী	১২১
যাই	: অমিতাভ দাস	১২২
তিনি	: শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	১২২
'দুরাবস্থা'	: কিরণশঙ্কর মৈত্র	১২২
"সূর্য ঠাকুর ওঠ, সূর্যঠাকুর ওঠ" ডাক ভেসে যায়	: অপরাজিতা গোরী	১২৩
কবিতার মুখ	: কাজি মুরশিদুল আরেফিন	১২৪
রূপকথা	: বরুণ মাইতি	১২৪
লজ্জা	: প্রবীরকুমার সামন্ত	১২৫
গভীরতা	: লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ	১২৫
পথ	: অজিত বাইরী	১২৫
অবিশ্বাস্য	: অলক জানা	১২৬
কল্পনায় তুমি	: সুজিত হালদার	১২৬
সততা	: বাসুদেব চাটার্জি	১২৬
অনুশ্লেষ	: করবী ঘোষ	১২৭
পা রাখলেন প্রাঙ্গণে	: প্রদীপকুমার ঘোষ	১২৭

শারদ শুভেচ্ছা

শারদোৎসব উপলক্ষে ভান্ডার পত্রিকার সকল পৃষ্ঠপোষক, কর্মীবৃন্দ, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহক, লেখক ও পাঠকবর্গকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি ও অভিনন্দন।

— সম্পাদকমণ্ডলী
ভান্ডার

দখিনা বাতাস পাততাড়ি গুটিয়ে যাবেই চলে, তোড়জোড় চলছে। উত্তুরে হাওয়ার দল আসবে বলে তৈরি হয়েছে। আদি জননীর বাঁশি বাজবে তাই অপেক্ষা। আদিমাতার কাছে আমাদের নালিশ আছে। মেঘেরা কোথায় লুকিয়েছিল। মায়ের আঁচলের আশ্রয়ে ছিল নাকি।

অন্তরের আকুলতায় আদি জননীকে ডেকেছি। কেউ জানে না আদি জননী কেউ আছে কি নেই। তাও আদি জননীকে ডেকেছি বারবার। আমরা মাকে ডেকেছি, না মায়ের ডাকে আমরা সাড়া দিয়েছি কে বলে দেবে।

রাগ কোরো না, এর বেশি তো আর পারবো না। তুমি তো একা নও। আমার তো ইচ্ছে করে ওরাও একটু আনন্দ পাক। দেখতে দেখতে ওদের আনন্দটুকু ক'দিনেই মিলিয়ে যাবে। তারপর! আবার আসছে বছর। ওদের ঐ এক টুকরো আনন্দ বছরে একবার দেখবার ইচ্ছা কেমন যেন বিলাসিতা নয় কি? নেশাও হতে পারে। থাক ওদের কথা, আর ভাবব না। বেশ আছি।

ওদের গায়ে সেঁটেছে সাক্ষরের ছাপ। তাও দিনান্তের রোজগারটুকু ভোর না হতেই ফুরিয়ে যায়। খাদ্য না দিয়ে ওদের হাতে অস্ত্র দিতে পারি, বলতে পারি এগিয়ে যাও, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। ক্ষুধার জ্বালা সয়ে ওরা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আর একজনের ক্ষুধার জ্বালা চিরদিনের জন্য শেষ করে দিতে। অর্ধভুক্ত আর নিরন্নদের এ লড়াই, বাঁচার লড়াই। ওদের বংশধরেদের অন্তত দুবেলা অন্ন জুটবে। ওরা তাই জেনেছে।

এত ভাবনা ভাবতে আর ভাল লাগে না। চল কোথাও বেড়িয়ে আসি। কিন্তু এ কি?

"কোন্ বেলা ব্রাকি ছুটে এল আঙিনায়।"

আজকের সূর্যোদয় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের নতুন প্রত্যয়

দীর্ঘ দুই দশকের ঐতিহ্য বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে নতুন মাত্রা আনার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কলকাতা মহানগরী সহ রাজ্যের সবকটি শহরেই যানবাহনের গতি বাড়াতে শুরু হয়েছে সুষ্ঠু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি চওড়া করা ও মেরামতির কাজ। তৈরি হচ্ছে একাধিক উড়ালপুল ও সাবওয়ে। ফুটপাথ হচ্ছে দখলমুক্ত, ড্রেনেজ সাফাই হচ্ছে নিয়মিত, দূষণরোধে নেওয়া হচ্ছে সঠিক ও কঠোর ব্যবস্থা।

এছাড়াও শহরমুখী মানুষের সামাল দিতে গড়ে তোলা হচ্ছে কলকাতার কাছেই নতুন এক উপনগরী। বনসৃজন ও সৌন্দর্যায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে কলকাতা সহ রাজ্যের সবকটি জেলা শহরকে সাজিয়ে তোলারও ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনে আমাদের এই প্রচেষ্টা শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ -

ডাকঘর

মাসিক আয় প্রকল্প

এখন একক নামে তিন লক্ষ এবং যুগ্ম নামে ছয় লক্ষ টাকা পর্যন্ত জমান যাবে

সুদের হার ১১% • মাসে মাসে দেওয়া হয়
৬ বছরের মেয়াদ শেষে ১০% বোনাস
কোন বাজারগত ঝুঁকি নেই

যে কোন বিভাগীয় ডাকঘরে পাশবই খোলা যায়

প্রয়োজনে ১ বছরের পর থেকে টাকা তোলা যাবে, যদি ৩ বছর বা তার পরে টাকার সদ্ব্যবহার হয় তবে তোলার দিন পর্যন্ত ১১% সুদ সমেত সমস্ত টাকা ফেরৎ

স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[illegible]
অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয়, বাইটস বিল্ডিংস, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

তথ্য ও সংস্কৃতি - ৩৪০৩/২০০০

বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য
পঞ্চায়েতের অনুকূলে ক্ষমতা ও সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এক অনন্য নজির গড়ে তুলেছে। প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় মানুষের সহায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাজকর্মও আরও গণমুখী হয়ে উঠেছে। গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তিন্তর পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং তপশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডব্লু সি এ - ৩৩৭২/২০০০

প্রবন্ধ

ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি

সুনীল ঘোষ

হিটলারের পতনের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরও জার্মানিতে আবার নাৎসিবাদ আশঙ্কাজনকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এরা এখন রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ, দেশের বিভিন্ন অংশে এদের শাখা-প্রশাখা ক্রমবিস্তার লাভ করছে। উগ্র জাত্যাভিমানের বুলি আউড়ে কট্টর নয়া নাৎসিপন্থীরা বিদেশিরা, বিশেষ করে ওদেশে যারা ব্যবসা অথবা চাকরি করছে তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে প্রাথমিকভাবে বেছে নিয়েছে। এদের সংখ্যার সঠিক হিসাব এখনও ওদেশের কর্তৃপক্ষ করে উঠতে পারেনি, অথচ এদের সামাজিক প্রভাবও বাড়তির দিকে।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের মতে এদের মধ্যে প্রায় ৯০০০ উগ্র চরম দক্ষিণপন্থী, যারা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। এর থেকে প্রমাণ হয় যে এই নয়া নাৎসিদের সংখ্যা আগের বছর থেকে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জার্মানির মোট জনসংখ্যা ৮০ মিলিয়নের মত। সেই তুলনায় এই সংখ্যা একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও তাদের কার্যকলাপের দ্বারা তারা সমগ্র দেশে যথেষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে। এর থেকেও বেশি তাদের উপস্থিতি এবং অবস্থান বিশ্বসমাজে জার্মানির ভাবমূর্তিকে প্রভূত পরিমাণে কলঙ্কিত করছে।

জাতীয় নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী এই নয়া নাৎসিদের বিচরণক্ষেত্র পূর্বতন কমিউনিস্ট শাসিত পূর্ব জার্মানিতে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, জার্মানির এই অংশের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসমষ্টির এক-পঞ্চমাংশ হলেও এখানে বেকারত্বের উচ্চ হার এবং তীব্র দারিদ্র্যের কারণে এই অঞ্চলই নাৎসিবাদের কাজকর্মের উর্বরভূমি হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। অশিক্ষিত পরিব পরিবারের সন্তানরাই মূলত এই হিংসোন্মত্ত দক্ষিণপন্থার সদস্য-সমর্থক, যদিও বৌদ্ধিক গোষ্ঠীর একাংশে — লেখক অথবা ফিল্ম প্রস্তুতকারকও এই পথের সমর্থক। এদের সংখ্যা বেশি না হলেও এরা চলনে-বলনে নয়া নাৎসি জীবনযাত্রার কায়দায় অভ্যস্ত এবং জার্মান সমাজে এরা বেশ অস্থিরতা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। এরা সরাসরি প্রতিষ্ঠানবিরোধী এবং বিদ্যমানের গণ্ডিকে অস্বীকার করে চলতে চায়। এরা কালো চামড়ার পোশাক ও কালো জুতো পরে। নস্তক হয় মুণ্ডিত নয়তো খুব ছোট করে ছাঁটা চুল। এদের উপদ্রবে অতি সম্প্রতি জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডারকে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে স্বীকার করতে হয়েছে যে, এদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকজন জার্মান সাংসদ দাবি করেছেন যে, নাৎসিবাদী অপরাধমূলক কাজকর্মে শাস্তি দেবার জন্য অতি দ্রুত বিচারকার্য সমাধা করতে বিশেষ আদালত স্থাপন করতে হবে। চ্যান্সেলর বলেছেন, "চরম দক্ষিণপন্থী হিংসাত্মক কাজকর্ম বন্ধ করবার জন্য আমাদের পুলিশ প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থাকে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবার জন্য তৈরি করতে হবে।" সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে নয়া নাৎসিবাদীরা ইহুদিদের সমাধিক্ষেত্রগুলির পবিত্রতা নষ্ট করেছে এবং বিদেশিদের উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। এই বিদেশিদের মধ্যে আফ্রিকান এবং তুর্কীরাই বেশি সংখ্যক।

প্রাক্তন টেনিস তারকা বরিস বেকার এবং সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিও নাৎসিরা সামাজিক সুস্থিতি নষ্ট ও রাজনৈতিক হেনস্থার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সমাজবিরোধী ও অসামাজিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে বন্ধের জন্য প্রচারাভিযান অনুষ্ঠিত করছেন। এর প্রভাবে অতি সম্প্রতি নিও-নাৎসিদের সুপ্রিম কোর্টের সামনে অনুষ্ঠিতব্য একটি বিক্ষোভ সমাবেশকে জার্মান পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ জার্মান ডেমোক্রেটিক পার্টির হিটলারবাদী প্রচারের ওয়েবসাইটও বেআইনি ঘোষণা করে বন্ধ করে দিয়েছে.

বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ব জার্মানির অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ঐ অংশের সামাজিক সমস্যাগুলিতে ইন্ধন জুগিয়ে চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির দক্ষিণপন্থী সরকার সি আই এ রচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব জার্মানিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারকে তুঙ্গে তুলে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে মিশে গেলে সুখের দিন ফিরে আসবে এই স্বপ্ন দেখিয়ে পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করে পশ্চিম জার্মান সরকারের নেতৃত্বে দুই জার্মানির মিলন ঘটিয়েছিল প্রায় এক দশক আগে। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়েছিল দক্ষিণপন্থী সরকারের নেতৃত্বে তাদেরই অযোগ্যতার সুযোগে চরম দক্ষিণপন্থা এখন সমগ্র জাতিকে গ্রাস করতে চাইছে।

এবারে আসুন আমাদের দেশের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। হিন্দুত্বের কথা উড়িয়ে যে কে পি কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতা দখলের পর থেকেই দেশের অর্থনীতিতে অতি দ্রুত নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রতি বছর এক কোটি বেকারের চাকুরির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিরক্ষা তো দূরের কথা, বেকার বাহিনী ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে উঠছে। এই বেকার যুবকদলের রোষ যাতে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-গোষ্ঠীর উপর আছড়ে না পড়ে তার জন্য নানা ছল-চাতুরি-কৌশল অবলম্বন করছে শাসক-জোট, যার বেশ কিছু ফ্যাসিস্টসুলভ। ফান্ড-ব্যাঙ্ক-ডব্লিউ টি ও নির্দেশিত রাস্তায় অতি দ্রুত হাঁটছে জোট সরকার — কত কম সময়ের মধ্যে দেশের সম্পদ বিদেশি হায়র কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দিয়ে প্রভুত্বের সন্তুষ্ট করা যেতে পারে তার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। এই সম্পদগুলির অধিকাংশই ভারতের স্বনির্ভরতার প্রতীক। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সীমাহীন দারিদ্র, কর্মচ্যুতি ও কর্মহীনতা। কল্পনা করা যায় না, যে ডার্লিন ডলারের দাম ১৩-১৪ সালে ছিল ৩১ টাকা, তা এখন দাঁড়িয়েছে ৪৬ টাকায়, আর আমাদের জল পরিশোধ করতে হয় ডলারের হিসেবে। খুব সুসংহতভাবে না হলেও দেশের বিভিন্ন অংশে এর বিরুদ্ধে গড়ে উঠছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ; আর এইসব কর্মসূচি রূপায়ণে কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীনে দেশের বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বলগুলি জোটবদ্ধ হচ্ছে। খোলা জানালা অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ এক অধিকাংশেরই মোহমুক্তি ঘটিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধ যাতে গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য জনসাধারণের নজর অন্যদিকে ঘোরানোর পরিকল্পনাও প্রস্তুত। প্রাথমিকভাবে খুব তীব্র না হলেও এইসব পরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ যেভাবে ঘটেছে বা ঘটছে তার মধ্যে ফ্যাসিস্ট উপাদান বেশ ভালরকমই দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৩৩-৩৬— এই চার বছরে হিটলার তৎকালীন জার্মান জনগণের জাতীয় অবমাননা ও চরম আর্থিক দুরবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধাপে ধাপে রাষ্ট্র ক্ষমতা করায়ত্ত করে। এই সময় তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানির ইহুদি সম্প্রদায়, কেন তারাই জার্মান জাতির দুর্দশার কারণ। এর পরের ধাপে অবশ্যই যুক্ত হয় কমিউনিস্ট ও সোস্যাল ডেমোক্রাটরা। এই টার্গেটের অর্থ হচ্ছে ইহুদি ও কমিউনিস্টদের দেশ থেকে বিতাড়ন অথবা দলবদ্ধভাবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রেরণ এবং অবশেষে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে নিধন। আমাদের দেশের প্রধান শাসকদল শাসন ক্ষমতায় যাবার আগেই হিন্দুত্বের জিগির তুলে শতাব্দী-প্রাচীন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেশে সাম্প্রদায়িক দাবানল সৃষ্টি করে, যার সবচেয়ে বীভৎস চেহারা দেখা গিয়েছিল মুম্বই শহরে এবং মহারাষ্ট্রে। বিচার বিভাগীয় তদন্তে দোষী প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ এবং আদালত এই দাঙ্গার নায়কের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের শাস্তিস্বরূপ নির্বাচন কমিশন তার ভোটাধিকার কেড়ে নিলেও বারবার সাম্প্রদায়িক হুমকি ছাড়া সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার। শাসক দল গান্ধী হত্যাকারী উগ্রদল ও তার সহযোগী সংগঠনগুলিকে দেশে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিয়েছে। তারা গত কয়েক মাস যাবৎ ভারতীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় ও যাজকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছে। এদের আক্রমণ রাজ্য থেকে রাজ্য স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে — গুজরাট, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, কর্ণাটক, গোয়া, আসাম, কেরালা — এই তালিকা ক্রমপ্রসারমান। অতি বাপকভাবে এইসব নৃশংস কার্যকলাপ চালিয়ে গেলেও প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের পৃষ্ঠপোষক সঙ্ঘপরিবারের কোনো দোষ দেখতে চাইছেন না। জোর করে অথবা টাকা-জমির লোভ দেখিয়ে এরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক সংখ্যক খ্রিস্টান আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করছে। হিন্দু মৌলবাদী ধর্মগুরুরা পরামর্শ দিচ্ছেন এইসব ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য আলাদাভাবে 'শুদ্ধিক মন্দির' নির্মাণ করে দিতে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ঘৃণ্য প্রচারাভিযান চলছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবরি মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর রামমন্দির বানাবার সঙ্কল্পও ঘোষিত হচ্ছে। এই মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নৃশংস অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে কেন্দ্রের প্রধান শাসক দলের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন মদতে। কিন্তু সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী সরকার এর পেছনে বিদেশি (পাকিস্তানী) হাত দেখতে পাচ্ছেন এবং এ-সবই বিজেপি পরিচালিত সরকারকে বিশ্বের দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে। অথচ এদেরই একাংশ জঙ্ঘন্য খুনি দারা সিং-কে জাতীয় বীরের আখ্যায় ভূষিত করছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা ফ্যাসিবাদেরই নামান্তর। মৌলিক সমস্যার নিরসনে যাতে সমাজের নির্যাতিত, অত্যাচরিত এবং অবহেলিত অংশ যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তার জন্যই ধর্মীয় বিভাজন।

হিটলার ক্ষমতা করায়ত্ত করবার পর অতি দ্রুত জার্মানির গণতান্ত্রিক সংবিধানকে বিসর্জন দিয়ে নাৎসিবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে নয়া সংবিধান প্রণয়ন করে। ইতিহাসের কি পুনরাবর্তন হচ্ছে না যখন দেখি কেন্দ্রের জোট সরকার সংবিধান পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান পর্যালোচনার জন্য কমিটি তৈরি করে? তথাভিজ্ঞ মহল আশঙ্কা করছেন, কেন্দ্রের এই উদ্যোগ ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করবার জন্য। দ্বিতিশীলতার স্বার্থেই নিয়ে সরকারের যুক্তি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা সংসদে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা হারালেও সেই সরকার ক্ষমতায় থেকে যাবে। লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন করা যাবে না। দ্বিতিশীলতার নামে এ তো এক নতুন অস্থিরতার জন্ম দেওয়া। প্রশ্ন তোলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে কেন? স্বাধীনভাবে নিজস্ব ধর্মাচরণের অধিকার ছাড়া ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আর কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করে না ; তবুও এই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ভারতকে হিন্দু মৌলবাদী রাষ্ট্র বানানোর উদ্দেশ্যেই। সংবিধান সংশোধন করতে পারে একমাত্র সংসদ, অথচ কমিশন গঠনে সংসদকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে। বুঝে নিন চক্রান্ত কত গভীর!

কেন্দ্রের শাসকদলের আরও একটি গুপ্তকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র দেশ। শিক্ষার গৈরিকীকরণ, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে আর এস এস-কে সরাসরি প্রশাসনে অনুপ্রবেশ করবার সুযোগ করে দেওয়া। সংসদ এবং সংসদের বাইরে তুমুল প্রতিবাদের ফলে সরকারকে সাময়িকভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে বটে, তবে কেবলমাত্র সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায়। কারণ, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় করতে না

পারলে ফ্যাসিস্টসুলভ কর্মসূচি রূপায়ণ সম্ভব নয়।

বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকারের সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত পথে অর্থনীতি পরিচালনা, হিন্দুত্ব ফিগিরের আড়ালে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং অন্যান্য অগণতান্ত্রিক অবৈজ্ঞানিক ও অসামাজিক কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে প্রকৃত বাধার সৃষ্টি করছে বামপন্থী শক্তিগুলি। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বিজেপি-র সঙ্ঘ পরিবার উভয়ের সিদ্ধান্তই একই জায়গায় পৌঁছেছে এবং তা হল বামশক্তিকে স্তব্ধ করতে না পারলে তারা বিনা বাধায় তাদের জনস্বার্থবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না। তাদের নীল নক্সা তৈরি হয়ে গেছে রাজ্যে রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সহায়তায় বামপন্থী কর্মীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো এবং প্রয়োজনে তাদের হত্যা করা। বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, কেরালায় এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় বাম-পরিচালিত সরকারগুলিকে উৎখাত করতেই হবে, কেননা এরাই মূলত সর্বভারতীয় বাম আন্দোলনগুলির উৎসস্থল। ত্রিপুরায় এরা একদিকে নজর দিচ্ছে উগ্র জঙ্গী সংগঠনগুলিকে, যারা বাম কর্মী ও নেতাসহ সময়ে সময়ে নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে প্রাণহাড়া করছে ; অন্যদিকে রাজ্যসরকারের বারংবার অনুরোধ ও দাবি সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সংখ্যক সামরিক অথবা আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করছে না কেন্দ্রীয় সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এরা বেছে নিয়েছে এক অভিনব কৌশল। সবাই জানে যে, পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের শক্ত ঘাঁটি কৃষক অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল, কারণ 'অপারেশন বর্গা'র সাফল্য। প্রতিক্রিয়ার শক্তি এই সাফল্যের জায়গাতেই আঘাত হানছে এবং প্রাথমিকভাবে কিছু সাফল্যও লাভ করছে। জমিচ্যুত জোতদার গোষ্ঠী, গ্রামীণ এলাকার খুনি-ডাকাত গোষ্ঠী এবং কিছু বেকার যুবককে একত্রিত করে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র এবং হাতে গুঁজে দিয়েছে কিছু টাকা। তাদের লেলিয়ে দিয়েছে জমিপ্রাপ্ত কৃষকদের বিরুদ্ধে। এরা বামপন্থীদের খুন করছে, ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রামছাড়া করছে চাষি পরিবারগুলিকে। পুলিস ছিল মেটামুটি নিষ্ক্রিয়। বুঝতে কষ্ট হয় না কিসের বিনিময়ে পুলিশকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা যায় অথবা স্বপক্ষে আনা যায়। যেখানে পুলিশ-প্রশাসন কিছু সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে সেখানে তাদের উপরও এই খুনে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সাংসদের একটি উপনির্বাচনে জিতিয়ে করে ওরা কায়েম করেছে এবং আগামী নির্বাচনেও ওদের লাইন এটাই হবে বলে সদম্ভ ঘোষণা করছে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওদের নেত্রী ও নেতারা ভোটে নির্বাচন জিতেছেন সেই লাইনের কথা ওঁরা বলছেন না। এই জাতীয় ফ্যাসিস্টসুলভ কাজে ওরা **[illegible]** নিরীহ, নিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গোষ্ঠীর এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলির। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে যে দেদার অর্থের প্রয়োজন তা আসছে বিদেশ থেকে, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে, বাকিটা জোর জবরদস্তি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে। বাইরের শক্তি এ ব্যাপারে যে কতটা আগ্রহী এবং সক্রিয়ভাবে যুক্ত নানুরের ঘটনায় কলকাতাস্থিত মার্কিন কনসাল জেনারেলের ভূমিকা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু অঞ্চলে এইরকম নজিরবিহীন সন্ত্রাস সৃষ্টির পর ওরা এখন নজর দিয়েছে উত্তরবঙ্গের দিকে। মৃতপ্রায় কামতাপুরী আন্দোলন আবার সক্রিয় হয়ে খুন-খারাপি শুরু করেছে। দক্ষিণবঙ্গের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তিগুলি উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় ওরা ওখানে কৌশল পাল্টেছে, কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সেই বামপন্থী নেতা ও কর্মীরা এবং বাম সমর্থক গ্রামীণ জনসাধারণ। এদের রাজনৈতিক ধ্বনি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের দুটি জেলা নিয়ে পৃথক কামতাপুরী রাজ্য গঠন। এইভাবে ভারতবর্ষের অন্যরাজ্যগুলির মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়, ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অন্যতম একটি উন্নত রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়ার চক্র উঠে-পড়ে লেগেছে। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য বিশেষ একজনকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করতে সং বিধানের ৩৫৬ নং ধারার প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারকে উৎখাত করে নির্বাচন করতে হবে এবং প্রধান শাসক দলকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে ঐ দল নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে না পারে। এজন্য ঐ দুষ্টচক্র ঘোরেকেশীয় কায়দায় প্রতিনিয়তে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সংবাদ মাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের পূর্ণ সহায়তায়, জনসাধারণের মনকে বিষিয়ে দিতে। আর সত্যি বলতে কি সনাতনেরও এক অংশে ঐ বিষ ছড়িয়ে পড়ছেও।

কেন্দ্রের জোট সরকার তার অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক এবং ফ্যাসিস্টসুলভ কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে, সৃষ্টিন জোট কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়েছে এবং বিশ্বের দরবারে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে ; কিন্তু তাতেও তাদের মতিগতির কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এখানে আমাদের বুঝতে হবে শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিক্ষায় জার্মানি ভারতবর্ষ থেকে অনেক গুণ উন্নত এবং একদা সমস্ত জার্মান জাতি ফ্যাসিবাদের চরম শিকার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে যদি ফ্যাসিবাদ পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা জার্মান জনগণের একাংশের মধ্যেও সমর্থন লাভ করে তাহলে বর্তমান ভারতের পটভূমিতে ফ্যাসিবাদের প্রকোপের জন্য কতখানি উর্বর, বিশেষত ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভারতীয় জনগণের নেই, সেটা বুঝতে হবে। আর বুঝতে হবে যে, বর্তমান জার্মান সরকার সে দেশে নয়া ফ্যাসিবাদীদের উগ্র কার্যকলাপ বন্ধে প্রচলিত আইন কাঠামোয় অপরাধীদের প্রতি দ্রুত শাস্তিবিধানের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে আর আমাদের দেশের সরকারের কোথাও প্রত্যক্ষ এবং কোথাও প্রচ্ছন্ন মদতে মৌলবাদী ও ফ্যাসিবাদী তাণ্ডবের ও কার্যকলাপকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাবনেতা, বক্তৃতা এবং বিবৃতি এ বিষয়ে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

তাই সর্বাগ্রে আমাদের দেশের বৌদ্ধিক গোষ্ঠীকে এই বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে হবে, তাদের মিল খুঁজতে হবে জার্মান ঘাঁটি অর্থের ও ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের মধ্যে এবং এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে হবে। এঁদের কলমের জোর ওদের আগ্নেয়াস্ত্রের থেকে বেশি। সক্রিয় রাজনীতির স্তরদের ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করে পাড়ায় পাড়ায়, অফিসে-ক্লাবে জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সজাগ করে প্রতিবাদ প্রতিরোধের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। □

BALAGERIA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

SATMILE :: MIDNAPORE

(A STATE GOVT. PARTNERED 'A' CLASS BANK)

ESTD. 1926

TELE
STD
GRAMS

A BANK

CLOSELY ASSOCIATED WITH THE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT.

OFFERS VARIOUS PLANS TO SUIT YOUR DREAMS AND DESIRES.

TRANSACTS ALL KINDS OF MODERN BANKING.

HAVING LOCKER FACILITIES WITH ALL THE BRANCHES.

11 HOURS SERVICE THROUGH IT'S BRANCHES.

COMPUTER FACILITIES AT HEAD OFFICE, SATMILE.

FAX FACILITY AT CONTAI BRANCH.

SERVICE OPEN ON SUNDAYS AT EVENING BRANCHES.

TO SERVE YOU BETTER, PLEASE STEP-IN FOLLOWING BRANCHES :-

CONTAI	PH. - 55097
NACHINDA	PH. - 50236
DIGHA	PH. - 66241
RAMNAGAR	PH. - 64265
EVENING (CONTAI)	PH. - 55407
PANIPARUL	PH. - 60224
EGRA EVENING	PH. - 44244
DEULIHAT	PH. - 00000
SATMILE	PH. - 52233
BALAGERIA	PH. - 00000

BANK AUTHORITY

মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্সপ্রাপ্ত "এ" শ্রেণীর এবং '৯৮-'৯৯ বর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক হিসাবে ন্যাবার্ড পুরস্কার প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক)

ফোন : ০৩২২০-৭০২২২ ও ৭০২২৩

পরিষেবায় যুক্ত শাখা সমূহঃ মেন (মুগবেড়িয়া), কাঁথি, কলাগেছিয়া, ভগবানপুর, বাজকুল, ইটাবেড়িয়া, জলকা, মাধাখালি (সান্ধ্য), হেঁড়িয়া ও কাঁথি প্রদত্ত ১- সান্ধ্য

(আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য)

- সমস্ত প্রকার আমানতের উপর আকর্ষণীয় সুদের হার।
- আপনার জমা টাকার সমস্তটাই এই এলাকার স্বার্থেই নিয়োজিত।
- আমানত সম্পূর্ণভাবে গোপনীয় ও বিমাদ্বারা সুরক্ষিত।
- স্বর্ণবন্ধকি, এন. এস. সি., কে.ভি.পি.তে ঋণের সুযোগ।
- ধান, পান, মাছ চাষ, গাড়ি, ট্রলার, পাওয়ারটিলার-এ ঋণের সুযোগ।
- চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ীদের ঋণ।
- মেন (মুগবেড়িয়া), কাঁথি, কলাগেছিয়া, ভগবানপুর, বাজকুল, হেঁড়িয়া শাখায় লকারের ব্যবস্থা।
- ন্যাবার্ড রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়।

৭৫ বছরের অধিক পথ পরিক্রমায় এই ব্যাঙ্ক আপনার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে।

শুধু মেদিনীপুর জেলায় নয়
রাজ্যেও
আমরাই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিই
সকাল থেকে সন্ধ্যে।

● সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক
● ভাণ্ডার পত্রিকার আরও প্রসার কামনা করি
● এলাকার কৃষি ও কৃষক ভাইদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে

বীরপালা-মালিপাড়া এস কে ইউ এস লি.

গ্রাম : মালিপাড়া. পোঃ তালান্ডু. হুগলি

শৈলেন্দ্রনাথ পাল — সভাপতি
মনতোষ মোদক — ম্যানেজার
মহাদেব পাল — সম্পাদক

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, স্টেশনারী দ্রব্য
সুলভে ও ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ,
ছাপাখানা ও মুদ্রণের কাজ,
পুলিশ কর্মীদের সেবায় ও
জেলার সমবায় আন্দোলনে যুক্ত :

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স স্টোরস লি.

পুলিশ লাইন, ব্যারাক রোড
চিনসুরা, হুগলি

দি কলিকাতা কর্পোরেশন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

স্থাপিত : ১৯১৬

১নং হগ স্ট্রিট (দ্বিতল), কলিকাতা - ৭০০ ০১৩
ফোন : ২৪৪-৩৪৭১ (এক্স ২৫৪২)

দীঘা, পুরী, দার্জিলিং হলিডে হোমে বেড়াতে চলুন

চৈতন্যপুকুর ক্যান্সার সেন্টার ও ওরেলফেয়ার হোম ও ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক ও হসপিটাল সোসাইটি, সল্টলেক সিটিতে এবং বনগাঁ মিউনিসিপ্যাল স্পেশালাইজড্ হসপিটাল-এ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে।

এক কে এম মুর্শেদ — চেয়ারম্যান
পি রায় — ভাইস-চেয়ারম্যান
পি সি নাগ — সেক্রেটারি
মানিকলাল মুখার্জি — জয়েন্ট-সেক্রেটারি

বাড়াগড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজিঃ নং - ৩১২ তাং ২৫-৯-১৯১৯

সাং : বাড়াগড়. পোঃ ডেবরাবাজার
জেলা : মেদিনীপুর

শাখা অফিস । ডেবরাবাজার
দূরভাষ : ৪৩৫৪৫

সদস্য ও সর্বসাধারণের জন্য কৃতকার্যসমূহ
✲ ব্যাঙ্কিং বিভাগ (এস বি অ্যাকাউন্ট, আর ডি অ্যাকাউন্ট, স্পেশাল এফ ডি অ্যাকাউন্ট, এম আই এস অ্যাকাউন্ট, সি ডি অ্যাকাউন্ট)
✲ স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ দাদন
✲ মধ্যমেয়াদি অকৃষি ঋণ দাদন
✲ বন্ধকি ঋণ দাদন (কেভিপি, এন এস সি, কাঁসা, পিতল, সাইকেল)
✲ রেশন ব্যবসা
✲ ধর্মগোলা ইত্যাদি

সীতারাম চক্রবর্তী — সভাপতি
রামকৃষ্ণ সামন্ত — সম্পাদক
রবীন্দ্রনাথ ওঝা — ম্যানেজার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট থাকুক

❋ ❋ ❋

কামারহাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

❋ ❋ ❋

গ্রাম ও পোঃ কামারহাটী
জেলা ঃ বর্ধমান
রায়না ২ নং ব্লক

গরিব মানুষের মুক্তির পথ, একমাত্র প্রতিষ্ঠান —

বড়বৈনান ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লি.

গ্রাম ও পোঃ বড়বৈনান
রায়না ২ নং ব্লক
জেলা ঃ বর্ধমান

এখানে সকল প্রকার আমানত সংগ্রহ করা হয়।
এছাড়া স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, সব বিক্রয়, কেভিপি প্রেজ লোন, আডভান্স এগেনস্ট ডিপোজিট, ইউনিসিঙ্ক লোন দেওয়া এবং সব ও কীটনাশক সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

ছুটির দিনগুলি কাটান
পুরীর সমুদ্র সৈকতের
হলিডে হোম-এ

❋

নিউ ব্যাঙ্ক স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

❋

প্রবন্ধে : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২০ ১০৭০, ২২০ ০০১৭

জনতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

পোঃ ঈশ্বরদহ জালপাই ● সুতাহাটা ২নং ব্লক ● মেদিনীপুর

হেড অফিস ঃ বাড়সুন্দরা শাখাঅফিস ঃ দক্ষিণচক

"গ্রামীণ অর্থনীতির মূল হাতিয়ার সমবায়"

ব্যাঙ্কিং পরিষেবার মাধ্যমে Savings A/c D/Savings A/c. RD A/c. Fixed ও Cash Certificate Deposit A/c. গ্রহণ করা হয়।

- অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় আমানতের উপর সুদের হার ১/২% বেশি।
- জমা আমানত টাকা "আমানত বিমা প্রকল্প" দ্বারা সুরক্ষিত।
- জমা আমানত টাকার ৪০% টাকা এলাকার উন্নয়নে নিয়োগ করা হয়।
- ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় গত ৬ (ছয়) বছরে আমানতের পরিমাণ প্রায় ১ (এক) কোটি টাকা, লাভের টাকা থেকে সামাজিক উন্নয়নে এলাকার গরিব শিশুকন্যাদের "শিশু বিকাশ প্রকল্প" খাতে ২০ (কুড়ি) জন শিশুকন্যার পিতা/মাতাকে ২০০০ (দুই হাজার) করে প্রত্যেককে মোট ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা দান করা হয়েছে।

মৃগেন্দ্রনাথ মাইতি	প্রজাপতি পাঁজা	শকেরঞ্জন পাঁজা
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

বেনমিল্ক

।। যে নামটি পশ্চিমবঙ্গের দুগ্ধ উৎপাদকদের মনে আশার আলো দেখিয়েছে এবং অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।।

আমাদের সাফল্যের নজির

১	দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সঙ্ঘের সংখ্যা	— ১৩
১	দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সংখ্যা	— ২০২১
১	দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের সংখ্যা	— ২২
১	দুগ্ধাগারের সংখ্যা	— ২
১	গবাদি প্রাণীর সুষমখাদ্যের উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা	— ২
১	দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির সদস্যের সংখ্যা	— ১৩৬৭০৮
১	কৃত্রিম গোপ্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা	— ৬০২
১	তরল নাইট্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা	— ৩

আমাদের লক্ষ্য বাংলার দরিদ্র দুগ্ধ উৎপাদকদের সার্বিক উন্নয়ন — বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে।

আমাদের উদ্দেশ্য — গ্রামের উৎপাদকরা যাতে দুধের ন্যায্য মূল্য পায় এবং শহরের মানুষরা যাতে সঠিক মূল্যে দুধ পেতে পারে তারই সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদকদের ও শহরের মানুষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

আমাদের বিশেষ অবদান

পশ্চিমবঙ্গে মহিলা দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং সুসংগত দোহ উন্নয়ন প্রকল্প সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে গ্রামের দরিদ্র দুগ্ধ উৎপাদকদের, বিশেষত মহিলাদের, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ফেডারেশন লিমিটেড

এল বি-২, সেক্টর - ৩, সল্ট লেক সিটি

কলিকাতা - ৭০০ ০৯১

দূরভাষ : ৩৩৫২৮৬০,২৮৪৪ :: ফ্যাক্স : ৩৩৫২৪৯৬

E-mail : benmilk@cal2.vsnl.net.in

ছোট গল্প

ভূত

ড. নজরুল ইসলাম

সকাল বেলায় উঠে শামু হাতমুখ ধুচ্ছিল। রমজান এসে বলল, "পালের ভুঁইয়ে পানি দিতে হবে।"

"ক্যানে?"

"পাট কাটতে কাটতে একবারে টানিয়ে গেলছে। পানি না দিলে নাড়োল ঢুকবে না।"

"তো যা। লেগা!"

"আমি গেলে হবে না।"

"ক্যানে?"

"ডিস্টিকলের অপ্রেটর ছুটি দিয়েছে। জুটি বলছে, ট্যাকসোর টাকা জমা দিয়েছে কি না জানি না। মাস্টার না বললে হবে না।"

শামু ওরফে শামসুদ্দিন আহমেদ পাশের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। হায়ার সেকেন্ডারি পাস। সম্মানীয় লোক। গ্রামের লোক তাকে বিদ্বান বলে জানে। সম্মান করে। বিবাদ-বিসম্বাদে তার কাছে যায়। বাইরের কোন লোক এলে কথা বলার জন্য তাকেই ডাকে। মাস্টার সেই সব ভদ্রলোকদের সঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। আবার গ্রামের সাধারণ লোকের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। বছরখানেক হল গ্রামের মাঠে গভীর নলকূপ বসেছে। ইংরেজি নাম ডিপ টিউবওয়েল। স্থানীয় লোকের মুখে হয়েছে ডিস্টিকল বা ডিপকল। রমজান তার মাস মাইনের কৃষাণ। স্থানীয় ভাষায় কিসমদ্দান। রমজান বলে ডিস্টিকল।

ডিস্টিকলের অপ্রেটর শামু বোঝে। জুটি বুঝতে পারে না। নলকূপের অফিসে অপারেটরের নিম্নপদস্থ যে কর্মচারী জমিতে জল যাওয়ার তদারকি করে সবাই তাকে বলে জুটি। তাহলে পুরো কথাটা কি ওয়াটার ট্রান্সপোর্টার? সে ভাবল, একদিন তাকেই জিজ্ঞেস করে নেবে। বলল, "আচ্ছা তুই যা! আমি আসছি।"

রমজান কোদালটা কাঁধে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

আজ রবিবার স্কুল বন্ধ। শামুও জলখাবার খেয়ে জলের মাঠের দিকে রওনা হল।

॥ ২॥

পালের ভুঁইয়ের আলে এসে দেখল জমিতে জল ঢুকছে।

শামু বাবার কাছে শুনেছে, জমিটা আদিতে বাজিতপুরের পালেদের ছিল। 'লাঙোল যার, জমি তার' আন্দোলনের সময় ভয় পেয়ে তারা জমিটা বেচে দেয়। তার পূর্বপুরুষরা ভাগে চাষ করত। তারাই কিনে নেয়। জমিটা এখন আর পালেদের নয়, তবু নামটা রয়ে গেছে। পালের ভুঁই। পালের ভুঁইয়ের জন্য আলে রমজান কোদাল হাতে দাঁড়িয়েছিল।

শামু দেখল, রাস্তার ধারের দিকটা নিচু হয়ে আছে। ওখানে জল জমে যাচ্ছে। অথচ উত্তরের দিকটা উঁচু থাকায় জল উঠছেই না। শামু ইশারায় রমজানকে ডাকল। রমজান এসে বলল, "মাস্টার আসছে বুলতেই পানি খুলে দিলা।"

শামু কিছু না বলে রমজানের হাত থেকে কোদালটা নিল। উঁচু জায়গাটা কুপিয়ে নিচু জায়গাটায় ফেলতে লাগল।

রমজান ছুটে এসে বাধা দিল, "আপনি কচ্ছেন ক্যানে? কি কত্তে হবে, আমাকে বুলেন!"

শামু বলল, "হ্যাঁ, তুই-ই করবি। উঁচু জায়গাটা চটিয়ে নিচু জায়গাটা ভরাট করতে হবে। আমি এটু করি। তুই ওদিকটায় যা, যার একটু আছে কি না!"

রমজান ওদিকে চলে গেল। শামু মাটি কোপাতে লাগল।

মাস্টার হওয়ার পর আর তাকে নিজের হাতে চাষের কাজ করতে হয় না। কিসমদ্দান রেখেছে। সে-ই করে। তবে ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে করত। অভ্যাস আছে। এখনও করতে পারে। তাছাড়া মাঠে আসলে জমির সঙ্গে সে কিরকম একটা আত্মীয়তা অনুভব করে। তার কাজ করতে ভাল লাগে। সে উৎসাহ নিয়ে উঁচু জায়গাটা চটিয়ে নিচু জায়গায় ফেলতে লাগল।

খানিকক্ষণ কোপানোর পর তার গায়ে ঘাম দেখা দিল। ক্লান্ত লাগল। আর তখনি তার মেজকাকা মসলেম তার ঘাড়ের ওপর স্নেহের হাত রাখল। তার কাজ থেমে গেল। সে সোজা হয়ে দেখল, কেউ নেই। কি করে থাকবে? সে তো অনেক দিন আগে মারা গেছে। তাহলে কে তার ঘাড়ে হাত রাখল? শামু ভয় পেয়ে গেল। তাহলে সত্যিই কি তাকে ভূতে ধরল? না জিনের হাওয়া লাগল। কিন্তু পুরুষ মানুষের কাছে তো জিন আসে না। পরি আসে। তার কাছে তো ডানাওয়ালা, ডানাহীন কোন পরিই ঘেঁসে না। তা হলে? সে আরও জোরে ঘামতে লাগল।

রমজান ভাবল, মাস্টার মানুষ। একেবারে অকাজের। দু কোপ দিয়েই

দম শেষ। সে এসে মনিবের হাত থেকে কোদালটা নিয়ে নিল। ভাবখানা এমন যে, খুব হয়েছে! এবার চাষে চুমুক দিয়ে ছেলে পড়াওগে যাও!

কুপিয়ে মাটি দূরে সরিয়ে দিতে শামুর পায়ের নীচের জায়গাটা নিচু হয়ে পড়েছিল। জল সব সময় উঁচু থেকে নিচু জায়গায় ছোটে। আশপাশ থেকে জল সবেগে এসে পায়ের পাতা ডুবিয়ে দিচ্ছিল। সে আলের ওপর উঠে দাঁড়াল। রমজান বাকি উঁচু জায়গাটা কোপাতে লাগল।

শামুর মনে পড়ে গেল, তখন সে হাইস্কুলের নীচের ক্লাসে পড়ে। এ জমিটার রাস্তার পাশের নিচু জায়গাটা তখন নয়ানজুলি ছিল। রাস্তা বাঁধানোর জন্য ওখান থেকে মাটি কেটে রাস্তায় ফেলা হয়েছিল। এমনি এক ছুটির দিন সে বাবার সঙ্গে সে গর্ত বোজাতে এসেছিল। সে জমির জন্য অংশ থেকে কোদালে করে মাটি কেটে ডালিতে ভর্তি করে দিচ্ছিল। তার বাবা সে মাটির ডালি নিয়ে গিয়ে গর্তে ফেলে দিচ্ছিল। এমন সময় তার মেজকাকা এসে হাজির।

সে হাসকলমের মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিল। শামুকে মাটি কোপাতে দেখে সে রাস্তা ছেড়ে নেমে এল। হাত থেকে কোদাল ফেলে দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "তুই ঐ চারা বট গাছটার ছায়াতে দাঁড়া! আমি কাইটে দিছি।" বড়দাকে বলল, "ওকে মাটি কাটতে লাগিয়েছো ক্যানে? ও বাচ্চা ছেলে। ও পারে? আজ রাখো। আমি চোরশ করে দিবো।" তার বাবা কোন কথা বলেনি। বলার কিছু ছিল না। জায়ে জায়ে ঝগড়ার ফলে ভায়েরা ভিন্ন হয়ে গেছে। ভাইপোর ওপর টান যায়নি। মেজকাকা বলেছিল, "ডালি দ্যাও! আমি কাটে দিছি।"

শামু বটগাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। মাটি কেটে দিচ্ছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সরসর করে ঘাম ঝরছিল। ছায়াতে এসে দাঁড়াতে ঝিরঝিরে বাতাসে খুব আরাম লাগছিল। সেদিন অকৃত্রিম স্নেহ সে সমস্ত শরীরে অনুভব করেছিল। আবেগে বুক ভরে গিয়েছিল। আজও তেমনি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, মেজকাকা যেন পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তার আবার ভয় করতে লাগল। বাড়ি রওনা হল।

॥ ৩ ॥

বাইরের আঙিনায় এসে দাঁড়াতে তার সাত বছরের পুত্র এসে বলল, "খাতা কিনতে হবে। পয়সা দাও!"

শামু বলল, 'মাকে বলো, দিয়ে দেবে।"

পুত্র লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

শামুর মনে পড়ে গেল তার সময় পয়সা পাওয়া অত সহজ ছিল না। তখন তার বাবারা সবে ভিন্ন হয়েছে। সে সিক্সে পড়ে। বাবার কাছে খাতা কেনার জন্য পয়সা চাইল। বাবার কাছে পয়সা ছিল না। শামু মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মেজকাকা ওদিক থেকে এগিয়ে এসে বলল, "কত লাগবে?"

শামু সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিল, "চার আনা।"

মসলেম সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গির কষি থেকে একটি সিকি বের করে শামুর হাতে দিয়েছিল। শামু সে সিকি নিয়ে খুশি মনে ফুলে দিয়েছিল।

শামুর মনে হয়, তার মেজকাকা তার জন্য অনেক কিছু করেছিল। কিন্তু সে তার জন্য কিছুই করতে পারেনি।

স্ত্রী শাহানা এসব কথা কিছু জানে না। কোনদিন বলেনি। আজও বলল না। শুধু মাঠের ঘটনাটা বলল। শুনে সে বলল, "লোকটার বোধহয় শাস্তি হয়নি। আমি কালই মহজিবে হাজোৎ দিব।"

হাজোৎ ব্যাপারটার কোন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শামু পায়নি। কখনও কিছু প্রার্থনা করে বা প্রাপ্তির পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গুরুদ্বার জামাতের নামাজে অংশগ্রহণকারীদের জন্য কিছু খাবার (অধিকাংশ সময়ই রুটি-মাংস) পাঠানোকেই হাজোৎ দেওয়া বলে। তার মনে হয়, মন্দিরে ভোগ পাঠাবার অনুকরণেই, খুব সম্ভবত, এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারটা জনপ্রিয় হয়েছে। হাজোৎ দিয়ে কিছু হয় বলে তার বিশ্বাস নেই। হয় শুধু মুসুল্লিদের আর বাইরে যে সব ছেলেমেয়ে জোটে তাদের খাওয়া। তবু সে স্ত্রীর প্রস্তাবে বাধা দিল না। শাহানা যে তার মঙ্গল চিন্তা করছে, সেটাই তার ভাল লাগল। তার মেজকাকার জীবনে এটা কোনদিন জোটেনি।

॥ ৪ ॥

ভিন্ন হওয়ার পর সে ধনীলোক হওয়ার চেষ্টা করেছিল। আর ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া এ অঞ্চলে ধনী হওয়ার একমাত্র পথ লাগান দেওয়া। আশেপাশের গ্রামের যারা ধনী হয়েছে তারা সবাই লাগানের কারবার করে। ধান-গম জমিয়ে রাখে। আষাঢ় মাসের দিকে যখন খাবার অভাব হয়, লাগান করে। তিন-চার মাস পরে ফসল উঠলেই দেড় গুণ-দু'গুণ যেমন শর্ত থাকে আদায় করে। দু-তিন বছরেই ধনীলোক হয়ে যায়।

মসলেম অনেক হিসাব করে তার ধান-গম জমিয়ে রেখে লাগান করেছিল। কিন্তু আদায় করতে পারেনি। যারা অভাবে পড়ে ধার নেয় তাদের ধার শোধ দেবার মত সঙ্গতি তেমন থাকে না। বাধ্য না হলে শোধ করতে পারে না। আশেপাশের গ্রামের যারা লাগান করে তারা কিছু বন্ধক রেখে বা জমি রেজিস্ট্রি করে রেখে আদায় দিতে বাধ্য করতে জানত। মসলেমের এ বিদ্যা জানা ছিল না। ফলে সকলেই দিব-দিচ্ছি করল। কিন্তু কেউ দিল না। ধনী হতে গিয়ে গরিব হয়ে গিয়ে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেল। সকলের সঙ্গেই খটাখটি লেগে যেতে লাগল। যে সময় তার স্ত্রীর সব থেকে বেশি কাছে থাকার দরকার ছিল সে সময় সে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেল। রাগ করে মসলেমও তার আনতে গেল না। মাঠের ফসল দ্বিগুণ করে যাতে কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারে তার জন্য দিনরাত খাটতে লাগল। কিন্তু পরিস্থিতি তার অনুকূল হল না, পাশের জৈরব নদী থেকে বান এসে সব ফসল ডুবিয়ে দিল। বিষয়ক, নিঃসঙ্গ মসলেম পাগলপ্রায় হয়ে গেল।

ওদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর এল, স্ত্রী অসুস্থ। মসলেম মনে করল, তাকে ডেকে নেবার বাহানা। গেল না। কদিন পরে মৃত্যু সংবাদ এল। এবার সে সংকোচে যেতেই পারল না। স্ত্রীর মরা মুখটা দেখতে গেল না। মনের কষ্টে প্রায় পাগল হয়ে গেল। কারও সঙ্গে কোনরকম কথা বলত না। চুপ করে বসে থাকত। আর আপন মনে কথা বলত। কখনও বলত, "ডাঁড়া কাটব।" কখনও বলত, "পরেশ ম্যাকের বিটিকে বিয়ে করব।" শামুর মনে হয়, তার মেজকাকার মনে হয়েছিল, ডাঁড়া থাকলে মাঠের জল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেত। তার ফসল নষ্ট হত না। তাই সে মনে ঠিক করেছিল, সে ডাঁড়া কাটবে। মানসিক অবস্থা শিথিল হয়ে পড়ায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তেমনি হয় তো স্বপ্ন ছিল, স্ত্রী চলে গিয়েছে তো কি হয়েছে। ধনী হয়ে সে ধনী শ্বশুরের মেয়েকে বিয়ে করবে।

পরেশ সেখ এলাকার ধনী লোক। তার মেয়ের কথা মনে এসেছিল। মানসিক সাম্য যতদিন বজায় ছিল, এ বাসনা, একথা মনের গভীরেই ছিল। মানসিক বাঁধন শিথিল হওয়ায় তা বাইরে বেরিয়ে আসছে। আর অসম্মতি লক্ষ্য করে লোকে তার পিছনে লাগছে। বাচ্চা ছেলেরা দূর থেকে ঢিল মেরে বলছে, "ডাঁড়া কাটবা? পরেশ স্যাকের বিটিকে বিয়ে কোরবা?" মসলেম ঢিল খেয়ে তাদের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকছে। মেজকাকার শেষের দিনগুলো মনে হলে শামুর খুব কষ্ট হয়।

।। ৫ ।।

তার মনে হয়, মেজকাকার বোধহয় একটা ছেলের খুব শখ ছিল। সেজন্য সে ঐ অবস্থাতেও আরেকবার বিয়ে করেছিল। পাশের গ্রামের কহবতি ভাল হয়ে যাবে, এই আশায়, তার এক আত্মীয়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরও, চিকিৎসা করেও কোন উন্নতি না হলে তারা বিজেদের মামলা করেছিল। মসলেম আদালতে যায়নি। একতরফা আদেশ হয়ে গিয়েছিল।

তখন মসলেম তার বড় বাড়িতে একাই থাকত। কাজকর্ম তখনও কিছু করত। নিজেই রান্না করে খেত। কিন্তু বোধহয় একাই খেতে খারাপ লাগত। অথবা কাউকে সঙ্গে নিয়ে খেতে ইচ্ছে করত। খেতে বসার আগে শামুকে ধরে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। রাতে শুতে যাওয়ার আগে এসে শামুর কাছে বসে থাকত। পড়া শেষ হলে তাকে নিয়ে তবে শুতে যেত। শামুর মা মাঝে মাঝে আপত্তি করত। কিন্তু বাবার হস্তক্ষেপে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি হতে পারত না। মসলেম ফাঁক পেলেই শামুকে কাছে ডেকে নিত।

আজ মনে হয়, সে চেষ্টা করলে তার মেজকাকাকে অনেকটা শান্তি দিতে পারত। তা না করে মার পরামর্শে তার জীবনে নরকের অভিশাপ নামিয়ে আনল।

শামুর এখনও স্বপ্নের মত লাগে। তার কথামত মসলেম আগে থেকে তৈরি করা দলিলে টিপসই করে দিল। তারপর যখন সে জানল, শামু তার জমিগুলি ভুলিয়ে লিখে নিয়েছে তখন আর মানুষের মধ্যে থাকল না। পুরো পাগল হয়ে গেল। শামুকে আর কোনদিন সে কাছে ডাকেনি। সাথে শুতে বলেনি। খেতে বলেনি। অবশ্য এরপর তার নিজেরই খাওয়া জুটত না। পাগলের মত ঘুরে বেড়াত। কেউ খেতে দিলে খেত। না দিলে না খেয়েই থাকত। না খেয়ে থাকলেও শামুদের দেওয়া খাবার খেত না। অন্য লোকে কেউ তেমন খেতে দিত না। বেশির ভাগ দিন তার না খেয়ে কেটে যেত। তারপর সে একদিন নিজেই চলে গেল। শামু খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল, ঘরের দাওয়ায় দু'পালে হাত দিয়ে মরে পড়ে আছে। কখন মরেছে কেউ জানে না। দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এক ফোঁটা জল সে চেয়েছিল কি না, কেউ জানে না।

।। ৬ ।।

শামুর চিৎকারে শাহানার ঘুম ভেঙে গেল। সে শামুকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলল। শামু ধড়ফড় করে উঠে বসতে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে? চিল্লাচ্ছো ক্যানে এত?"

শামু চোখমুখ ডলতে ডলতে উত্তর দিল, "মাকবাপকে স্বপনে দেখনু।"

"কি দেখলে?"

"আমাদের পুরনো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিনু। তার বাড়ি থেকে মাকবাপ বেরিয়ে এল। আমার হাত ধরে বলল, "আমার খুব কষ্ট রে। আমার সাতে কেহ নাই। তু আয়!" বলে আমার হাত ধরে টানছিল। আমার যেমনি মনে পড়েছে, মাকবাপ তো মরে গিয়েছে অমনি খুব ভয় লেগেছে। আমি চিৎকার করে উঠেছি।

শুনে শাহানার মুখ শুকিয়ে গেল। একটু থেমে বলল, "তুমাকে খুব ভালবাসতোক, না?"

"হ্যাঁ।"

"ও পারে গিয়েও ভুলতে পারছে না। কিন্তু মেজশ্বশুরের তো বোকা উচিত, আমরা আছি। তার নাতি হয়েছে। তাদের মায়া করতে হয় তো!"

শাহানা আর কিছু না বলে ভোর হতেই তার বাবার কাছে চলে গেল।

শামুর শ্বশুর ভূতের পাকা ওঝা ঘাঁকু পণ্ডিতকে ধরে আনল। তাকে দেখে গ্রামের বুকফিরাও জড়ো হল।

সব শুনে সকলেই একমত হল যে, লোকটার আত্মার শান্তি হয়নি। শামুর উচিত কোরান খতম করা। আর কিছু লোক খাওয়ানো। শামু বুঝতে পারে না, লোক খাওয়ানো হল, আর নাই হল, তার সঙ্গে তার মেজকাকার আত্মার শান্তির কি সম্পর্ক? কিন্তু স্ত্রী শাহানা শুনল না। তার মনে হল, তার স্বামীর খুব বিপদ।

তাদের গ্রামের কালামের এমনই হয়েছিল। মা তাকে খুব ভালবাসত। মা মারা যাওয়ার পর কালাম প্রায়ই মাকে স্বপ্নে দেখত। মাসখানেক পর সেও মার কাছে চলে গেল। তার মেজশ্বশুরও তার স্বামীকে খুব ভালবাসত। তার স্বামীও প্রায়ই তাকে স্বপ্নে দেখছে। এটা ভাল লক্ষণ নয়। এটা বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করার জন্য সে লোক খাওয়ানোর আয়োজন করল। গ্রামের সব লোক নিমন্ত্রণ করে জড়ো করল।

লোকজনের আনাগোনা, খাওয়া-দাওয়া দেখে শামুর মনে হল, এই তো তার থেকে বেশি টাকা খরচ হয়ে গেল। তবু তার মনের বোঝা তো হাল্কা হল না। এর থেকে সে যদি মেজকাকার জমিটা ভুলিয়ে লিখিয়ে না নিত! জমিটা সে আর রাখবে না। মসজিদে, না হয় মক্তবে দান করে দেবে। না হলে তাদের গ্রামে মেজকাকার নামে একটা প্রাইমারি স্কুল করবে।

"তাতে তোমার মনে শান্তি হতে পারে। আমার কি হবে?"

তার মেজকাকা কেন শামুকে জিজ্ঞেস করল। শামু মুখ তুলে দেখল তার মেজকাকা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে আঁ্যা আঁ্যা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। মানুষজন ছুটে এসে তাকে তুলে ধরল। স্ত্রী শাহানা ভয়ে কেঁদে ফেলল। ঘাঁকু পণ্ডিত বলল, "জিন নয়, ভূতেই ধরেছে শামুকে।"

কেউ বুঝতে পারল না, মসলেমের নয়, শান্তির দরকার শামুর। ❐

"আমার মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই
আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।"

— কবিগুরু

সহযোগিতা আর সহমর্মিতার আশ্বাস নিয়েই ৩৬ বৎসর
এলাকার মানুষের সেবায় নিয়োজিত —

সরশুনা কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড নং : ৩৮৭ / ২৪ পরগণা (দঃ) ১৯৬৪

২২৭/১, সরকারহাট লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০৬১
ফোন : ৪৯৩-৪৫৭৮

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু'র নিকট হইতে ১৯৯২ সালে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট হইতে ১৯৯৬ সালে ক্রেতা সমবায় প্রথম পুরস্কার গ্রহীতা।

আমাদের লক্ষ্য :

সমবায় আন্দোলনের প্রসার।

ন্যায্য মূল্যে, সঠিক ওজনে, সঠিক মানের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা।

৩। সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন।

সমরেন্দ্রনাথ নন্দী
সভাপতি

শ্যামলকান্তি সরকার
সম্পাদক

উত্তর ধামতোড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

সাং + পোঃ ধামতোড়
থানা - ডেবরা, জেলা - মেদিনীপুর
রেজি. নং : ৩৯ মিড্ তারিখ : ১৬.৮.৫৫

- এক নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি যা এতাবৎ কালের সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা লাভজনক।
- এখানে সমস্ত প্রকার আমানত বিমা দ্বারা সুরক্ষিত।
- স্বল্পসুদে কৃষিঋণ দাদন, বন্ধকি ঋণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।
- বর্তমানে কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প চালু হইয়াছে।

কর্মচারীগণ ও পরিচালকমণ্ডলী

আলোককেন্দ্র সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

আলোককেন্দ্র, মেদিনীপুর
রেজি. নং : ১০ মিড্ তাং ২৫.৩.৭৯

বর্তমান প্রকল্প

- কৃষিঋণ, বন্ধকিঋণ, হাইপোথিকেট ঋণ, বলিবৃক্তিপ্রকল্প ঋণ, সমাজভিত্তিক বনসৃজন, কুটসেচ প্রকল্প, কিষান ক্রেডিট কার্ড।
- সার, কীটনাশক, বীজ, বস্ত্র, সিমেন্ট বাবদ।
- রেশনওটি গুদামের ট্রাইং স্টোর।
- ব্যাঙ্কিং বিভাগ।

আগামীদিনের প্রকল্প

মাতৃশিশুমঙ্গল ▲ আম্বুলেন্স ▲ কোল্ডস্টোরেজ ▲ মিনি রাইস মিল ▲ ফার্মার্স ক্লাব ▲ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ঋণ ▲ পঞ্চায়েতের সহযোগিতা ▲ রাস্তা সংরক্ষণ ▲ প্রতি পরিবারের জন্য ধূমহীন চুল্লি ও শৌচাগার ▲ মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কারপ্রদান ▲ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ইত্যাদি

কর্মচারী ও পরিচালকমণ্ডলী

নিধার পথে টকেতে
ক'টা দিন নিশ্চিন্তিতে
অবসর যাপনের জন্য
আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সেটকো হলিডে হোম

পরিচালনায়

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

জীবন পালের বাগান
পোঃ+জেলা - হুগলি
ফোন : ৬৮০-২৮৩৩

শারদীয়া ও দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই —

জেলার উন্নয়নে নিয়োজিত

অ্যাসোসিয়েশন অব হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কো-অপ. ইঞ্জিনিয়ারস্

(সেকো, হুগলি ইউনিট)

রবীন্দ্রনগর সুপার মার্কেট
৩য় তল, পোঃ - রবীন্দ্রনগর
চিনসুরা, হুগলি - ৭১২ ১৫০

সমবায় আন্দোলন জিন্দাবাদ

পুরী

অবসর বিনোদনে
সমুদ্র সৈকতে
স্বাচ্ছন্দ্য সুখভোগ আরাম
তারই জন্য আসুন
৪ শয্যা বিশিষ্ট ৬খানি নিজস্ব ঘরে

দ্বারকাধাম
(স্বর্গদ্বার : পুরী)

ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং (টি অ্যান্ড সিপি) ডিপার্টমেন্ট স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

১৮ নং রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা - ১
পোদ্দার কোর্ট, ৩নং ও ৪ নং গেট, দ্বিতল
ফোন : ২২৫-৩৪৪৬

সাগর বেলায় ঝিনুক কুড়িয়ে বিশ্রাম নিন

আমাদের হলিডে হোমে

পুরী ও দীঘায়

যোগাযোগের ঠিকানা

গিলান্ডার্স কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

প্রথম তল, গিলান্ডার্স হাউস
নেতাজি সুভাষ রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২০ ২৩৩১
এক্সটেনশন - ২৩৯/২৪৭

জনগণের সেবায় নিয়োজিত

রামনগর ব্লক ১ ও ২ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লি.

পিছাবনি, মেদিনীপুর

এম আর ডিস্ট্রিবিউটার শপের মাধ্যমে রামনগর ও দীঘা থানার জনগণকে রেশন দ্রব্যাদি সরবরাহ সহ মি.ডে. মিল বিতরণ, রাসায়নিক সার ও স্টেশনারি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

কেশবকৃষ্ণ দাস
সভাপতি

শেখ নবাব উদ্দিন
সম্পাদক

Contai Marine Fisheries Employees' Cooperative Credit Society Ltd.

Reg. No. 28 Cont. *Dt. 12.5.89*

MEEN BHABAN
P.O. - Contai :: Dist. - Midnapur

Main Function :-
■ **INVESTMENT OF LOAN**
■ **CONSUMER BUSINESS**

BOARD OF DIRECTORS

Pijush Kanti Jana	Chairman
Nanigopal Jana	Vice-Chairman
Anil Kumar Maiti	Secretary
Sukanta Kumar Jana	Director
Jagabandhu Das	Director
Ashoke Kumar Mal	Director

B/059·9/44/B 409

For Grace, Beauty and Elegance
Buy
BENGAL SILK
from
RESHAM SHILPI

PASCHIM BANGA RESHAM SHILPI SAMABAYA MAHASANGHA LTD.
UNDER C & S.S.I. DEPARTMENT, GOVT. OF WEST BENGAL & CERTIFIED BY KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION.

PLEASE STEP IN –

- 12/1, Hare Street, Calcutta - 700 001
- 11A, Esplanade East, Calcutta - 700 069
- 158/1A, Rash Behari Avenue, Calcutta - 700 029
- 93, Mahatma Gandhi Road, Calcutta - 700 007
- 186, Bidhan Sarani, Calcutta - 700 006
- G-24, Ds-III, Manicktolla Civic Centre, Calcutta - 700 054
- Colony More, Barasat, 24 Parganas (North)
- Nachan Road, Benachilti, Durgapur - 13
- 30, Raha Lane, Asansol

PHONE : (OFFICE) : 248-2833

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

কাশুপশরা বাড়কাশুপশরা
সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ১৯০ *তারিখ : ২৬/৫/৭৭*

সাং — আমতলা :: পোঃ — তাজপুর :: জেলা — মেদিনীপুর

ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ এবং মধ্যমেয়াদী কৃষি ও অকৃষি ঋণ দাদন, সার ও সাদা কেরোসিন ব্যবসা এবং সঞ্চয়ী আমানত ব্যবসা করিয়া থাকি।

অজয় কুমার জানা	অলোক কুমার ওঝা	চিত্তরঞ্জন বল
ম্যানেজার	*সম্পাদক*	*সভাপতি*

কেবলমাত্র ঋণ দাদন ও ব্যাঙ্ক পরিষেবাই নয়,
আমরা আছি প্রতি পদক্ষেপেই

আনন্দমোহন অধিকারী	বিকাশ সামন্ত
সভাপতি	*সম্পাদক*

Dhalhara Khandagram SKUS Ltd.
P.O. Dhalhara, Tamluk II, Midnapur

P 10, 242

মুর্শিদাবাদ জেলার জনগণের চোখের নিয়ন্ত্রিত

মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লি.

প্রধান কার্যালয় : বহরমপুর (পঃ বঙ্গ)

জেলার দুস্থ ও অবহেলিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার সঙ্কল্প নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছি আমরা। চাষের ক্ষেত্রে আমাদের লগ্নী ক্রমবর্ধমান এবং লগ্নীর সিংহভাগই ব্যয়িত হয় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর স্বার্থে।

মৎস্য চাষ ও দুস্থ মৎস্যচাষীর উন্নয়নে ব্যাঙ্কের সক্রিয় সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। তন্তু শিল্পে নিয়োজিত দুস্থ শিল্পীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে আমরা প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করে চলেছি। আপনার মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য সেফ ডিপোজিট লকারের ব্যবস্থা আছে। জেলার চাকুরিজীবীদের সুবিধার্থে আমরা বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমাদের ব্যাঙ্কের সঞ্চয় শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হয়। আমানতের উপর সুদের হার অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় আকর্ষণীয়।

শাখা সমূহ

কান্দী ✦ লালবাগ ✦ জঙ্গীপুর (রঘুনাথগঞ্জ) ✦ বেলডাঙ্গা ✦ খাগড়া
✦ গ্রামশালিকা ✦ সাগরদিঘি ✦ ফরাক্কা ✦ নগর ✦ লালগোলা ✦ ডোমকল
✦ পঞ্চাননতলা (পে অফিস) ✦ প্রধান শাখা (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)

দিলীপকুমার দে
মুখ্য কার্য নির্বাহী আধিকারিক

শেখর সাহা
সভাপতি

নবগ্রা ইউনিয়ন কো-অপ. এগ্রি. ক্রেডিট সোসাইটি লি.

রেজি. নং ৬১, তারিখ - ১-১০-৪৮
ফোন : (০৩৪২) ৭২২৫৪

হেড অফিস :
গ্রাম ও পো: - নবগ্রা : বর্ধমান

শাখা অফিস :
কালনা

- সমস্ত কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে সকলের সহযোগিতা পরামর্শই আমাদের চলার পথে পাথেয়।
- স্বল্প সুদে কৃষিঋণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করা হয়।
- উচ্চ হার সুদে আমানত জমা নেওয়া হয়।

সমীর ব্যানার্জি
সম্পাদক

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে সমবায় আন্দোলনই আজ কাম্য।
ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায় —

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ
বর্ধমান
রেজিস্টার্ড নং ৪৬০ ❑ তাং ৩.১.১৯৭৯
ফোন নং - (০৩৪২) ৬৩৯১৫, ৬৩৯১৬

- ❑ আমরা আমাদের সদস্যদের সুখে-দুঃখে ঋণদান করে সমবায়ী হই।
- ❑ সদস্যদের কৃতী ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে একককালীন অনুদান দিয়ে উচ্চতর পড়াশুনায় উৎসাহিত করি।
- ❑ সদস্যদের চাকুরিতে অবসর ও চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত কারণে আমরা অর্থ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

অঞ্জনকুমার সিনহা — সভাপতি
স্বপন রায় — সহ-সভাপতি
প্রণবেশ ভট্টাচার্য — সম্পাদক

শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ —

কৃষকের সেবায় নিয়োজিত

সাহানুই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং — ২৬৫৫
সাহানুই, রসুলপুর, বর্ধমান
শাখা : বিনয়পল্লী, রসুলপুর

বিভিন্নপ্রকার সঞ্চয় প্রকল্প ও ঋণদানের প্রতিষ্ঠান।

ব্যবসা : পাইকারি ও খুচরা রাসায়নিক সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিজ যন্ত্রপাতি, বস্ত্র।

সেবা : স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রদান।

সুদেব কোলে — সভাপতি
জ্যোতি মুখার্জি — সম্পাদক
রাধাশ্যাম ঘোষ — ম্যানেজার

With Best Compliments From :

STATE GOVT. EMPLOYEES' CONSUMERS COOPERATIVE STORES LTD.

REGD. NO. 111 OF 73/74
COURT COMPOUND
BURDWAN

শারদীয়

শুভেচ্ছা

সহ ঃ

সন্ন্যাসীতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

পোঃ আমাইপাড়া

ব্লক ঃ মুর্শিদাবাদ - জিয়াগঞ্জ

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ

প্রবন্ধ

প্রেম রসায়ন

সাধনানন্দ মণ্ডল

প্রেম বহুরূপী। স্নেহ-প্রীতি-মায়া-মমতা, ভালোবাসা-অনুরাগ, বাৎসল্য-দরদ-প্রণয় — কত রূপ তার! প্রেম ছাড়া সমাজ সংসার অচল। প্রেম ছাড়া সবই বিফল। বোধহয় অত্যুক্তি নয়, মানবীয় অস্তিত্বের 'নিউক্লিয়াস' এই প্রেম। তবে, এসবই পুরনো কথা। কারও অজানা নয়। কিন্তু, যে-অজানা কথা বিজ্ঞানীরা আজ জানতে চাইছেন, তা হল, আদিম-সূক্ষ্ম ও কোমল এই যে অনুভূতি — যার নাম প্রেম — তার উৎসে দেহ ও মন একযোগে কীভাবে কাজ করে।

সেই ১৯০৬ সালে বিজ্ঞানীরা একটি যৌগের সন্ধান পান। সেটির নাম অক্সিটোসিন। জীববিজ্ঞানীদের এতদিন জানা ছিল না যে, যৌগটির কাজকর্ম কী বিস্ময়কর! তাঁরা তা জানতে পারছেন এখন।

অক্সিটোসিন আসলে একটি হরমোন — অর্থাৎ, উত্তেজক রস ; তৈরি হয় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামসে। তারপর, সেখান থেকে এসে জমা হয় মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থির পিছনের অংশে। জীববিজ্ঞানীরা এতদিন শুধু জানতেন, জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটাতে আর মাতৃস্তনে মাতৃদুগ্ধের জোগান দিতে যৌগটির কার্যকারিতা অসাধারণ। কিন্তু, মা ও শিশুর মধ্যে যে-মধুর সম্পর্ক — যে-নিবিড় বন্ধন — তার মূলেও যে আছে এটিরই ক্ষেরামতি — তা তাঁদের জানা ছিল না। তার মানে, তাঁরা জানতেন না যে, এই উত্তেজক রসটিই বাৎসল্য রসের রসায়ন ; এবং শুধু তাই নয়, তাঁদের এও জানা ছিল না যে, এই রসই প্রণয় তপ্ত শৃঙ্গার রসে রসদ জোগায়।

বলাই বাহুল্য, মানবজীবন শুরু হয় মাতৃস্নেহের ঘেরাটোপে। তবে শুধু মানবশিশুই নয়, যেকোন স্তন্যপায়ী শিশুর জীবনে অবশ্যই চাই মাতৃস্নেহ ; চাই মায়ের আদরযত্ন। তার কারণ, স্তন্যপায়ীরা পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়ে জন্মায় না। স্বাবলম্বী হতে স্তন্যপায়ী-শাবকদের সময় লাগে। সেজন্য এদের চাই মাতৃস্নেহ মায়ের আদরযত্ন। এ সময় এরা তাই মাতৃস্নেহের বড় কাঙাল। এদের এই প্রয়োজন মায়েদের মেটাতে হয় হাসিমুখে, খুশিমনে। বিরক্ত হলে চলে না। এদের বড় করে তুলতে, লালন-পালন করতে মাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু, গর্ভধারণ-প্রসব ও প্রসূত শিশুর লালন-পালন সহজ কাজ নয় — আরামদায়ক কাজ তো নয়ই। মা হতে গেলে গর্ভধারণের অস্বস্তি-অসুবিধা ছাড়াও নারীকে সইতে হয় গর্ভযন্ত্রণা আর সেইসঙ্গে প্রসববেদনা। এরপরেও তার রেহাই নেই। রয়েছে অজস্র ঝামেলা ; শিশুপরিচর্যার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ; জাগরণ-ক্লান্তি। তাই, স্বাভাবিক প্রশ্ন এটাই, একসঙ্গে এত সব নারীরা মেনে নেয় কী করে? কী এর আসল রহস্য?

জীববিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন, প্রসবের সময় তো বটেই, এমনকি, প্রসবের পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত, নারী ও অন্যান্য স্ত্রী-স্তন্যপায়ীর রক্তে অক্সিটোসিনের মাত্রা ছড়িয়ে যায়। শুধুমাত্র জরায়ুর সঙ্কোচন ও স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারের জন্যই কি অক্সিটোসিনের এই আধিক্য! বিষয়টি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তোলে। তাঁদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় ধরা পড়েছে, এসব কাজ ছাড়াও, যৌগটি আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সামিল হয়। মায়ের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে অংশ নেয় তার স্নায়ু-মাংসপেশিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ায় — যার ফলে, নারীর মনে মাতৃত্ব বোধের উন্মেষ ঘটে। বিজ্ঞানীদের নজরে এসেছে, ভোর কারণে মানি ভেড়ার শরীরে অক্সিটোসিনের অভাব ঘটলে সেই ভেড়ি তার বাচ্চাকে চিনতে পারে না। বাচ্চার মা হয়নি এমন কুমারী ইঁদুরকে অক্সিটোসিন ইনজেকশন দিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রতীতি জন্মা ইঁদুরের বাচ্চাদের এমনভাবে আদরযত্ন করে, জাগলে আগলে রাখে যে, দেখে মনে হয়, সেগুলি বুঝি তার নিজের গর্ভজাত বাচ্চা। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের জীববিজ্ঞানী কারস্টিন আহুনাস-মোবার্গ জানিয়েছেন, প্রসবের সময় ও তার পরের কিছুদিন ধরেই শুধু নয়, মা যতদিন শিশুকে তার স্তনদুগ্ধ পান করায় ততদিন পর্যন্ত মায়ের রক্তে অক্সিটোসিনের মাত্রা বেশি থাকে। এ অবস্থায় নিজের শিশুর প্রতি তো বটেই, অন্যের শিশুর প্রতিও মায়ের থাকে মনস্তিত টান ; এবং শুধু তাই-ই নয়, বড়দের খুশি করতেও এ সময় মায়েদের আগ্রহ থাকে যথেষ্টই। জানা গেছে, সেসব মায়ের রক্তে অক্সিটোসিনের পরিমাণ মাত্রাধিক, তারা অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল। অন্যের না-বলা কথা সহজেই তারা বুঝে ফেলতে পারে ; রক্তে তুলনামূলক-ভাবে কম অক্সিটোসিন থাকা মায়েরা তা বুঝে উঠতে পারে না। একটি অবোধ শিশু — যার মুখে কথা ফোটেনি — যার দৈহিক ভাষা পরিস্ফুট হতে সে বাকি — তার সুবিধা-অসুবিধা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি-চাহিদা বুঝে ওঠা সহজ কাজ নয়। অক্সিটোসিন কাজটিকে সহজ করে দেয় ; হয়তো বা জাগিয়ে দেয় মায়ের 'ষষ্ঠ

ইন্দ্রিয়' ; অক্সিটোসিন যৌনের উপস্থিতির তারতম্য অনুসারে মা কম বা বেশি বুঝে উঠতে পারে শিশু কী চায় বা কী চায় না — শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে যা বোঝা অপরিহার্য। গর্ভধারিণী নয় অথচ একলো ভাগ মাতৃসুলভ আচরণ — এমন নারী মানব সমাজে বিপুল না হলেও বিরল কিন্তু নয়। এদের মস্তিষ্কে কি তবে অক্সিটোসিনের ক্ষরণ তুলনামূলকভাবে বেশি? যেসব মা প্রসবের পর সদ্যোজাত জীবন্ত শিশুকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যায়, তাদের মস্তিষ্কে অক্সিটোসিনের নিঃসরণ কি তবে কম? যাদের মা হতে অনীহা, তারা কি তাহলে অক্সিটোসিন-হীনা কিংবা - হীনা!

গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেসবের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানী অ্যাডলাস-মেথার্স যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান তা হল, মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে অক্সিটোসিনের কার্যকর্ম কোন না কোন-ভাবে সম্পর্কিত। আবেগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলির অবস্থান মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অঞ্চলে। একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাবতীয় আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় এখান থেকে। এই ব্যবস্থাপনার নাম হাইপোথ্যালামিক-হাইপোফাইসিয়াল সিসটেম বা তন্ত্র। অক্সিটোসিন আর তন্ত্র — এই দুইয়ের কর্মনৈপুণ্যে প্রসূতি মায়ের রক্তের চাপ কমে। কমে তার মানসিক চাপও। প্রশমন ঘটে তার বাধা-বেদনা ও উৎকণ্ঠার। মাতৃত্বের আনন্দে হারিয়ে যায় তার অস্বস্তি ও অসুবিধা। তাকে শিশুর প্রতি আসক্ত করে তোলে। ফলে, শিশুকে ভার বা বোঝা না ভেবে সে তার প্রতি হয়ে ওঠে মনতামগ্নী ; স্নেহবৎসল। শিশুর শুভ কামনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে তার মানসিক গতিপ্রকৃতি। বৈষ্ণব কবি দ্বিজমাধব নন্দরানি অর্থাৎ যশোমতীর মাতৃ-হৃদয়ের যে কল্যাণকামী রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা যদিও জন্মদাত্রী মায়ের নয়, পালিকা মায়ের, তবুও বলতে বাধা নেই, তাই-ই কিন্তু অক্সিটোসিন-সিক্তিত মাতৃত্ববোধের যথার্থ চিত্রায়ণ :

"বিপিনে গমন দেখি হয়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরানি।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষমন্ত্র পড়রে আপনি।।
ও হুখানি রাঙ্গা পায় রক্ষা রাখুন তায়
জানু-রক্ষা করুন দেবগণ।
কটিতট সুন্দর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ।।"

বাৎসল্যের আওতায় শিশু বড় হয়। এক সময় ফুরিয়ে যায় তার শৈশব। আসে কৈশোর। জোড়া শালিকের খোঁজে, "কুয়াশার ভিতর প্রণয় চিঠি"-র মৌজে তখন তার দিন কাটে। তারপর একদিন ফোটে যৌবনের কদমকুসুম। শুরু হয় তার উজান প্রেমপর্ব। আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভাষায় এসবই মস্তিষ্কে নিঃসৃত হরমোনের কর্মচঞ্চলা ছাড়া বস্তুতপক্ষে আর কিছু নয়।

প্রেইরি অঞ্চলের ঘাসবনে থাকে এক রকমের ইঁদুর। শীতের দেশের প্রাণী। সারা গায়ে তাই বিস্তর লম্বা লোম এদের। লোমশ এই প্রাণীর প্রেম বড় গভীর। প্রেমবন্ধন এদের এমন সুদৃঢ় যে ছাড়াছাড়ির রেওয়াজ নেই। জীববিজ্ঞানী কার্টার এদের নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্রে সবিস্ময়ে লিখেছেন : "কল্পনা করতে পারবেন না, কী দীর্ঘ সময় ধরে এরা প্রেমডোরে আবদ্ধ থাকে! আসলে কি জানেন, এরা কেউ কখনও একা থাকতে পারে না।"

জীববিজ্ঞানীদের অনেকে জানিয়েছেন, এদের এই প্রেমলীলায় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে উৎসারিত হয় আর একটি উত্তেজক রস — নাম ভ্যাসোপ্রেসিন। অক্সিটোসিন যেমন বেশি সক্রিয় স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে, ভ্যাসোপ্রেসিন তেমন করিৎকর্মা পুংলিঙ্গের বেলায়। পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রণয় ও মৈথুন — সব মিলিয়ে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রেইরি ইঁদুরদের প্রেমপর্ব চলে কম করেও দুদিন। এসময় স্ত্রী ইঁদুরদের মস্তিষ্ক থেকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিটোসিন ঝরে চলে। রক্তে তা অনবরত মেশে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, রক্তে অক্সিটোসিনের মাত্রা কমে গেলে এদের প্রেমসায়রে ভাটা পড়ে। অক্সিটোসিন ইনজেকশন দিয়ে তাঁরা দেখেছেন, এদের মরা গাঙে বান ডাকে। আচরণ অদ্ভুতভাবে পাল্টে যায়। তখন এরা চায় প্রেমের জোয়ারে হাবুডুবু খেতে। প্রেমিকরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও প্রেমিকারা কিন্তু নাছোড়বান্দা। এরা প্রেমিকদের কাছে পেতে চায়। চায় মিলন। প্রেম নিবেদনে অনিচ্ছুক পুরুষ ইঁদুরগুলিকে এসময় ভ্যাসোপ্রেসিন ইনজেকশন দিলে তারা আবার আগের মতই প্রেমকলায় উদ্বুদ্ধ হয়। যে যার প্রাক্তন প্রেমিকার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। এ যেন সেই আত্মনিবেদন — "দেহি পদপল্লব মুদারম্।"

সন্দেহ নেই, জীবের আদিমতম অনুভূতিগুলির একটি হল এই প্রেম। কিন্তু তা হলে কি হবে, স্বয়ম্ভর বা বরণ-ডালা এর স্ফুরণ ঘটে না। মানুষের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকি ইতরপ্রাণীর ক্ষেত্রেও। প্রেমের জন্য চাই সৃষ্ট পরিবেশ — বিশেষ করে প্রেমিকাদের বেলায়।

ভয় পেলে বা মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে কিংবা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হলে, প্রাণীদের মস্তিষ্কে 'স্ট্রেস-হরমোন (stress-hormone)' অর্থাৎ পীড়নজনিত উত্তেজক রসের ক্ষরণ বাড়ে। এইসব রাসায়নিক যৌন প্রাণীদের পীড়ন যন্ত্রণা কমায় বা দূর করে। আসলে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কিংবা অবস্থায় প্রাণীরা যাতে বেসামাল না হয়ে পড়ে বা মানিয়ে নিতে পারে তারজন্য প্রকৃতির এই রক্ষাকবচ। এসব কথা মাথায় রেখে বিজ্ঞানী কার্টার ও কোটনি মা প্রিস প্রেইরি ইঁদুরদের নিয়ে একটি পরীক্ষা চালান। সঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচন করেনি এমন একপাল স্ত্রী ও পুরুষ ইঁদুরকে তাঁরা কলকনে ঠান্ডা জলে মিনিট তিনেক সাঁতার কাটিয়ে ডাঙায় তোলেন। তাঁরা দেখেন, দৈহিক মিলন তো দূরের কথা, স্ত্রী-ইঁদুরদের সঙ্গী নির্বাচন পর্বও তখন দূর অস্ত্। ভয়ে তারা এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে ; চিৎকার করে পাড়া মাথায় করছে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে তাদের সময়ও লাগছে ঢের। পুরুষ ইঁদুরদের কিন্তু অত ভয়ডর নেই। দুরন্ত পরেই তারা সব সামলে নিচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সঙ্গিনী খুঁজে নিতে তারা যা সময় নেয়, বরং তার চেয়েও কিছু কম সময়ে কাজটি তারা সেরে ফেলতে পারছে।

প্রেইরি-ইঁদুররাও প্রাণী। মানুষও প্রাণী। মানুষেরও আছে সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন — মানে, প্রেমে পড়া। বন্ধুত্ব করা। 'ফুল' পাতানোর ধুম। সরলা উৎসব। তবে, প্রাণীত্বই মানুষের জীবনে সার ও শেষ কথা নয়। তার সমাজ আছে। সংসার আছে। আছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। পিটুইটারি গ্রন্থি ও হাইপোথ্যালামাস ছাড়াও তার মস্তিষ্কে আছে কর্টেক্স অর্থাৎ মস্তিষ্ক বল্কল — যার নাম তৃতীয় মস্তিষ্ক — সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্মস্থান। তাই, উত্তেজক রস ছাড়াও তার আছে রসবোধ। প্রাণীত্বের বেড়ি তার জীবন থেকে খসেনি বটে, তবে, খানিকটা হলেও, তা আলগা হয়েছে। তাই, নিজেকে সে খানিকটা ও খানিকক্ষণ বশে রাখতে পারে, যদিও আসলে তা অবদমন — যার আরও কেতাদুরস্ত নাম সংযম। এ কারণে, উত্তেজক রসের পুরোপুরি বাঁধা গোলাম সে নয়। কিন্তু তবুও, প্রেম-প্রীতি-রোমান্স ও যৌনাবেদনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের

মধ্যে আচরণগত তফাত চোখে পড়ে।

সচরাচর দেখা যায়, নারীরা এসব ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পরিবেশের ব্যাপারে বেশ সচেতন। যেখানে-সেখানে বা যখন-তখন এসবে তাদের রুচি বা স্পৃহা নেই। স্ত্রীসুলভ লজ্জাবোধ তাদের ঘিরে ধরে। তাদের অনেকে হয়তোবা বলতে চায় — "সোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর / ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর" — অর্থাৎ তাদের চাই নিরিবিলি — নিভৃত গৃহকোণ। তাদের কেউ কেউ আবার চৌকাঠ ছাড়িয়ে যেতে চায় নীল আকাশের নিচে — চায়, পাহাড়িয়া গুরুগাম্ভীর্য কিংবা সাগর-সৈকতের ঢল বাউল আর না হয় রাঙামাটির দেশে শাল মহুয়ার কুঞ্জ। কারও চাই বৈশাখী সন্ধ্যার দখিনা বাতাস কিংবা শ্রাবণধারা কিংবা মাঘের হিমানী অথবা ফাল্গুনের চন্দ্রালী রাত। কেউ চায় বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল কিংবা রক্তকরবী আর না হয় রজনীগন্ধা গুচ্ছ। কারও আবার একটি চুম্বনই যথেষ্ট। কেউ শুধু চায় চোখে চোখ রেখে নীরব অভিবাদন। তবে তাদের রোমান্স জাগে। কিন্তু তাই বলে, এমন নয় যে, পুরুষদের এসবের প্রতি আকর্ষণ নেই বা এসবের দরকার হয় না। তবে হ্যাঁ, এমন বহু পুরুষ আছে যাদের এসবের বালাই নেই। তাদের ব্যাপার-স্যাপার 'উঠল বাই / তো কটক যাই' গোছের।

যাই হোক, নারী ও পুরুষের আচরণে কেন এই তফাত? এই 'কেন'-র স্বচ্ছ কোন উত্তর জীব ও মনোবিজ্ঞানীরা আজও খুঁজে পাননি। হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছেন। তবে, নানা প্রাণীসুলভ ও মানবীয় ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা যা অনুমান করেছেন তা হল, স্ট্রেস হরমোনগুলি অক্সিটোসিনের কার্যকলাপে খুব সম্ভবত নাক গলায় ; হয়ত বা বাধাও দেয়। তাঁদের ধারণা, একাজ রক্তে নয়, ঘটে মস্তিষ্কে। সম্ভবত এই কারণে, অধিকাংশে নারী প্রেম-প্রণয় ও যৌন উত্তেজনায় যখন-তখন গা ভাসাতে চায় না বা পারে না। কিন্তু, ভ্যাসোপ্রেসিন — যা পুরুষকে প্রেমোদ্দীপ্ত করে বেশি, তাকে ঠেকাবার সাধ্য স্ট্রেস হরমোনগুলির নেই। এগুলির এই অক্ষমতা পুরুষদের লাগাম ছাড়া কামাবেগের ক্ষমতা জোগায়।

প্রেমের রূপকার হিসাবে অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন ছাড়াও আছে আরও কিছু যৌগ, যাদের সম্মিলিত নাম এন্ডোরফিনস্। এগুলির জন্ম ও কর্মস্থান দুই-ই মস্তিষ্ক। তবে, এগুলি হরমোন নয়। এগুলির কাজ মস্তিষ্ককে শান্ত করা ; ঘুম পাড়ানো ; এগুলি আসলে মাদকধর্মী যৌগ। উদ্ভিজ্জ যৌগ বরফিন বা হেরোইনের মত। এন্ডোরফিন যৌগগুলির ব্যথা বেদনা উপশমের ক্ষমতা আশ্চর্যজনক। তবে, অত্যাশ্চর্য এই যে, এগুলির কর্মকুশলতার জন্ম নেয় এমন এক অনুভূতি বা প্রেমানুভূতিকে ঘিরে তোলে আরও অর্থবহ, আরও আনন্দঘন। এর ফলে, গড়ে ওঠে মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্ক। একে অন্যের কাছে হয়ে ওঠে প্রিয়তম কিংবা প্রিয়তমা ; প্রিয় সখি কিংবা প্রিয় সখা। এন্ডোরফিন যৌগগুলির সাহায্য ছাড়া কেউ নাকি প্রেমরসের সার্থক রসিক হতে পারে না!

যাইহোক, আজকের জীববিজ্ঞানের এই ধারণার পেছনে রয়েছে প্রধানত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী ব্যাটি কেলেহ্নি ও তাঁর সতীর্থদের অতি সাম্প্রতিককালের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ ফলাফল। 'টালাপয়েন' বাঁদরদের নিয়ে এঁরা বিস্তর গবেষণা চালিয়েছেন। খুঁটিয়ে দেখেছেন প্রাণীগুলির আচরণ। এই প্রজাতির বাঁদরদের মধ্যে এঁরা যা লক্ষ্য করেছেন তা মানুষের বন্ধুত্বের সঙ্গে বেশ তুলনীয়। পুরুষ-বাঁদরদের আচরণ কিন্তু আলাদা। তারা মরমুখো ; মিলেমিশে থাকার ইচ্ছে নেই ; একা থাকতে চায়। কেমন যেন 'বেসামাজিক'। তুলনায় বাঁদরিরা অনেক বেশি 'সামাজিক'। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। দিনে তিন ভাগের এক ভাগ সময় একে অন্যের গায়ের ধুলোময়লা সাফ করে ; উকুন বাছে ; গা চুলকে দেয়। এদের লেজ বেশ লম্বা। এ ওর লেজে লেজ জড়িয়ে দিব্যি বসে থাকে। নিরুপায় না হলে কেউ কারও পেছনে লাগে না। গবেষণার স্বার্থে গবেষকরা এদের এই নিশ্চিন্ত 'মহিলামহল'-এর ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। তবে, তা সাময়িক। পরে আবার এদের জড়ো হতে দিয়েছেন। এতে এদের মহিলা মহলের আগেকার চিত্র আবার ফিরে এসেছে। পরস্পর বিচ্ছিন্নতার মানসিক চাপ বা উদ্বেগ সহজেই এরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। গবেষকরা দেখেছেন, আগের মতই এরা পুরোদমে পরস্পরের ধুলোময়লা সাফ করে ; উকুন বাছে ; গা চুলতে দেয় ; লেজে লেজ পাকিয়ে ঘোপনেজাজে বসে থাকে। আধুনিক পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে গবেষকরা মেপে দেখেছেন, বিচ্ছিন্নতার পর পুনর্মিলনের সময় বাঁদরিদের শরীরে এন্ডোরফিন যৌগের পরিমাণ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীরা ইদানীং জানাচ্ছেন, মানুষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ব্যাপার ঘটে। সেজন্যই মনে হয়, পুনর্মিলন উৎসবে মানব-কণ্ঠে উৎসারিত হয় :

"আয় আর-একটিবার আয়রে সখা,
প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের মুখের কথা কব,
প্রাণ জুড়াবে তায়।"

সে যাইহোক, 'টালাপয়েন' বাঁদরিদের এসব আচরণের ভিত্তিতে ওহায়োর যৌলিং স্টেট ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানী জাক প্যানকসেপ বলেছেন, "এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত কোন কোন ঘুমপাড়ানি মাদকধর্মী যৌগ — বিশেষত যেগুলি দেহের ব্যথাবেদনা নিয়ন্ত্রণ করে — সেগুলি মানসিক বিচ্ছিন্নতাবোধজনিত যন্ত্রণাও কমাতে পারে ; এমনকি, পারে দূর করতেও।" এঁর এই উক্তির পক্ষে রয়েছে জোরালো যুক্তি 'প্রেম'-এর বিপরীত হিসেবে আমরা যদি বটে 'ঘৃণা', কিন্তু, মস্তিষ্কের ঘুমপাড়ানি যৌগ নিয়ে যাঁরা গবেষণায় রত, তাঁরা সবাই একমত যে, প্রেম-প্রীতির বিপরীত হিসাবে ঘৃণা যাই হোক, কখনও ঘৃণা জন্মায় না ; বরং জন্মায় নির্বেদনা — তীব্র ক্লেষ — যা প্রশমিত করতে এন্ডোরফিন যৌগগুলি চেষ্টার ত্রুটি রাখে না। প্রিয় বা প্রিয়া কিংবা বন্ধুবিচ্ছেদের জ্বালা ভুলিয়ে দেয় অচিরে। তবে তাই বলে, এন্ডোরফিনের প্রভাবে কেউ তার প্রেমাস্পদকে ভুলে গেছে, কি বন্ধুত্বকে অস্বীকার করেছে, এমন কিন্তু ঘটে না। এমন প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।

এযুগের জীববিজ্ঞানের এসব তথ্য সেযুগের কবিদের উপলব্ধিতে প্রতিভাত হয়েছে সত্যরূপে : তাই, বড়ু চণ্ডীদাসের কানু বিরহিণী রাই যখন বলেন :

"নিশিথা পেলাই বোঁ গজ মুকুতার হার
মুখিয়ে পেলাই বোঁ কেশ পাইব সাগর
যোগিনী রূপ ধরি লইব কেশাঞ্চল
...
যদি কানু না ফিরিয়ে করমের ফলে
হাতে তুলিয়া মোঁ খাইব গরলে"

কিংবা কৃষ্ণবিরহে কাতর চণ্ডীদাসের শ্রীমতী রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে স্বগতোক্তি করেন :

"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে"

তখন আর যে ঘৃণা নয়, প্রগাঢ় প্রেমের মর্মবেদনা — তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে!

সকাম বা নিষ্কাম — প্রেমের বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন, রক্ত মাংসে ছাড়া প্রেম বলে কিছু নেই। দেহের কোন একটি বিশেষ অঙ্গ নয়, কোন অংশও নয়, এতে সাড়া দেয় সারা দেহ — মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। হৃদস্পন্দন বাড়ে। পাকস্থলী মোচড় দেয়। ঘেমে যান হয় রক্ত। একটি দেহ চায় আর একটি দেহের স্পর্শ ; আর, সারা দেহ কী এক আগুনে কেন তাপদগ্ধ হয়। "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তব (তবু) হিয়া জুড়ন না গেল" — বিদ্যাপতির এই পদ অপার সেই অনুভূতির কাব্যিক অনুরঞ্জন। সেই অবস্থাকে কাব্যালঙ্কারের নিগড়ে ধরতে চেয়েছেন কবি জ্ঞানদাস :

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।"

হ্যাঁ, ঠিকই — প্রেম অবশ্যই শরীরী তবে, শরীর সর্বস্ব নয়। প্রেম একই সঙ্গে মনসিজ এবং চেতনাশ্রয়ী। প্রাণস্পন্দে স্পন্দিত — অজস্র প্রাণভৌতিক আর প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সার্থক সমাহার। মনোশারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অনন্ত সূক্ষ্ম যে অনুভূতি, তারই নাম প্রেম। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেম তাই দেহ-প্রাণ-মন ও চেতনার সুবিন্যস্ত 'টিমওয়ার্ক' —

"আমার মন কেমন করে / কে জানে, কে জানে, কে জানে কাহার তরে" — থেকে থেকে এই তার আপ্লুত অনুরণন।

তাই, মস্তিষ্ক থেকে শুধুমাত্র হরমোন আর এন্ডোরফিন ক্ষরলেই প্রেমের নির্ঝর ঝরে না। অনুভূতিময় এই যে এমন প্রেম — এর নেপথ্যে রয়েছে সামগ্রিকভাবে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র, বিশেষ করে এর অন্তর্গত পরাসমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা। এক্ষেত্রে যে-স্নায়ুটির কর্মকৌশল অতি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল ভেগাস। এটি দশম ক্রোনিক বা শীর্ষক স্নায়ু। মস্তিষ্কের মেডালা অবলংগাটা অর্থাৎ মস্তুশীর্ষক থেকে বেরিয়ে শরীরের ভিতর গোলকধাঁধার পথে অজস্র শাখাপ্রশাখায় ঘিরে পৌঁছেছে নানা অঙ্গে। এগুলির কাজকর্মে সমন্বয় সাধন করা ভেগাসের অন্যতম প্রধান কাজ। তাকে তাই, মস্তিষ্ক ও শরীরের ভিতরকার নানা অঙ্গের মধ্যে সঙ্কেতবার্তা দেওয়া-নেওয়ার কাজ অনবরত করে যেতে হয়। অঙ্গগুলির অবস্থা-সংক্রান্ত নানারকম প্রতিবেদ সঙ্কেতে এই স্নায়ুর মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখী পথে পরিবাহিত হয় মস্তিষ্কে। তেমনি আবার, এসব সঙ্কেতের প্রেক্ষিতে নিম্নমুখী পথে মস্তিষ্ক পাঠায় প্রয়োজনীয় সাঙ্কেতিক নির্দেশবার্তা। সব বয়ে নিয়ে নিয়ে ভেগাস স্নায়ু পৌঁছে দেয় নানা অঙ্গে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, যৌনাঙ্গ ইত্যাদি পায় কত কি খবর, কত রকমের নির্দেশিকা। এসব মেনেই তাদের এবের পর এক কাজ করে যেতে হয়। নির্দেশিকার মাধ্যমে তাদের বুঝে নিতে হয়, জেনে নিতে হয়, ঠিক তখন কী কী কাজ কতক্ষণ তাদের করতে হবে, কখন থামতে হবে। হরমোন আর এন্ডোরফিনের রাসায়নিক সংস্পর্শে স্নায়ুগুলি উদ্দীপিত হয়। স্নায়ু বেয়ে ছোটে ইলেকট্রন। তার মানে বিদ্যুৎপ্রবাহ। সাঙ্কেতিক সন্দেশ ও নির্দেশ এই প্রবাহে অন্তর্লীন হয়ে পৌঁছে যায় গন্তব্যস্থলে। সুজটিল শারীর ও মনোশারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকাণ্ডে একদা, দ্যোতনা ও প্রেরণা জোগায়। অবশেষে দেহ-প্রাণ-মন জুড়ে অভিব্যক্ত হয় প্রেম-বাৎসল্য-প্রণয় ইত্যাকার আবেগ ও অনুভূতি। এ এক অপার বিস্ময় — সেই একই অক্সিটোসিন, একই ভ্যাসোপ্রেসিন, একই সেক্স হরমোন আর একই এন্ডোরফিনের অন্তর্নিহিত রাসায়নিক শক্তি কখনও পরিস্ফুট হয় ভালোবাসায়, কখনও বাৎসল্যে, কখনও দরদে, কখনও প্রণয়ে, কখনও বা মিত্রতায় ; আবার কখনও কামদেবের ভ্রূভঙ্গে ভরে দেয় শৃঙ্গার রসে! বস্তু থেকে শক্তি — এ যেমন সত্য, তেমন এও সত্য যে, সেই বস্তু থেকেই প্রেম। কিন্তু, এই যে বস্তু — যা দিয়ে গঠিত বিস্ময়ের আকর এই মানবদেহ — যার ভিত্তিতেই বিরাজমান দেহাশ্রয়ী এই মানবমন — সেই বস্তুই যে ঠিক কিভাবে, কোন্ 'যাদুমন্ত্র' বলে ব্যক্ত হয় প্রেমে, ব্যাপ্ত হয় আবার সেই দেহ আর মনে, তা আজও বিজ্ঞানীদের কাছে এক সুগভীর রহস্য!

স্মরণ করতেই হয় বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডবজানস্কির সুবিখ্যাত উক্তি "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution" — অর্থাৎ বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষিত না হলে জীববিজ্ঞানের কোন কিছুর তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া দায়। প্রমাণিত হয়েছে, বিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভেগাস স্নায়ুর একটি অংশে বেশ পুরনো, আর, এই অংশেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, যৌনতা ও শুকের মত আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রেমের অন্তস্তলে থাকে যৌনতার বীজ আর তাই, অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিনের 'ডাকে' সবচেয়ে বেশি সাড়া দেয় ভেগাসের এই অংশ। প্রেমের আবেগ, আবেদন ও পরিতৃপ্তিসূচক সঙ্কেতগুলিকে সঠিক সময়, সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে ভেগাস স্নায়ুর প্রবীণ এই অংশ এক কথায় অসাধারণ। এ যেন সেই বৃদ্ধা বড়াই কিংবা বৃদ্ধা ধাত্রী — প্রেমের বার্তাবাহিকা। মীন-উচ্চের-সরীসৃপ-স্তন্যের এবং সবার শেষে স্তন্যপায়ী আর তার শিরোমণি মনুষ্য-প্রজাতি — ক্রমবিবর্তনের এই যে ধারা —এই ধারায় ক্রমবিবর্তিত হয়েছে স্নায়ুতন্ত্র আর সে কারণে, ভেগাস স্নায়ুর কার্যাবলির যে ক্রমোন্নতি ঘটেছে একথা বলাই বাহুল্য। ফলে, প্রাণীসুলভ প্রেম বিকশিত হয়েছে মানবীয় প্রেমে।

প্রেমলীলায় ভেগাসের নতুন শাখাপ্রশাখাগুলির ভূমিকাও কম নয়। হৃৎপিণ্ড ছাড়াও, সেগুলি মস্তিষ্কের আবেগ কেন্দ্রগুলিকে মুখমণ্ডল ও স্বরযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছে। স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অনুবন্ধ হিসাবে মুখমণ্ডল জুড়ে পেশিতে পেশিতে ঘটে সঙ্কোচন, প্রসারণ ও কুঞ্চন। আর তাই, ফুটে ওঠে কত অভিব্যক্তি — নিঃস্বরণ, সুখ ও তৃপ্তি। কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শীৎকার। ওষ্ঠযুগলের কম্পনে, কখনও উন্মিলিত, কখনও বা মুদ্রিত দুই নয়নে কিংবা কখনও আনন্দাশ্রু মোচনে মূর্ত হয়ে ওঠে প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতি। না-বলা কথা তখন বলার চেয়েও বেশি করে বলা যায় — "অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি" — রবীন্দ্রকাব্যে এই যার মানসিক প্রকাশ।

প্রেম এক পক্ষীয় নয়। দ্বিপক্ষীয় তো বটেই, এমনকি বহু পক্ষীয়। তাই শুধুমাত্র নিজের অনুভূতি বুঝলেই চলে না। বুঝতে হয় অন্যের অনুভূতিকেও। কিন্তু, প্রতি সেকেন্ডে কয়েক অযুত তথ্য শুধুমাত্র শ্রবণযন্ত্র থেকেই নিয়ে পৌঁছোয় মানবমস্তিষ্কে। চোখ থেকেও প্রতি সেকেন্ডে মানবমস্তিষ্কে যায় কয়েক নিযুত তথ্য। এছাড়াও, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে মানবমস্তিষ্ককে গ্রহণ করতে হয় হাজার হাজার আরও কত তথ্য। এতো গেল বাইরে

থেকে পাওয়া সংবেদন। এর উপরে আছে শরীরের ভিতরের শত সহস্র সংবাদ-বিসংবাদ সংক্রান্ত তথ্য — সব ঘিরে পৌঁছোচ্ছে মানবমস্তিষ্কে! সব মিলিয়ে এই যে তথ্যের হিমালয়, এর সবগুলিতে সাড়া দিতে গেলে, সবকিছুকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে বসলে মস্তিষ্কের কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে। সে পেরে উঠবে না। তাই, বিপুল এই তথ্যের বোঝা থেকে দরকারি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলিকে কম বা অদরকারি ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিড় থেকে শুধুমাত্র 'আত্মনেপদী' কাজকর্মের ক্ষেত্রেই মস্তিষ্ককে বেছে নিতে হয়। তাই, প্রেম যেখানে নিজেকে ছাড়াও অন্যকে নিয়ে, সেখানে, এই বাড়াই-বাছাইয়ের কাজ মস্তিষ্ককে যে আরও নিখুঁতভাবে, আরও সতর্ক হয়ে করতে হয় — এ তো বলার অপেক্ষা রাখে না। নিজের অনেক কিছুকে তখন উপেক্ষা করতে হয়। কেননা, তা না হলে, অন্যের অনুভূতি ও আবেগসূচক সঙ্কেতগুলির প্রতি যত্নশীল হওয়া যায় না। সেগুলিতে মনোনিবেশ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

মস্তিষ্কের এসব কাজের সহায়ক হয়েছে ডোপামিন স্নায়ুর নতুন শাখাপ্রশাখা। এগুলি এসময় শরীরকে যতটা সম্ভব শান্ত থাকার 'অনুরোধ' জানায়; হৃৎপিণ্ডকে দেয় ধীরে চলার পরামর্শ। উদ্দেশ্য একটাই। মস্তিষ্কের আত্মনেপদী কাজের চাপ যতটা সম্ভব হালকা করা, যাতে তার পক্ষে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল নজর দেওয়া সম্ভব হয়। এসবের সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় মানবীয় প্রেম হয়ে ওঠে মানবিক; সুকোমল ও সুষমামণ্ডিত। রক্তাক্ত ললাটেও মানুষ তাই নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে পারে — "মেয়েছে কলসির কানা / তা বলে কি প্রেম দেব না!"

ডোপামিন স্নায়ু ছাড়া প্রেম তাই অবান্তর, এমনকি, অসম্ভবও। এসবই হল হাল আমলের কথা। জানিয়েছেন, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী স্টিফেন পোর্জেস।

মানতেই হয়, প্রেম জাগাতে দেহ জুড়ে এই যে এত আয়োজন, এত যে কারিকুরি, এমন যে মুনশিয়ানা — সত্যি, এর কোন তুলনা নেই। কিন্তু, তা হলে কি হবে, ঘটনা এই যে, মানবজীবনে তবু আজ প্রেমের আকাল!

* * *

এ আজ আর নতুন কোন কথা নয় যে, স্নায়ুতন্ত্রের শিরোমণি এই মানব মস্তিষ্কই মানুষের যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডের 'ব্যাডমাস্টার'। গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস আজ থেকে বহু বছর আগেই একথা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, "একমাত্র মস্তিষ্কই সেই অঙ্গ যা আমাদের হর্ষ ও বিষাদ, হাসি ও কান্নার উদ্রেক ঘটায়। মস্তিষ্কের মাধ্যমেই আমরা ভাবি, দেখি ও শুনি। শুধু তাই-ই নয়, অসুন্দরকে সুন্দর থেকে, কদর্যকে ভালোর থেকে, অনিষ্টকে নিষ্টান্ন থেকে পৃথক করতে পারি ..."

মানবমস্তিষ্কের পৃথকীকরণের এই যে আশ্চর্যজনক ক্ষমতা — তার এই যে সু ও কু, শুভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল বোধ — এজন্যই তা অসাধারণ। কিন্তু, বোধের আধার এই মানবমস্তিষ্ক বস্তুর বিকশিত সর্বোচ্চ রূপ হলেও, বিবর্তনের সর্বোৎকৃষ্ট ফসল হলেও, সর্বাংসহ নয়। পরিবেশের কাঠিন্যে, প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে কেসাজল হয় মানুষের স্নায়ুতন্ত্র; ফলে, ঘটে তার স্নায়বিক কাজকর্মের; পরিণামে, "মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয় — কোন এক বোধ কাজ করে —" এই যে বোধ — মানবমস্তিষ্কে যা তার শ্রেষ্ঠতম সংকলন — তার বিপর্যয় ঘটে; এবং শুধু তাই নয়, তা অন্তর্হিতও হয়। বোধহীনতার এই নিঃস্বতায় শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই যে মানুষের বাঁচে না। বোধহীন প্রেম তাই দিশাহীন, অর্থহীন, অর্বাচীন; কার্যত নিষ্ফল।

মানুষের সব বিত ঘিরে, মনন জুড়ে ঘনিয়েছে অদ্ভুত এক অন্ধকার :

"আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে-বিদেশে
যেখানে তাকাই — শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি।
এই এক আশ্চর্য সময়
যখন আশ্চর্য বলে কোন কিছু নেই।"

(মৌলিক নিষাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

অন্ধকারের এই অন্ধ গলিতে অবশেষে পথ হারায় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ সুকুমার প্রবৃত্তি। হিংস্রতার বিস্ফোরণে, আক্রমণের উগ্রতায় পাল্টে যায় তার স্বাভাবিক আচরণ। এ অন্ধকার এমনই আগ্রাসী যে, "মানুষ মানুষেরই জন্য / জীবন জীবনেরই জন্য" — মানবপ্রেমের এই আবেদন, এই মন্ত্রস্বরোৎ — মানব-মস্তিষ্কবন্ধনে আজ আর সহজে সন্ত্রাত হওয়ার নয়।

প্রজ্ঞাকণ্ঠিকত অসার এই অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত সেই অন্ধকার — মানুষ ও তার "মুখোমুখি বসিবার কলনতা সেন।" এই অন্ধকারে ফুরিয়ে যাচ্ছে মানুষ ও মানুষীর আলোক-আঁধারি সব গান।

তাই, হে পিতামহ, এই নিষ্ঠুর সময়ে, এই আশ্চর্য সময়ে — "শ্রা-পল্লবে ভাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে" — প্রেমোজ্জ্বল এই কাম্য অভিলাষ — বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের এই অন্ধকারে যদি অবলুপ্ত হয় — তা আর আশ্চর্যের কি!

"আমি প্রতিদিন শতবার স্মরণ করি যে, আমার মানসিক ও শারীরিক জীবন নির্ভর করছে জীবিত বা মৃত ব্যক্তিদের পরিশ্রমের উপর।

আমি যে খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছি, সে খাদ্য ফলাচ্ছে অন্য লোক। আমি যে পোশাক পরছি, সে পোশাক তৈরি করছে অন্য লোক। আমি যে গৃহে বাস করছি, সে গৃহ তৈরি করছে অন্য লোক। শৈশবকাল থেকে আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা পেয়েছি অন্য লোকের কাছ থেকে।

তাই যতটা পরিমাণে দান আমি পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি — ততটা দান করবার চেষ্টা আমাকেও করতে হবে।"

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ও কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নে

গণেশ নগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

পোঃ বারুইপাড়া
থানা - হরিহরপাড়া
জিলা - মুর্শিদাবাদ

আলী মহম্মদ মণ্ডল — চেয়ারম্যান
এনামুল হক — সেক্রেটারি
নজরুল ইসলাম — ম্যানেজার

শুধু সদস্যদের সার্বিক উন্নয়নই নয়,
সামাজিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণের মাধ্যমে
আমরা এগিয়ে চলেছি।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা স্টাফ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

৮, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

With Best Compliments From .

D.M.C. Employees' Cooperative Credit Society Ltd.

Regd No 158 *Dated 24.12.87*

CITY CENTRE
DURGAPUR - 16

With Best Compliments From

Dakshin Banga Rastriya Paribahan Karmachari Samabay Samity Ltd.

Regd No 3161 of 1964

Administration Building.
S.B.S.T. Corporation

Dr B. C. Roy Avenue
Durgapur - 713 201
West Bengal

With Best Compliments From :

Bishnupur Rowtara Primary Agriculture Credit Society Ltd.

Regd. No. 84/N Dt. 2.5.1961
ishnupur, P.O. Nadia Bishnupur, Nadia
STD - 03472, Phone : 49230

POSITION AT A GLANCE (1999-2000)

1	*No. of Branches*	2	
2	*No. of Members*	343+1	
3.	*Area of operation*	7 Villages	
4.	*Paid-up Share Capital ('A' Class)*	Rs. 1,46,723.00	
5.	*State Share Capital ('B' Class)*	Rs. 2,10,650.00	
6.	*Deposit Balance*	Rs. 92,21,364.00	
7	*S. T. (SAO) Loan Issued including M.T. Loan*	Rs. 24,98,230.00	
8	*Loan issued against Deposit*	Rs. 25,97,344.00	
9.	*S. T. (SAO) Loan Collection*		Rs. 25,33,551.00
10.	*Percentage of Collection*		100%
11	*Total Turnover (Rs. in Lac)*		
	a) *Fertiliser*		13.60
	b) *Insecticide*		0.85
	c) *Consumer Goods*		1.80

Net Profit - 1998-99 - 1.81 1999 - 2000 Audit Running
Accumulated Profit 1998-99 3.61 1999-2000

Santosh M. Das
Secretary

Sampad Kr. Das
Manager

Priyalal Bhowmik
Chairman

With Best Compliments From :

IOC (LPG) Kly. Workers Co-op. Labour Contract & Construction Society Ltd.

Regd. No. 12/86-87
P.O. Kalyani, Dt. Nadia
Phone No. : 582-4704

শারদ শুভেচ্ছা সহ —

বলগানা মার্কেটিং সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম বলগানা
জেলা : বর্ধমান গদর (২)

❋

হাটগোবিন্দপুর এস কে ইউ এস লি.

গ্রাম ও পোষ্ট - হাটগোবিন্দপুর
জেলা : বর্ধমান

❋

সামন্তি এস কে ইউ এস লি.

গ্রাম ও পোষ্ট - সামন্তি
জেলা বর্ধমান গদর (২)

❋

কালেশ্বর এস কে ইউ এস লি.

গ্রাম কালেশ্বর
পোষ্ট - কুচুট
জেলা - বর্ধমান (মেমারি ২)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION

WBFC

WBFC provides Term Loans and Working Capital Assistance (WCTL) to small and medium sector Industrial Units for setting up new units as also for expansion. Assistance under technology development and modernization fund scheme and or technology upgradation fund scheme is provided on convenient terms and conditions. The Corporation is placing special emphasis on financing down-stream industries of Haldia Petro-Chemical Complex.

The Corporation has a wide network of branches throughout the state of West Bengal.

For more details please write to or call at our District Branch Offices or at Head Office at

12A, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001
Telephone Nos. 220-0055, 220-3083, 220-3259, 220-4954
&
E-mail wbfc@cal2.vsnl.net.in

AVAIL HOUSE-BUILDING LOAN UPTO RS. 10.00 LAKHS

SALIENT FEATURES

- Maximum admissible loan is limited to the members of housing cooperative societies upto Rs. 10.00 lakhs, which depends upon the value of land, area and cost of construction, annual income of the individual members etc. etc.
- The loan is transferable at any time.
- Age limit upto 60 years or superannuation of the members, whichever is earlier, for the purpose of availing loan.
- Rebate for timely repayment on interest.
- The amount of loan is to be repaid within 20 years in 80 equated quarterly instalments @ Rs. 38.48 per thousand rupees for the amount upto Rs. 5.00 lakhs and within 15 years in 180 equated monthly instalments @ Rs. 15.04 per thousand rupees for the amount above Rs. 3.00 lakhs. The aforesaid rates will come down at the time of enjoyment of rebate.
- Maximum repayment period of loan is upto 20 or 15 years, as the case may be, and 60 years age of the members, whichever is earlier. If suitable guarantor is brought on at the time of attaining 60 years of age of the member, loan will continue uninterruptly for full period.
- Attractive terms for earlier repayment of loan.
- Loan coverage under L.I.C.'s Group Insurance Scheme is an excellent facility of the loanee-members on payment of nominal amount of yearly premium. The Scheme is as such that during loan period, if a loanee-member expires, the outstanding amount of the principal as on the date of expiry will be repaid by Life Insurance Corporation of India.

ADDITIONAL FACILITIES FROM OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS :

- Exemption from payment of Stamp Duty during loan period which allows breathing time to the loanee-members.
- Group Insurance facility which liquidates outstanding loan amount of loanee-member/ guarantor in case of death, which becomes anxiety free to the loanee-members as well as their successors.
- Higher quantum of loan considering annual income of member.
- Longer repayment period by way of equated instalments will suit repaying capacity even after enjoyment of higher quantum of loan.
- Enjoyment of maximum amount of loan, whatever may be the age within limit.
- Transferable right to another eligible member with loan liability.
- Pre-repayment of loan without payment of any surcharge.
- Minimum Processing Fee.
- Amount of repayments turns into concession under Income Tax Act.
- No collateral security or guarantor – save and except the first mortgage of the land and construction in question.
- Eligible for participation in the management of the Housing Federation.

For further information contact to –

WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE HOUSING FEDERATION LTD.

TODI MANSION (THIRD FLOOR),
P-15, INDIA EXCHANGE PLACE EXTENSION,
CALCUTTA-700 073; PHONES 236-5764/236-9424

Branch Offices :

Serampore	6521619	Ranaghat
Durgapur	546713	Berhampore
Asansol	203748	Malda
Midnapore	62556	Siliguri
Tamluk	66977	

" একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত দেহ লুটিয়ে পড়ুক, তোমারে এ সংসারে।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করলদা নিমকবাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি নং : ২৬-মিড, তাং ১৭/৫/১৯৪১
গ্রাম ও পো: করলদা নিমকবাড়, কাঁথি, মেদিনীপুর

সমিতির নিজস্ব কেরোসিন তেলের ব্যবসা ২০ বছর যাবৎ রহিয়াছে
মোট কর্জ দান প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা

অশোক পাত্র
সহ-সভাপতি

রণজিৎ জানা
সভাপতি

অবন্তিকুমার মাইতি
সম্পাদক

মনোরঞ্জন ওঝা
কোষাধ্যক্ষ

বেণুচরণ বর, চিত্তরঞ্জন বারিক
পরিচর্তা

বাজনা উঠেছে বেজে, প্রকৃতি উঠেছে সেজে
আনন্দময়ীর আগমনে, শুভেচ্ছা জনে জনে

তালদা ক্ষেত্রমোহন সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

(মিনি ব্যাঙ্ক)
রেজি নং : ১৫-মিড, তাং ১০-৪-১৯৪১
বনমালীচক, কাঁথি, মেদিনীপুর

জমা প্রকল্প
১। সেভিংস ডিপোজিট
২। রেকারিং ডিপোজিট
৩। টার্ম ডিপোজিট (৪৬ দিন থেকে ৫ বছর পর্যন্ত)
৪। ফিক্সড ডিপোজিট
৫। দৈনিক জমা প্রকল্প

ঋণদান প্রকল্প
১। স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ
২। সমিতির ফিক্সড ডিপোজিট বন্ধকি ঋণ
৩। এন এস সি, কে ভি পি বন্ধকি ঋণ
দীর্ঘমেয়াদি ও কৃষি ঋণ

দীপককুমার বর্মণ
সম্পাদক

হরেকৃষ্ণ দাস
ম্যানেজার

বিতানকুসুম পড়্যা
সভাপতি

"শারদ অর্ঘ"

দি ইস্টার্ন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

১০, স্ট্রান্ড রোড, কলিকাতা ৭০০ ০০১

"আমার ভান্ডার আছে ভরে,
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে"

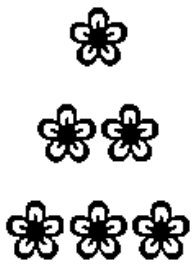

পঞ্চাশীক পেরার রেন্ডারের অদৃষ্ট সহযোগিতার আমরা আজ শতবর্ষের পথে এগিয়ে চলেছি।

তন্তুজ

পুজোর স্টক এসে গেছে

পুজোর বাজার করে নিন কিস্তিতে দাম দিন

উৎসবের সময় সকলের জন্য কেনাকাটা করতেই হয়। নিজের জন্য সারুন একটা তাঁতের শাড়ী পছন্দ হলো, কিন্তু বাজেটে কুলোচ্ছে না - এমনতো প্রায়ই হয়। সুন্দর একটা অভিজাত বেনারসী বা মনভোলানো জামদানী, কম্পিউটার ডিজাইনের টাঙ্গাইল শাড়ী, তসরের উপর কাঁথ স্টিচ, হ্যান্ড পেইন্টেড মুর্শিদাবাদ সিল্ক /গরদ অথবা প্রিয়জনের জন্য ১০০% কটন শার্ট বা সালোয়ার কামিজে নজর পড়তেই মনটা ছটফট করে ওঠে, এমন হামেশাই হয়।

এখন থেকে আর মন খারাপ করে ফেরা নয়। 'তন্তুজ' এনেছে কিস্তিতে কেনার অভূতপূর্ব সুযোগ পাঁচটি বা দশটি মাসিক কিস্তিতে আপনার চেক্ কেটে দিন। এর জন্য বাড়তি কোন সুদ লাগবে না। কোন ডকুমেন্টেশন চার্জ লাগবে না। কিস্তিতে দাম দেওয়ার এই সুযোগ আপাতত কেবলমাত্র সরকারী/আধাসরকারী অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক ও প্রখ্যাত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য। কমপক্ষে ২,০০০/ - সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকার তন্তুজ সামগ্রী কিনতে পারা যাবে এই প্রকল্পে।

এবার যত খুশি কিনুন, মনের মতন কিনুন।

কেবলমাত্র নিম্নলিখিত তন্তুজ শোরুমে এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে :-

◆ তন্তুজ ভবন (সল্ট লেক-ডি ডি-১৮/৪-নো রিবেট শপ সহ) ◆ পার্ক ষ্ট্রীট ◆ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ◆ গোলপার্ক ◆ গড়িয়াহাট মার্কেট নো রিবেট শপ (বিডনে) ◆ দক্ষিণাপন (চকুরিয়া) ◆ বৌবাজার ◆ শিয়ালদহ ◆ নতুন বাজার ◆ বেহালা (ম্যাডিন সুপার মার্কেট) ◆ শ্যামবাজার (নো রিবেট শপ সহ) ◆ জি.আই.পি. মার্কেট-কলবাগান ◆ উত্তরাপন (ডিস্টোডাঙ্গা, সিক্সিক সেন্টার) ◆ বারাসাত (কলোনী মোড়) ◆ হাওড়া ময়দান ◆ কলমন্দো ◆ বেলুড় ◆ উত্তরপাড়া ◆ শ্রীরামপুর (বি. পি. দে স্ট্রীট) ◆ কল্যাণী (সেন্ট্রাল পার্ক)

অথবা টেলিফোন করুন : ৪৭৪-৬৩৬৩

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন, ব্লক-ডি ডি, নং-১৮/৪, সেক্টর-১, বিধান নগর, কলিকাতা-৭০০ ০৬১

ADC: 1 sm

Golden Past, Golden Future

A dream turned into reality.

Achieving self- sufficiency in foodgrain production
was the major premise of fertiliser industry in India.
To ensure timely and proper availability of essential plant nutrients for
increasing crop production, IFFCO took birth in 1967.
With four modern & efficient plants at Kalol
and Kandla in Gujarat, and Phulpur and Aonla in Uttar Pradesh,
IFFCO is the largest producer and marketer of fertilisers in India today.
This is not all, IFFCO has now formulated an action plan " Vision for tomorrow" with
a view to become the largest producer of fertilisers in the world.
IFFCO has contributed in the development of cooperatives and helped
millions of farmers to reap bumper harvest year after year on
sustainable basis, maintaining the soil health.
It is truly the pride of Indian farmers and the cooperative movement.

IFFCO

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED

34, Nehru Place, New Delhi 110 019

একটি আবেদন

রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের প্রচার, প্রসার এবং সমবায় শিক্ষা-প্রশিক্ষণের দায়-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ওপর। সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নে কাজগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য — কিন্তু এই বিরাট দায়-দায়িত্বের তুলনায় ইউনিয়নের আয়োজন ও সামর্থ্য নগণ্য। রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নিজস্ব আয় বলতে কেবলমাত্র প্রদত্ত সদস্য-চাঁদা। দুঃখের বিষয় এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত সমিতিগুলির এক বৎসামান্য অংশই এই ইউনিয়নের সদস্য হয়েছেন এবং যাঁরা সদস্য হয়েছেন তাঁদেরও অনেকেরই সদস্য-চাঁদা বকেয়া পড়ে আছে — যদিও এই সদস্য-পদ গ্রহণ করা এবং নিয়মিত তা নবীকরণ করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। এই অবস্থায় সমিচ্ছা থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না

এই পরিস্থিতিতে, সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সমবায় সমিতিকে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্য-পদ অবিলম্বে গ্রহণ করার জন্য এবং যে সকল সদস্য-সমিতির সদস্য-চাঁদা বকেয়া আছে তা সত্বর জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মনে রাখবেন এই বিধান যদি কোনও সমবায় সমিতি লঙ্ঘন করে তাহলে প্রথমবারের খেলাপের জন্য তিনশো টাকা আর তার পরের প্রতিটি খেলাপের জন্য পাঁচশো টাকা করে জরিমানা ধার্য হবে।

[নিয়ম ৭১ (৩)-পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলি-১৯৮৭]

সভ্যদের সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর ৭১ নং নিয়মে নির্দিষ্ট বিভিন্ন স্তরের সমবায় সমিতির চাঁদার হার নীচে দেওয়া হল এবং একটি নমুনা দরখাস্ত-পত্র পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল।

বিনয়গোপাল মিত্র
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য দেয় কি

ইউনিয়ন বা সমিতির নাম	সদস্যপদ ফি	নবীকরণ ফি
(১)	(২)	(৩)
(এ) ব্যবসায় নিয়োজিত শীর্ষ সমিতি		
(বি) অন্য কোন শীর্ষ সমিতি		
(সি) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক		
(ডি) পৌর সমবায় ব্যাঙ্ক		
(ই) জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক		
(এফ) একাধিক জেলায় বিস্তৃত কার্যকর এলাকাবিশিষ্ট সমবায় সমিতি		
(জি) পাঁচ লক্ষাধিক টাকা কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট কর্মচারী কল্যাণ সমিতি		
(এইচ) ১৯৮৩ সালের পর রাজ্যভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহ আইনের আওতাভুক্ত সমবায় সমিতি :		
(এক) পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু দশ লক্ষ টাকার কম কার্যকর মূলধনবিশিষ্ট		
(দুই) দশ লক্ষ টাকার অধিক কার্যকর মূলধন বিশিষ্ট		

বিঃ দ্রঃ - সদস্য চাঁদা "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন" - এর নামে কলিকাতায় প্রদেয় ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট বা চেকে পাঠানো প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের
সদস্য-পদের জন্য আবেদনপত্রের নমুনা

_____ সমিতি লিমিটেডের পক্ষে আমি/আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য এতদ্দ্বারা আবেদন করিতেছি। আবেদনকারী সমিতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নিবন্ধীকৃত উপবিধির বিভিন্ন বিধান মানিয়া চলিতে এবং পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন, ১৯৮৩ এবং পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলি, ১৯৮৭-এর সংস্থান অনুযায়ী সকল টাকা প্রদান করিতে সম্মত আছে। অত্র সমিতির নিবন্ধীকৃত উপবিধির একটি সংখ্যা অত্র সহ জমা দেওয়া হইল।

★ যে ক্ষমতাবলে আমি/আমরা এই আবেদন করিতেছি তাহা এই আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রথিত হইল।

সমিতির নিবন্ধন সংখ্যা ও তারিখ :

_____

সমিতির নিবন্ধীকৃত ঠিকানা :

_____

_____

_____

সদস্য সংখ্যা : _____

_____ সমিতি লিমিটেডের

পক্ষে _____ সভাপতি

_____ সম্পাদক/

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক/পরিচালন সভালক

কি ধরনের সমিতি : _____

সদস্য সংখ্যা : _____

কার্যকরী মূলধন : টা: _____

এলাকাগত সীমানা : _____

সমিতিটি কি জেলা সমবায় ইউনিয়নের সদস্য ... (হ্যাঁ/ না) : _____

হ্যাঁ হলে সদস্যপদ গ্রহণের তারিখ : _____

★ দরখাস্তে উল্লিখিত ক্ষমতা যাহার বলে এই আবেদন করা হইতেছে

___ _____ তারিখে অনুষ্ঠিত _____

সমিতি লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলীর সভার কার্যবিবরণীর প্রযোজ্য অংশ :

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র ইত্যাদিতে স্বাক্ষর এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার জন্য শ্রী _____, _____ (পদ) এবং শ্রী _____ (পদ)-কে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।"

_____

সভার সভাপতি

শংসিত নকল

_____

(তারিখ ও সিলমোহর সহ স্বাক্ষর)

সমিতির সিলমোহর

গল্প

হলুদ পাখির পালক

ডা. দেবপ্রিয় মুখার্জি

আমার জীবনের স্বপ্নময় রঙিন কয়েকটা দিনের সঙ্গে যে জড়িয়েছিল তাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি, একটা ছোট্ট হলুদ পাখির পালক। অনেক খুঁজেছি আমি, চিড়িয়াখানার প্রতিটি খাঁচায় অনুসন্ধিৎসু চোখ নিয়ে দেখেছি, মৌসাল্লির মোড়ে প্রতি বছর যে রথের মেলা বসে সেখানেও পাখি বিক্রেতার কাছে খোঁজ করেছি, কোথাও পাইনি তাকে। প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ে অনেক বই পড়েছি তবুও তার চরিত্র আজও আমার কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। এটা হয়তো আমার ভ্রম, আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, কৈশোরে জীবনে যা আমি দেখেছিলাম এখন এতদিন পরে শুধুমাত্র তার রেখাটাই কল্পনা করতে পারি, শত চেষ্টাতেও তার সঠিক রূপ হয়তো দিতে পারি না। তাই সে আজও আমার কাছে অজ্ঞাত, সারা জীবনে তার সাথে আর আমার পরিচয় হবে না, জানা হবে না তার চরিত্রাবলি। সে উড়ে গেছে বহু দূরে শূন্য দিগন্তে, শুধু নিয়ে গেছে আমার প্রথম বসন্তের কয়েকটা দিনের আলাপন আর রেখে গেছে এক টুকরো স্মৃতি, একটা ছোট্ট হলুদ পালক, অদ্ভুত বেদনার নীরব স্বাক্ষর।

তখন আমার কতই-বা বয়স হবে, স্কুলে পড়ি, শৈশবের চপলতা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে তার বদলে এসেছে কিছুটা গাম্ভীর্য আর চোখেতে লেগেছে প্রজাপতির রঙ। কারও গভীর কালো দুটো চোখ দেখলে বারবার মনে পড়ে কবিতায় সেই লাইন —

'তুমি তো তাতার সওয়ার নও জানি।
তবুও চোখেতে কোটি অশ্বের বেগ।'

মনের চারিদিকে তখন ঘিরে আছে শুধু স্বপ্ন, একরাশ রঙিন কুয়াশার ফানুস যা বাস্তবের হাত ধরে কোনোদিনই পথ চলে না। স্কুল থেকে একদিন বাড়ি এসে দেখি খুব হৈ-চৈ। কি ব্যাপার — শুনলাম চিঠি এসেছে সামনের সপ্তাহে ছোট কাকার বিয়ে। বিয়ে হচ্ছে আমাদের শহরের ঠিক উল্টোদিকে পাহাড় পেরিয়ে বাঁকিপুর গ্রামে। বিয়ের আগের দিন বরযাত্রীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আমাদের বাড়িতে একত্রিত হবে, তারপর এখান থেকেই গাড়িতে চড়ে যাওয়া হবে বাঁকিপুর। ছোট কাকা তখন সবে ডাক্তারি পাশ করে উত্তরপ্রদেশ সরকারের চাকরি পেয়েছে। সুন্দর গড়ন, মোহময় চেহারা ছোট-কাকার, রীতিমত সুদর্শন — আমার সেই বয়সের 'হিরো'। আমার হিরো বিয়ের দু'দিন আগে আসছে। মনটা যেমন স্বাভাবিকভাবেই খুশিতে ভরে উঠলো আবার বাধও পেলাম একধিক থেকে; শুনলাম, আমার নাকি বিয়েতে যাওয়া চলবে না। কারণ, — পৈতে হয়েছে, এক বছর বাইরের খবের খাওয়া নিষিদ্ধ। বাবার কাছে বরবার করলাম, মায়ের কাছেও কোন ফল হলো না, মনটা দমে গেল।

বিয়ের দিন এসিয়ে এলো। ছোটকাকা এসে গেল। আত্মীয়-স্বজনেরাও একে-একে এসে গেল — এবার যাবার পালা। আমার মনের এতদিনের সঞ্চিত অভিমান এবারে একটা বলা শুরু করে কলকাতা বেয়ে উপরে উঠে এসে আমার কণ্ঠরোধ করলো, কারোর সাথে ভালো করে একটা কথাও বলতে পারলাম না। বর ও বরযাত্রীদের নিতে এলেন ভাই কাকিমার জ্যাঠামশাই ও দিদি। আমি দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দার এক কোণে, কাকিমার দিদি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন —"তুমি যাবে না ভাই?" — 'না', আমার কণ্ঠস্বরে হয়তো কোথেও অভিমান ছিল — উনি আর কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না। মাকে কাছে সব জেনে আমার যাওয়া-নাওয়ার সব ভার নিজের উপর নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলেন। বিয়েতে যাবার ছাড়পত্র পেলাম। এজন্য আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি যদি সেদিন না বলতেন, আমার যাওয়া হত না বিয়েতে। অনাবিল আনন্দের সাথে কিছুটা বিষাদ আর এক ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে দেখা দিত না আমার জীবনের প্রথম বসন্ত — কোনদিন হয়তো পরণ করতে পারতাম না — একটা ছোট্ট হলুদ পাখির পালক — জীবনের প্রথম স্পর্শসুখ — কৈশোরের প্রথম মধিনা-বাতাস।

অন্তরে অসংখ্য কৌতূহল নিয়ে বিয়ের আগের দিন গুনাগুনতির সঙ্গে জিপে করে রওনা হলাম প্রথম জিপটায় বসেছিলাম আমি ও আরও কয়েকজন বরযাত্রী। পিছনের গাড়িতে আছে ছোটকাকা ও অন্য গুরুজনেরা। দলের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ — সেজন্য হয়তো আদরও ছিল একটু বেশি — ছিল প্রশ্রয়ের আধিক্য — তাই ড্রাইভারের পাশেই সামনের সিটে বসার জায়গা হয়েছিল আমার। শীতকাল — চারিদিকে ছিল কাক-জ্যোৎস্না — পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে বেশ লাগছিল। একদিকে পাহাড়ের নিটোল বুক — অন্যদিকে গভীর খাদ। রাস্তার ধারে-ধারে সাদা রঙ করা মাইল স্টোন। আশে-পাশে গভীর জঙ্গল। চারিদিকে ঝি-ঝি পোকার কান্না — মাঝে-মধ্যে হুঁতির পাখির ডাক। সব ভেদ করে সর্পিল পথ বেয়ে চলেছি আমরা পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরের দিকে। মাঝে মাঝে শীতের হিমেল ছ-ছ হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, তবুও ভালই লাগছিল। ভাল লাগার হয়তো সংজ্ঞাই এই। দাঁতে-দাঁত চেপে অধীর আগ্রহে দু'পাশের প্রতিটি গাছ বুকের ঢেউ খেলানো পাহাড়,

নীচের দিকে ক্রমশ বিলীয়মান সমতলভূমি — প্রকৃতির সংসারের প্রতিটি টুকি-টাকি লক্ষ্য করেছি সেই নির্বাক রাত্রে। পাহাড়ের চূড়ায় যখন এসে পৌঁছেলাম মনে হল আমরা আকাশের কত কাছাকাছি চলে এসেছি। এবার নামার পালা। এদিকে পথ আরও বেশি সুন্দর, এঁকা-বেঁকা রাস্তা পাক খেতে খেতে নীচে — অনেক নীচে নেমে গেছে। দু'পাশের গাছ আরও বেশি ঘন হয়ে উঠেছে। এদিকে কোন খাদ নেই, দু'পাশেই পাহাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। গাছের ডালে ডালে ঘুমন্ত একশো পাখি হঠাৎ একসাথে চিৎকার করে উঠল, মনে হল, অনাহুত আগন্তুকদের দেখে ওরা ভয় পেয়েছে, গাছের কোটরে বসে থাকা পেঁচাও হয়তো ভাবছে এরা আবার কোন্ নিশাচর! ভাবী কাকিমার জ্যাঠামশাই বরযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "দেখুন, দেখুন, কি সুন্দর নিসর্গ শোভা। মনে হচ্ছে আমরা মহাপ্রস্থানের পথে চলেছি।" এই কথায় মাঝবয়সী এক বরযাত্রী তীব্র প্রতিবাদ জানালেন — "কি অলুক্ষণে কথা বলাই? আমরা এক শুভ কাজে যাচ্ছি, এ সময়ে আপনার এরকম কথা বলা খুবই অন্যায় ও আপত্তিকর।" জ্যাঠামশাই তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "মাফ করবেন, আমি সেরকম কিছু ভেবে কথাটা বলিনি।" বুঝলাম, অন্যায় কারোরই হয়নি, একজন শুধু এখনও অনাগত ভবিষ্যতের আশাতীত কল্পনার জাল বুনে চলেছেন, আর একজন নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে ওপারের ডাকের জন্য ব্যগ্র প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁর সোনার তরী আজ নিঃস্বের হয়ে গেছে — ফুরিয়ে গেছে জীবনের সব লেনদেন — তিনি আজ শূন্য, তিনি আজ অতীত — তিনি ভাবী কাকিমার জ্যাঠামশাই।

চার-পাঁচটা কুকুর হঠাৎ রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে ডেকে উঠল। অল্পক্ষণে আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। অভ্যর্থনারা প্রতীক্ষা করছিলেন। শিষ্টাচার ও আপ্যায়নের পালা শেষে আমরা একটা স্কুল বাড়িতে এলাম। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে কালবিলম্ব না করে লেপের তলায় আশ্রয় নিলাম। বরযাত্রীদের মন্তব্য কানে আসতে লাগল। কেউ বলল, এরা ভালই ব্যবস্থা করেছে, কেউ বলল দূ-উ-র এটা আবার একটা ব্যবস্থা নাকি, গিয়েছিলাম অমুকের বিয়েতে ইত্যাদি, ইত্যাদি। নানা রকম কথা। নানা রকম আলোচনা। বিছানালাপ শুনতে-শুনতে একসময় 'শিশিরের শব্দের' মতো আমার দু'চোখে নেমে এল ঘুম। আমি হারিয়ে গেলাম স্বপ্নময় জগতে — যেখানে আজও ডানা-মেলা পরিরা হাতছানি দেয়, বলে দেয় — ভাল লাগা আর ভালবাসার উৎসই হল অনন্ত।

পরদিন সকাল। 'সবাই উঠে পড়, উঠে পড়, অনেক বেলা হয়ে গেছে' — কে যেন ডেকে দিল। চোখ মেলে দেখি কুয়াশার চাদর জড়ানো সকাল। ঠান্ডা ঝনঝনে হাওয়া আসছে দরজা দিয়ে, গা-হাত-পায়ে ভীষণ ব্যথা, একটা আড়মোড়া ভেঙে লেপটাকে আরও একটু টেনে নিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলাম না, বেড-টি এসে গেছে, হাত-মুখ ধুয়ে ও বাড়িতে গেলাম। বোধহয় বয়সে ছোট বলেই ও বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত। বিয়েবাড়ি — সকলেই দেখলাম খুব ব্যস্ত। কাকিমার দিদি লুচি ভাজছিলেন, আমায় দেখে বললেন, 'এই আসনটায় বসে পড় ভাই।' আমার সাথে আরো অনেক ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে বসল। ওরা সবাই কাকিমাদের আত্মীয়। আমার সামনে যে মেয়েটি বসেছিল ফ্রক পরে, শুধু সে-ই বোধহয় আমার বয়সী হবে — হয়তো কিছু ছোটও হতে পারে। আর সকলের বয়স ছয় থেকে দশের মধ্যে। আমরা যারা খেতে বসেছিলাম তাদের মধ্যে আমি-ই ছিলাম বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং কিছুটা গম্ভীর। প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায় — ভাবলাম, গ্রামটা ঘুরে আসি, দেখে আসি — এখানকার রাস্তাঘাট, মাঠ, এখানকার মানুষজন, এখানের আদিবাসী। রাস্তা বলতে ঐ একটাই পাকা সড়ক, বাইরের দুনিয়ার সাথে একমাত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। কোন বাস, জিপ বা মোটরগাড়ি যখন গায়ে একরাশ ধুলো ছিটিয়ে পাশ দিয়ে চলে যায় তখন এখানকার লোকেরা কোনও ড্রাইভারের উদ্দেশে গালাগাল দেয় না, অভিসম্পাত করে না বরং অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সেইদিকেই। তাদের চোখের তারায় ফুটে ওঠে নির্বাক প্রশংসার বাণী — মানুষের সাফল্যের, ক্রমবিবর্তমান ইতিহাসের, মানুষের অগ্রগতির। রাস্তায় এখানকার কয়েকটা আদিবাসীকে দেখলাম, পরনে একটা খাটো নেংটি কাপড়, খালি গা, কাঁধের লাঠিতে বাঁধা খাবারের পুটলি, সুরেলা সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে মাঠের দিকে, সারাদিনের কাজ ওদের বাকি। ওরা এখানকার মেহনতি মানুষ। হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগিয়ে যেতে দেখতে পেলাম এখানকার থানা। এক সিপাহীকি বারান্দায় টেবিলে বসে খৈনি টিপছে, পা নোলাচ্ছে আর গুণগুণ করছে রামধুন। রাস্তায় দু'জন উলঙ্গ ছেলে একপাল ছাগল নিয়ে কোথায় চলেছে — কে জানে। হঠাৎ একটা লোক আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। তার পরনে ফুলপ্যান্ট, পায়ে জুতো, হাতে ঘড়ি, মনে হল ও লোকটা এখানকার চলমান জীবনের একটা ব্যতিক্রম। মিলের মধ্যে একটা অমিল। ও হয়তো শহরের স্কুলে কিছু লেখাপড়াও শিখেছে, তাই বাইরের ধার করা সভ্যতা নিয়ে এসেছে নিজের ঘরের আঙিনায়। বেলা বেড়েছে, সূর্য এখন মাথার উপরে। আমিও ধীর পদক্ষেপে ফিরে চললাম আমাদের ক্ষণিকের আস্তানায়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দার এক কোণে, ফ্রক পরা সেই মেয়েটি, যার সাথে সকালে বসে খেয়েছিলাম, একটা পান দিয়ে বলল, 'মামিমা পাঠিয়ে দিল', ওর সাথে এসেছিল আর একটা বাচ্চা মেয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কোথায় থাকেন।' — 'জামশেদপুরে', ছোট্ট উত্তর দিল সে। তখন কোন সমবয়সী অপরিচিতকে আপনি বলে সম্বোধন করলে মনে হতো অনেক বড় হয়ে গিয়েছি, আরও একটু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'আপনার নাম কি?' প্রথমে ভাসা দুটো কালো চোখ মেলে তাকালো মেয়েটি — তারপর ভুরু কুঁচকে তাচ্ছিল্য আর বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল, 'আমার নাম জেনে আপনার কি হবে? মেয়েদের নাম জানতে খুব লখ হয়, না?' আমি কিছুটা হতবাক। — ভাবছি কি এমন অন্যায় করলাম, 'দিদির নাম মিতা' হঠাৎ বলে উঠল বাচ্চা মেয়েটি, 'এই চুপ'. — এক ধমক দিয়ে বড় বড় পা ফেলে চলে গেল মিতা। 'তোমার নাম কি?' 'নীতা', বলল বাচ্চা মেয়েটি। তারপর এক-এক করে তার কাছ থেকেই জেনে নিলাম মিতার খুঁটিনাটি। আমার থেকে দু'ক্লাস নীচে পড়ে মিতা, ভাবলাম, কি দেমাক তার, কাছে পেলে বলে দিতাম, লরেটোতে পড়লেই হয় না, কি করে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় সেটা শেখা আগে দরকার। আমার সমস্ত পৌরুষ একসাথে জেগে উঠল মিতা চলে যাবার পর।

সন্ধ্যেবেলা। ছোটকাকাকে সাজাতে হবে। আমার ওপর ভার দেওয়া হল চন্দন নিয়ে আসার। ও বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কাকিমাকে সাজানো হচ্ছে। একজন ভদ্রমহিলা প্রসাধনরতা কনেকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি তো তোমার কাকিমা হতে যাচ্ছেন, কেমন লাগছে দেখতে — পছন্দ হয়েছে তো?" লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে আস্তে করে বললাম, 'হ্যাঁ'। ভদ্রমহিলা

বোধহয় শুনতে পাননি। আমি বললাম, 'একটু চন্দন দিন না — আমাদের চন্দন ঘুরিয়ে গিয়েছে। যে মেয়েটি একটা দেশলাই কাঠির ডগায় কাজল মাখিয়ে কনের চিবুকের পাশে একটা কালো ফোঁটা আঁকছিল, সে বলল 'একটু দাঁড়াও ভাই, দিচ্ছি।' হঠাৎ কোথা থেকে মিতা ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার সামনে, আমার দিকে তাকালো না একবারও। ও আজ খুব সেজেছে। মুটো দিয়ে ঘুলিয়েছে — ডাগর কালো প্রখর চোখে দিয়েছে কাজলের পরশ, সারা মুখে স্নো আর পাউডারের ছড়াছড়ি। ও নিজের চিবুকটা তুলে বলল, 'বীণাদি, আমার এখানেও একটা এঁকে দাও না।' সেদিন আমি প্রথম জানলাম, মিতা যা এঁকে দিতে বলেছিল, তার নাম — বিউটি স্পট।

বেশিক্ষণ বিয়ে দেখতে ভাল লাগল না — খুব ঘুম পাচ্ছিল। একা-একা স্কুলবাড়িতে এসে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। স্বপ্নে দেখলাম মিতা এসেছে, বলছে, 'কি দাদাই, কেমন বোকা বানালাম, আর কথা বলবেন? আগে মেয়েদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় শিখে আসুন।' ঘুম ভেঙে গেল।

পরদিন সকাল। আজ আমাদের যেতে হবে। ও বাড়িতে যেতেই, নীতা ছুটে এসে বলল, 'আমরা আজ বেড়াতে যাচ্ছি।' — 'কোথায়?' 'পাথরের পাহাড় দেখতে, যাবে?' কাকিমার দিদি বললেন, 'যাও না, দেখে এসো, ভাল লাগবে।' পাহাড়ের উপর একটা মাত্র গাছ আছে আর কোথাও গাছ নেই, সবটাই পাথর। কাকিমার জ্যাঠামশাই রোজ প্রাতঃ-ভ্রমণ করেন, আজ তাঁর সঙ্গে আমরা চললাম পাথরের পাহাড় দেখতে। আমি, মিতা আর নীতা। মিতা একটা লাল কোট পরেছে, মাথায় জড়িয়েছে একটা সাদা স্কার্ফ — বেশ মানিয়েছে তাকে। গ্রামের মেঠো পথ বেয়ে, কৃষ্ণচূড়ার মন মাতানো হাসিকে পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম পাথরের পাহাড়ের দিকে। কাকিমার জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি আর এই বয়সে পাহাড়ে উঠতে পারব না ভাই, তোমরা বরং উপর থেকে ঘুরে এসো, আমি এই পাথরটায় বসছি।'

আমরা পাহাড়ের উপরে উঠছি। এটাকে ঠিক পাহাড় বলা চলে না। পাহাড়ের তুলনায় এটা অনেক নিচু — চারিদিকে শুধু নিরেট পাথর, খাঁজ কাটা কাটা, উঠতে কোনও অসুবিধে হয় না। এরকম একটা বিরাট পাথরের চাঁই এর আগে আমি কখনও দেখিনি, এক টুকরো ঘাসের চিহ্ন নেই কোথাও, মাথার উপরে শুধুমাত্র একটা সবুজ নাম-না-জানা গাছ ডালপালা বিস্তার করে আছে। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ ভ্রমণ'-এর কথা মনে পড়ল ক্ষণিকের জন্য। আমরা যখন গাছটার কাছাকাছি পৌঁছলাম নীতা ছিল সবার আগে। আমার ঠিক দু'ধাপ ওপর থেকে মিতা বলল, 'এই নীতা শোন। দেখে যা আমি একটা জিনিস পেয়েছি।'

— 'কি রে দিদি' ছুটতে ছুটতে এলো নীতা।

— 'এই দ্যাখ, কি সুন্দর একটা হলুদ পাখির পালক।'

— 'কই দেখি', পালকটা হাতে নিল নীতা, 'ধ্যাৎ, এরকম আমি ঢের-ঢের দেখেছি', পালকটা ছুঁড়ে দিয়েই উপরে উঠতে লাগল নীতা।

— 'তুই জীবন পাখি হয়েছিস। ওটা ফেললি কেন?'

উপর থেকে খিল-খিল করে হেসে উঠল নীতা, 'বেশ করেছি।'

— 'চল বাড়ি, আজ তোকে মজা দেখাবো।' রাগে গজরাতে লাগল মিতা। তারপর দৌড়ে নেমে এলো পালকটার খোঁজে। ও হাঁপাচ্ছিল, জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল, তারই তালে তালে ওঠানামা করছিল ওর নরম বুক। পালকটা পড়েছিল আমার পায়ের কাছে, একটা ছোট্ট হলুদ রঙের পালক, কোন এক নাম-না-জানা হলুদ পাখির বেদনার ইতিহাস। আমরা একসাথে ঝুঁকে হলাম, হাত বাড়ালাম পালকটা নেবার জন্য। পালক সমেত মিতার হাত আমার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে এলো, তারপর জানি না কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, আমার শিরায়-শিরায় দ্রুত বয়ে গেল রক্তস্রোত। প্রতিটি রক্তকণিকা থেকে চিৎকার করে উঠল আদিম মানুষের পৈশাচিক বর্বরতা। চোখের তারায় তারায় ছড়িয়ে পড়ল ক্ষেপিল লোলুপ দৃষ্টি। আমার হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। মিতার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলাম, কাছে টেনে নিয়ে এলাম ওকে। ওর হৃদয় স্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমার শরীরের প্রতিটি অণুতে। ওর যে হাতটা আমার মুঠোর মধ্যে একদম ঘামছিল, ধীরে ধীরে সেটা স্থির হয়ে এল। মুহূর্তের উত্তেজনা স্তিমিত হল অবশেষের বিহ্বলতায়। প্রথম বসন্তের লাজুক শিহরণ উদ্বেলিত হল চেতনার বালুকাবেলায়। উদ্ভাসিত হল হৃদয়ের আঙিনায়। তারপর পেরিয়ে গেল উপলব্ধির প্রথম সোপান।

আমার দিকে স্থির, গভীর দুটো কালো চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মিতা। ভয় পেল, আমি জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করলাম। আরও নার্ভাস হয়ে গেলাম।

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল মিতা কয়েকটা ছোট্ট শব্দ ছুঁড়ে মারল আমার দিকে — 'অসভ্য কোথাকার।'

তারপর ওর সঙ্গে আর কোন কথা হয়নি। মনের ভাবনাগুলো ছট পাকিয়েছে ক্রমাগত। স্বপ্নের আকাশে আলস বাড়ির মতো একটা একটা করে ফেটেছে ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষার নীল বুদ্বুদ। মিতার সান্নিধ্যে না —ওর ব্যবধানেই তৈরি হয়েছে কল্পনার রঙিন ফানুস।

যাবার সময় হয়ে এল। এবার যেবার পালা। আমি বসলাম জিপের শেষ সিটে। বর-কনেকে বাড়ির সকলে বিদায় জানাল। ওরা মোটর গাড়িতে উঠে বসল। চারিদিকে উলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজ। আমার চোখ তখন শুধু একজনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল, যার কাছে আমি মনে-মনে অপরাধী। হঠাৎ দেখা পেলাম তার। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দুটো গভীর কালো চোখ মেলে চেয়ে আছে মিতা। দেখলাম, সে দৃষ্টিতে কোন ক্ষোভ নেই, কোন ঘৃণা নেই, কোন বিকৃতি নেই, সেখানে আছে শুধু আশা, সেখানে আছে আলো, আছে আশ্বাস। দুটো মুক্তার ছোট দানার মতো মিতার চোখের কোণটা চিক্-চিক্ করে উঠল। সামনের মোটর গাড়িটা ছেড়ে দিল — আমাদের জিপটাও স্টার্ট নিল। শেষ বিদায় জানালাম বাকিপুর গ্রামকে একলব্যের অধিবাসীদের, তাদের বাড়ি দু'দিন কাটিয়ে গেলাম তাদেরকেও, হঠাৎ নীতা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'দিদি তোমার এটা নিল, রেখে দিও।' কাগজের একটা মোড়ক, খুলে দেখি তাতে রয়েছে সেই ছোট্ট হলুদ পাখির পালকটা।

হু হু করে একরাশ ধুলো উড়িয়ে আমাদের জিপটা ছেড়ে দিল।

এখনও মাঝে মাঝে যখন অতীতের গান গেয়ে উড়ে যায় কোন পাখি, কিংবা যদি চলতি পথের মাঝে চোখে পড়ে গভীর কালো দুটো চোখ, বুকটা টন্-টন্ করে ওঠে, বাধার অদৃশ্য কাঁটা বেঁধে কোথাও, মনে পড়ে যায় সেই ছোট্ট হলুদ পাখিটার কথা ... যে উড়ে গেছে বহু দূরে শূন্য দিগন্তে, শুধু নিয়ে গেছে আমার প্রথম বসন্তের কয়েকটা দিনের আলাপন, আর রেখে গেছে এক টুকরো স্মৃতি, একটা ছোট্ট হলুদ পাখির পালক — অনুচ্চারিত বেদনার নীরব স্বাক্ষর। □

আপনার আনন্দঘন দিনগুলি কাটান

গোদরেজ কলকাতা কর্মচারীদের

সমবায় ঋণদান সমিতির উদ্যোগে পরিচালিত

পুরীর হলিডে হোমে

এই সমুদ্রমুখী চারখানি এক কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ হলিডে হোম

উদ্বোধন করা হয় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬-এ

পুরীর মনোরম বালুকাবেলায় গৌরাবারাসাইতে হরিভবনের বিপরীত বাড়ির তিন তলায়।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

গোদরেজ ক্যালকাটা এম্প্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

ব্লক : জি এন. সেক্টর - ৫
চতুর্থ তল, বিধাননগর
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

প্রবীরকুমার নাথ
সম্পাদক

কল্যাণচন্দ্র মণ্ডল
এস কানান
সভাপতি

ফোন : ৩৫৭-০৮৯৫/৯৯

পুরীর
সমুদ্র সৈকতে
আমাদের হলিডে হোমে
ছুটি কাটান

যোগাযোগ

সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টম্‌স্ এমপ্লয়িজ কনজ্যুমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লি.

১৫/১, স্ট্র্যান্ড রোড
(কাস্টম্‌স্ হাউস)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : ২৪৩ ৬৫৪৪

শারদীয় শুভেচ্ছা সহ :—

গণেশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.
(মিনি ব্যাঙ্ক)

গ্রাম : গণেশপুর
পো : দেবীপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ

With

Best

Compliments

From

MURSHIDABAD CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

Jayanta Roy
Chairman

ভরতপুর ১ নং ব্লকের
জজান ও গুন্দুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের
জনগণের সেবায় নিয়োজিত
নিজস্ব সমবায় —

জজান গুন্দুরিয়া অঞ্চল কার্মার্স সার্ভিস
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

(এখানে আমানত প্রকল্প চালু আছে)

গ্রাম ও পোঃ - জজান
জেলা : মুর্শিদাবাদ

With Best Compliments from :

JALPAIGURI CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

Thana Road
Jalpaiguri

A Reliable Institution for Long Term Lending.
Deposit Scheme introduced
Non deduction of Income Tax from Source.

কাজিসাহা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

(পঃ বঃ সরকারের অংশীদারী সংস্থা)

গ্রাম ও পোষ্ট - কাজিসাহা
জেলা - মুর্শিদাবাদ

—: আমাদের পরিচালিত বিভাগ :—

মিনি ব্যাঙ্ক

(সুবিধাজনক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সহ সমস্তরকম আমানতে টাকা জমা রাখা যায় এবং কৃষি ও অকৃষি ঋণ দেওয়া হয়।)

কৃষি সেবা কেন্দ্র

(সার, বীজ, কীটনাশক, ভোগ্যপণ্য, কৃষিজ উৎপন্ন ক্রয় বিক্রয় হয়।)

—: পরিষেবালয় :—

(চিকিৎসা, ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র)

মোঃ কাওসার আলী	মোঃ সেলিম রেজা	মহঃ জলালউদ্দিন
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

ফোন নং : রেজিঃ অফিস - ৬৬০-০৫৬২
৬৫০-২২২০

রামকৃষ্ণপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

রেজিঃ অফিস : ১৮/১, চারুচন্দ্র সিংহ লেন, হাওড়া - ১

কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা :—

- সকাল এবং সন্ধ্যা উভয় সময়েই ব্যাঙ্ক খোলা থাকে।
- আমাদের ব্যাঙ্কের প্রতিটি জমা প্রকল্পের সুদের হার যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি।
- আপনার ব্যক্তিগত গচ্ছিত টাকা নিরাপত্তার জন্য ডিপোজিট ইনসিওরেন্স ও ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশনের নিকট বীমা করা আছে।
- স্থায়ী আমানতের উপর তিনমাস অন্তর ও সঞ্চয়ী আমানতের উপর ছয়মাস অন্তর সুদ প্রদান করা হয়।
- জরুরি প্রয়োজনে আপনার স্থায়ী আমানতের (শতকরা ৮৫ ভাগ), স্থায়ী আমানত রি-ইনভেস্টমেন্টের (শতকরা ৮৫ ভাগ), পৌনঃপুনিক জমা প্রকল্পের (শতকরা ৮৫ ভাগ), ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটের (শতকরা ৭৫ ভাগ), কিষান বিকাশ পত্রের (শতকরা ৭৫ ভাগ) ও জীবন-বিমা পলিসির (সমর্পিত মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ) ঋণ পাইতে পারেন।
- সেফ্ ডিপোজিট ভল্ট(লকার)-এর সুবন্দোবস্ত আছে।
- সভ্যদের জন্য পুরীতে হলিডে হোমের আমন্ত্রণ।

জনতা কো-অপ. এগ্রি. ক্রেডিট সোসাইটি লি.

রেজিঃ নং - মিড ৪৫, তাং ৩০-১-৫৯

গ্রাম : ভোলসারা ::: পো : অমৃতবেড়া
শাখা : কেশবপুর, ::: জেলা : মেদিনীপুর

- এখানে সকল প্রকারের আমানত সংগ্রহ করা হয়।
- পান চাষের জন্য স্বল্পমেয়াদি লোন ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের মধ্যমেয়াদি লোন, মৎস্য চাষের জন্য লোন দাদন করা হয়।
- স্বাস্থ্য পরিষেবা হিসাবে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়ায় দেওয়া হয়।
- বিভিন্ন গ্রুপের রক্তের জন্য যোগাযোগ করুন।
- উৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়।

আমার ছোট বন্ধুরা,

"কাছে এল পূজার ছুটি।

রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপা ফুলের রঙ।"

এমন সময়ে প্রকৃতি জুড়ে মুঠো মুঠো খুশি শিউলি ফুলের মত ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট পাখীর পালকের মত খুশি উড়ছে তোমাদের চোখের পাতায়, চুলের ডগায়। তোমাদের মন বলছে কি করি কি করি! প্রকৃতি দিয়েছে তোমাদের দু হাত ভরে। বড়রা দিয়েছেন নানা উপহার। আমাদের এই প্রায় শতাব্দী প্রাচীন পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরাও সাজিয়ে দিলাম ছোট্ট এক ডালি — তোমাদেরই লেখায় কথায় ছড়ায় মজায় বিচিত্র সব উপচার। অবশ্য একটু আধটু বড়রাও রয়েছেন শূন্যস্থান পূরণের মত করে। ছুটির দুপুরে একলা ঘরে আয়েস করে ছোটদের পাতা জুড়ে তোমরা তোমাদেরই ছবি দেখতে পাবে — এই ছিল আমাদের প্রতিশ্রুতি। সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পেরে আমরা খুব খুশি। তোমরাও খুশি কিনা জানাতে ভুলোনা।

— সম্পাদক

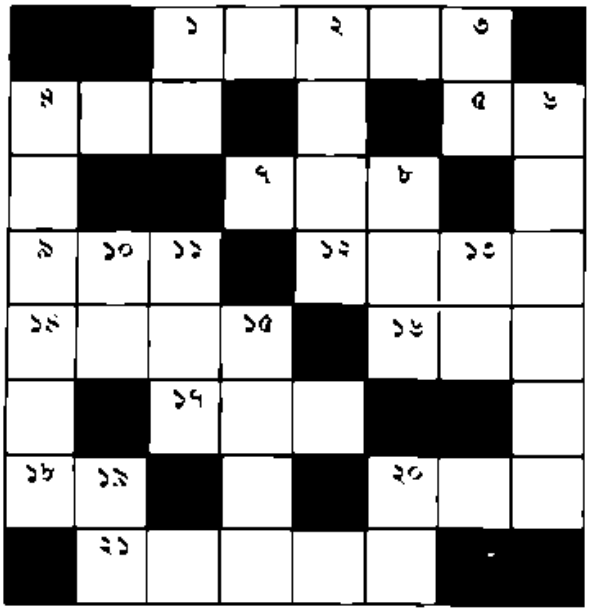

সূত্র : পাশাপাশি

ঘুম ভাঙা সেচ্ছাচারী,

ওঁদের তরি

এ ভবে সে কেউ নয়,

ঘুলটি বড় সৌরভময়

বলা না কি বলাই?

সূত্র : ওপর নিচ

নিজের লোক নয়কো সে,

লিপ্টিতে এই সভা বসে

উল্টে দিল গুনতে পান,

দুর্গা মাতার এগারো নাম

হচ্ছে পান উঠে দাঁড়াও,

খেলাই তবে চালিয়ে যাও

ছিঁড় থেকো লক্ষ্যে যে,

চিঠি তারে তাকেই।

বলতো কে? রাশিয়ার সম্রাট,

খারে নাকি? বলাই ঘাট।

এই যজ্ঞ ফেল্ল নও,

সে এসেছে উনু নও।

(সমাধান ছোদ্দ পৃষ্ঠায়)

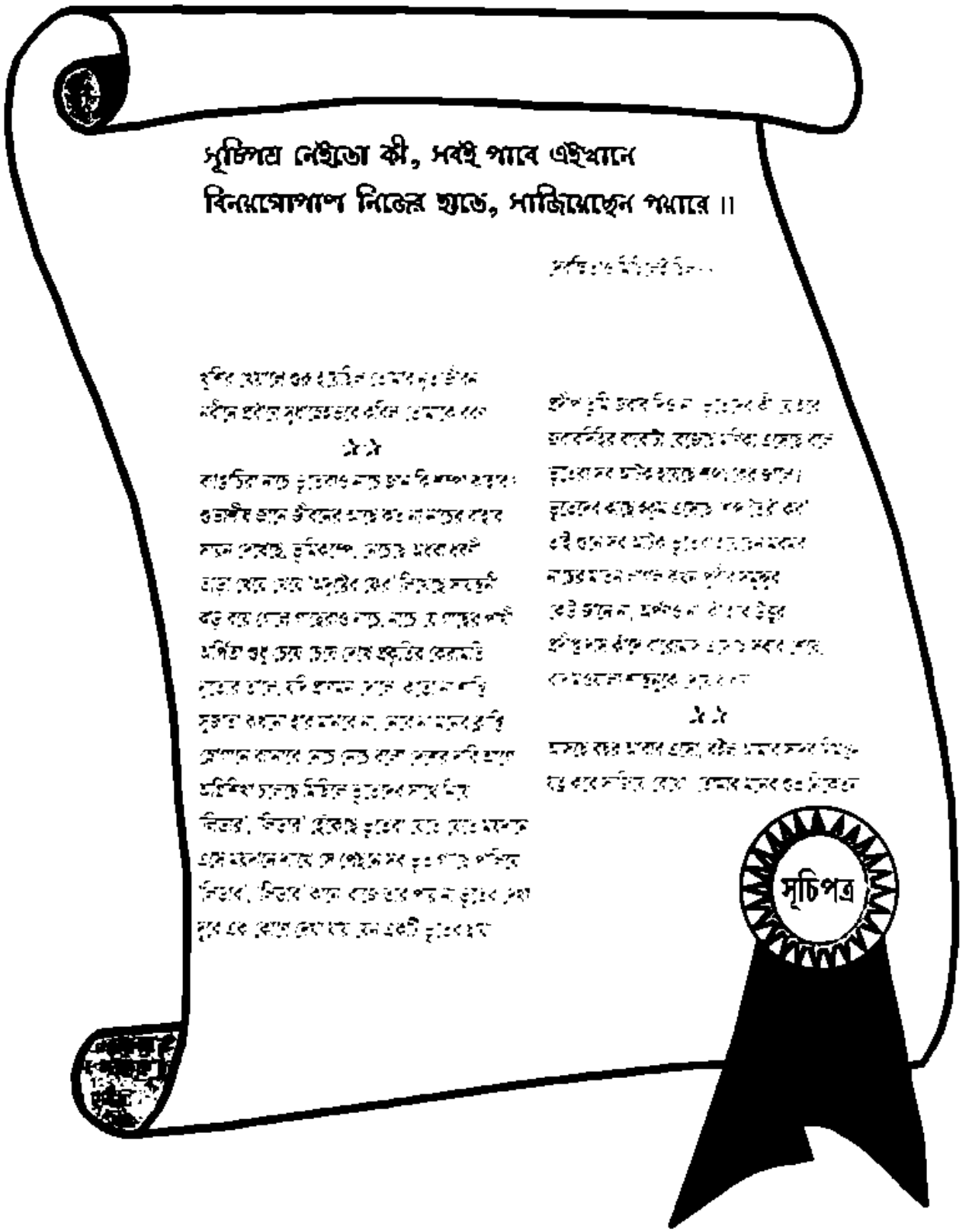

সূচিপত্র নেইতো কী, সবই পাবে এইখানে
বিনয়মোপাপ নিজের হাতে, সাজিয়েছেন পাথারে ।।

সূচিপত্র ও ঈশ্বরের ঈশ্বর

বৃষ্টির মেয়াদ ওর ২টি ন মেঘের দুঃ ঈশ্বর
নদীর ছবিতে মুখোমুখি ঈশ্বর মেঘের ধরে

১ ১

বাড়ন্তির নাড় দুঃখেরও নাড় ভয় দি লক্ষ্য হয়ন
ওভাবীর ভাগ্নে ঈশ্বরের মাস্ক ঈ না নাড়ার ধরে
নড়ন দেখেছ, ভূমিকম্প, নেতায় মরে ধরেন
ঢাড়া মেরে মেরে 'মহাবীর ফের' লিখছে সবকেন
বড় বড় মেঘ পাহাড়েও নাড়, নাড়ে যে পাহার পথি
মর্গিত গুহ চেয়ে চেয়ে দেখে প্রকৃতির ফেরামতি
দেবের চোখ, বদি প্রথমে দেখে ওঠেন বন্দি
সুভাষ ওখনে ধরে মনবে না, দেবেন মনের বুদ্ধি
ফোলানে ফোলাবে নেতা নেতা ফেরে দেবের বন্দি হয়ে
চরিশিখা চালেছে মিটারে ভূতেদের সাথে নিয়ে
'নিডার', 'ডিডার' হেঁকেছে ভূতেরা ঘোরে ঘোরে মরনে
এসে মরনের কাছে সে পৌঁছেন সব ভূত পাড়ে পরিবে
নিডারে', 'ডিডারে' ভয়ে ঘোরে ওরে পড়ে না ভূতের দেখা
দূরে ওই ফোলে দেখা যায় যেন একটি ভূতের ঘর

প্রতিপ ভূমি ভবে নিও না ভূতেদের কী ভূতের
ভাবনচিন্তির বাবেটা বোঝায় দেখিয়ে এসেছ ঘরে
ভূতেরা সব ভাবিত হয়েছে শুনে তোর ভাগ্যে।
ভূতেদের কাছে গল্প এসেছে 'গল্প নিয়ে ঘর'
এই ভয়ে সব ভাবিত ভূতেরা ঘোরে ভয়ন মরনে
নাস্তার মতন লাগে বড় দুঃখ সুন্দর
কেউ জানে না, মরনও না বাঁচার উত্তর
প্রতিপ্রশ্ন কাঁপে বোঝেনা এরা সবের শেষে,
কেন ওরকম শক্তিমান ভূত ঘরে

১ ১

মরনে বড় মরার এসে, বইটা মনের সবের নিয়ে
বড় ঘরে সাজিয়ে রেখো তোমার মনের ওর নিজের

গল্প

মধুর খাতির

একটা ছেলে ছিল তার নাম মধু সে পড়াশুনো পারত না। খানি দুষ্টুমি করত কিন্তু তার খুব বুদ্ধি ছিল সে স্কুলে গেলেই শিক্ষক গুরুতে হেড মাষ্টারমশাই র স্কুলের মুখ থেকেও. তার বাবা ও মা ভাবতেন মধুকে অনেক বকেন এবং অনেক উপহার কিনে দিলে হয় তো মধুর দুষ্টুমি কমবে।

একদিন মধু চিলেকোঠায় বসে বসে কি দুষ্টুমি করবে সেই ভাবছে ঠিক তখনই একটা বাচ্চা ছেলে বড় রাস্তার ওপর এলো এলো করছিল পেছন থেকে একটা লরি এসে পড়ল অনেকবার হর্ন দিয়েও সরাতে পারল না তাকে। মধু তখন নীচে নেমে এসে ভাবছে কি করে ছেলেটাকে বাঁচানো যায়।

লরিটা ছেলেটার খুব কাছে চলে এসেছে কিন্তু ব্রেক করতে পারছে না তখন মধু এক ছুটে গিয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে জাপটে ধরে নিয়ে রাস্তার একপাশে ছিটকে পড়ল। তখন প্রতিবেশীরা সবাই এসে মধুকে কোলে নিয়ে এবং মা বাবার কাছে গেল

মধু তখন তার মা বাবাকে বলল, — আমি আর কোনদিন দুষ্টুমি করব না
এবং সব লোকেরা মধুকে অনেক আদর করলেন এবং অনেককিছু উপহারও দিলেন।

প্রদীপ্ত রঞ্জন দাস
দ্বিতীয় শ্রেণী
বি স্তচিন চাঁ কলেজিয়েট স্কুল

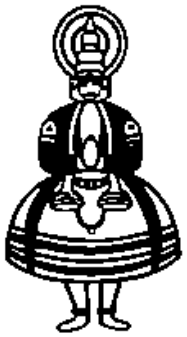

রম্য স্মৃতিকথা

নৃত্যজীবনে আমার প্রথম পদক্ষেপ

শুভাশীষ শী
অষ্টম শ্রেণী
হুগলি কলেজিয়েট স্কুল

আমি হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং ভরতনাট্যম-এর এক কিশোর শিক্ষার্থী। আমি ছেলে হয়েও নাচ শিখি এই নিয়ে অনেকে সমালোচনা করে, আবার অনেকে উৎসাহ দেয়। আমি ছেলেমেয়ে বুঝি না, আমি নাচ শিখি আনন্দ পাই বলে। নৃত্য আমাকে আনন্দ দেয়।

আমার নৃত্যজীবনের সূচনা এক আশ্চর্য ঘটনার মধ্য দিয়ে। মায়ের মুখে শুনেছি যখন আমার তিন বছর বয়স তখন টি ভি খুলে দিলেই গান ও নাচের সাথে সাথে আমি নাচতাম। আমার নাচ দেখে আমার মাসিমণি ও মামতুতো দিদি পূজা বিশ্বাস এবং আমার জেঠামশাই আমার বাবা-মাকে বলতেন আমাকে নাচ শেখানোর জন্য। আমার শিশুমনে তাঁদের ঐ কথাগুলি গেঁথে গিয়েছিল। আমার মাসিমণির কথা বারবার শুনে আমিও নাচ শেখার জন্য খুব বায়না ধরেছিলাম। আমার মা ও বাবা কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেননি। আমার মায়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমি গান শিখি। কারণ কি জানি না হয়তো আমার মায়ের অতৃপ্ত ইচ্ছার জন্য তিনি আমাকে গান শিখতে উৎসাহিত করতেন। সেদিন মায়ের এই ইচ্ছা ও বাবার তীব্র আপত্তিও আমার নাচ শেখার ইচ্ছাকে একটুও দমন করতে পারেনি। যাই হোক, আমার জেদ-এর কাছে শেষ পর্যন্ত আমার বাবা মা হার মানলেন। দিনটি ছিল ১৯৯৫ সালের ১০ই জুলাই। বাবা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে আমাকে তাঁর সাইকেলে চাপিয়ে চুঁচুড়া শহরে নাচের স্কুলের সন্ধানে বেরোলেন। দু-একটি নাচের স্কুলে জিজ্ঞাসা করলে স্কুলের দিদিমণিরা সাফ জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের ওখানে কোন ছেলেকে নাচ শেখানো হয় না। আমার বাবা এমনিতেই রেগে ছিলেন তার উপর ঘুরতে ঘুরতে আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আমার বাবা সহজে কিছু বলেন না কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুব রেগে আছেন। নাচের স্কুলের সন্ধান না পেয়ে আমরা ফিরে আসছি। আমার শিশুমনে সেদিন যে কি কষ্ট হচ্ছিল তা বলতে পারব না। ছোট্ট একটি শিশুর এই বেদনা হয়তো সেদিন নটরাজ, সদাশিব বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের ফেরার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। তাই আমরা ছুটে গিয়ে একটা স্কুল বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সেই স্কুল বাড়ির একটি ঘরে তখন ঘুঙুরের আওয়াজ হচ্ছে। সেই ঘুঙুরের আওয়াজ আমাকে বিচলিত করে তুলল। আমার বাবাও হয়তো আমার মনের ভাষা বুঝতে পারলেন। তিনি আমার হাত ধরে ঘরে কাছে নিয়ে গেলেন তিনিই আমার নৃত্যশিক্ষা জীবনের প্রথম গুরু শ্রদ্ধেয় অমল কুমার নিয়োগী। আমি তাঁর কাছে নাচ শিখতে শুরু করলাম। তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞান উজার করে নাচ শেখাতে লাগলেন। আমি তাঁর নৃত্যশিক্ষার মধ্যে প্রবল আনন্দ খুঁজে পেলাম। আমার ছোট্ট মনের সাধ পূর্ণ হল।

আমার এই স্বল্পকালের নৃত্যশিক্ষার মধ্যেই এক আশাতীত সুযোগ এসে যায়। ১৯৯৯ সালে এক বিশেষ কারণ উপলক্ষ্যে আমার গুরু অমল নিয়োগী মহাশয় তাঁর গুরুমা শ্রীমতী ধান্যমণি কুট্টির নৃত্যশিক্ষাকেন্দ্র কলিকাতা কলামন্ডলমে আমাকে নিয়ে যান। সেখানে আমি ধান্যমণি কুট্টিকে নাচ দেখানোর সুযোগ পাই। ধান্যমণি কুট্টি আমার নাচ দেখে আমার গুরু অমল নিয়োগী মহাশয়কে বলেন আমাকে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করে নিতে। আমার বাবা ও মা সমস্যাভাবের জন্য আমাকে কলামন্ডলম-এ ভর্তি করার ব্যাপারে একটু আপত্তি করেছিলেন। যাইহোক অবশেষে তাঁরা রাজী হন। আজ আমি কলামন্ডলম-এর একজন ছাত্র। পৃথিবী বিখ্যাত ভরতনাট্যম বিশারদ আমাকে স্বয়ং শিক্ষাপ্রদান করছেন। আমার এই অল্প বয়সে এবং চার বছরের নৃত্যশিক্ষা জীবনে আমি এই সুযোগ পাব তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এও বোধহয় সর্বশক্তিমান নটরাজেরই কৃপা। আমি যতোই ধান্যমণি

কুট্টির কাছে নাচ শিখছি তাই অহঙ্কার হয়ে যাচ্ছি। ধাত্রুমণি কুট্টি যিনি ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁর আজ ষাট বছরের উর্দ্ধে বয়স, তিনি কত সাবলীলভাবে আমাদের সঙ্গে নাচছেন এবং নাচের ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন! আমি আমার এই স্বল্প বয়সে এমন এক জগদ্‌বিখ্যাত আন্তর্জাতিক নৃত্যগুরুর পাদপদ্মে স্থান পাবো তা ভাবতেও পারিনি

১৯৪০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কেরালার এক গ্রামে ধাত্রুমণি কুট্টির জন্ম। তিনি ভারত বিখ্যাত গুরু রাজারত্নম্ পিল্লাই, গুরু অক্কপ্পাচনম্ পিল্লাই এবং শ্রীমতী চিন্নাম্মু আম্মার কাছে ভরতনাট্যম ও মোহিনীনাট্যম শিক্ষা করেন। তিনি ১৯/১১/১৯৫৪ তারিখে কেরালার কলামন্ডলম স্টেডিয়ামে তাঁর সর্বপ্রথম নৃত্যপ্রদর্শন করেন। ১৯৫৬ সালে ত্রিভাঙ্কোরের মহারাণী ভরতনাট্যমের জন্য তাঁকে স্বর্ণপদক দেন। ১৯৫৬ সালে নবনির্মিত বৃন্দাবনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজের জেলায় জেলায় তিনি ভরতনাট্যম প্রদর্শন করেন। ১৫/০১/'৫৮ তারিখে বিখ্যাত কথাকলি নৃত্যবিদ্ গুরু গোবিন্দন কুট্টিকে বিয়ে করে কলকাতা শহরে আসেন। তারপর থেকে তাঁর চলার পথের আর শেষ নেই। স্বল্পসময়ে তাঁর খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে পেলাপের সৌরভের মত বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৮৩ সালে তিনি জাপান, থাইল্যান্ডে নৃত্য প্রদর্শন করেন। ১৯৮৪ সালে ব্রিটেনে দীর্ঘদিন ধরে নৃত্য প্রদর্শন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি ব্রিটেনে তাঁর ৫টি নৃত্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৯২ সালে তাঁকে 'নৃত্য শিরোমনি' পুরস্কারে ভূষিত করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 'নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা একাদেমী' পুরস্কার দেওয়া হয় এবং ১৯৯৭ সালে তাঁকে 'ভারত নির্মাণ ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়।

আমি এহেন নৃত্যগুরুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর পাদপদ্মে স্থান পেয়ে আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি। জানিনা আমি আমার সেই শিশু বয়সের নৃত্যের নামে হাত-পা ছোঁড়া থেকে সত্যিই কেমনভাবে এক নৃত্যশিল্পী হয়ে উঠব কিনা। তবে এটুকু জানি আমি নটরাজের পাদপদ্মে স্মরণ নিয়েছি এবং অসীম প্রতিভাময়ী গুরুর পায়ে স্থান পেয়েছি। এটিই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের বিরাট প্রাপ্তি। **ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ।।**

জবাবদিহির বারোটা

- চতুর্ভুজের একটা হাত না থাকলে কি হবে?
- সর্বঘটে কাঁঠালি কলা লাগে। কিন্তু কেন ঘটে কেন কলা লাগে না?
- কেন দেশে দূর্গ নেই?
- কোথায় কিছু খেলা হয়নি আর কোথায় কিছু কেউ খেলেনা?
- কেন দেশে খবর আছে আবার খাবারও আছে?
- কোথায় কোন জাতি থাকেনা?
- দুটো দিন পরপর হয় না কেন?
- কেন জায়গার মানুষ হ্যাঁ না একসঙ্গে বলে?
- কেন দেশের মধ্যে কোন পথ নেই?
- মানুষের তৃতীয় হাত কোনটি?
- কলকাতার কেন জায়গা কলকাতা নয়?
- ঘোড়ার ডাকের প্রচলন কে করে প্রথম চালু করে?

সংকলন : প্রদীপ রঞ্জন দাস

(উত্তর চোদ্দ পৃষ্ঠায়)

শান্তি

কবিতা

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের এই ভিড়ে ভরা দিনে,
সত্যি যদি শান্তি চাও মনে —
মোদের বাড়ির বারান্দাতে এসে,
কাটিয়ে যেও ঘন্টাখানেক বসে।

✣✣

শান্ত পুকুর সামনে আছে পড়ে,
গাছ আছে তার চারটি দিক ঘিরে।
সবুজ মাঠ রয়েছে ঢাকা ঘাসে,
মোদের বাড়ি দাঁড়িয়ে এক পাশে।

✣✣

শান্ত পুকুর আছে জলে ভরা,
মাছ আছে তায়, দেয় না তারা ধরা।
সেথায় আছে সবুজ কচুরীপানা,
আর আছে ভর্তি ব্যাঙের ছানা।

✣✣

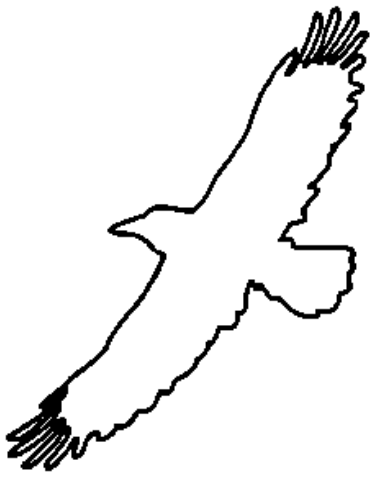

শান্ত পুকুর, ঘিরে রয়েছে ঘাস
শ্যাওলা-শালুক অনেক পাখির বাস
গাছগুলো সব ফুলে-ফলে ভরা,
পাখির গানে ভুবিয়ে রয় ধরা

✣✣

একপাশেতে মন্দ রয়েছে ছোট্ট,
সেথায় যেতে ছোট্ট ছেলে-মেয়ে।
সেথায় ওরা গরু-বাছুর চরে,
ফেরে ঘরে সন্ধ্যা হলে পরে
তারই একপাশে মোদের বাড়ি পড়ে,
দেখতে পাবে যখনি তবে সবে
নিচের থেকে বারান্দাতে চ'ড়ে,
সেইখানেতে বসতে তখন পাবে
পুকুর ধারে সেই আমাদের বাড়ি,
সেথায় বসে শান্তি নিয়ে করবে ওড়াওড়ি

দেশের দাবি আগে

নীল আকাশের পারে
শাদা মেঘের খেলা,
মেঠোসুরের দোলায় ভেসে
রোদ বিষ্টির মেলা।

ফুটলো সরোজ নীল সায়রে
শিউলি ফোটে শাখে,
মধুর সুবাস ছড়িয়ে তারা
মাকে আবার ডাকে।

অগ্নিশিখা নাথ
অষ্টম শ্রেণী
বেথুন কলেজিয়েট স্কুল

বাজছে শাঁখ, উলুর ধ্বনি
ঢাকি বাজায় ঢোল,
চারি দিকে উঠলো বেজে
জয়ধ্বনির বোল

হাজার মানুষ হাজার শব্দ
হাজার খুশির মাঝে,
যেন ভুলে না যাই শেষ জননীর
ব্যথা কোথায় বাজে।

একটি ভূতের গল্প

দেবস্মিতা বসু
ষষ্ঠ শ্রেণি
বিবেকানন্দ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

পুজোর ছুটি উপলক্ষে ২১শে অক্টোবর আমি বাবা মা আর আমার ছোট বোন সবাই মিলে খড়্গপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেদিন বিকেলে পৌঁছিয়ে আমরা একটি ঘর ঠিক করলাম। ঘরটি বেশ বড়। চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং এসব আসবাব থাকা সত্ত্বেও বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল কেমন যেন নিস্তব্ধ থমথমে ওই ঘরটির নামে একটি বদনাম আছে তবুও বাবা নিয়ে রাখা হয়েছিলেন কারণ আর কোথাও জায়গা ছিলনা। খেয়ে দেয়ে গল্পগুজব করে শুয়েছি প্রায় রাত বারোটা, সবে ঘুম এসেছে। এমন সময় দেওয়ালে, ছাদে ও মেজায় শুনি ধুপ-ধাপ, ধপ-ধপ ক্রমাগত কে যেন আওয়াজ করে চলেছে। আর খালি খালি যেন গলার আর্তনাদ ঘরের চারপাশে খুব ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। ঘরের সব জিনিষ ঠিকঠাক জায়গামত আছে। হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ পড়ল। দেখি আবছা একটি ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটি সুন্দরী রূপসী মেয়ের ছবি পরিষ্কার ফুটে উঠল আয়নার বুকে। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপে। বোধ বুদ্ধি হারিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছি। এমন সময় দেখি মেয়েটি আয়নার থেকে নেমে ক্রমশ আমার দিকে এগোচ্ছে। দেখে তো আমি ভয়ে প্রায় অজ্ঞান। সে এসে আমার মাথার কাছে বসে বলল, ভয় কোরনা। এই বলে সে আমার মাথায় তার নরম হাত বুলোতে লাগল। তার হাতের স্পর্শে আমার সমস্ত শরীর একেবারে হিম। চেঁচাব যে সেই ক্ষমতাটুকুও রইলনা। আমি ফালফাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আমাকে একের পর এক গল্প শোনাতে লাগল। গল্পগুলি ভারি সুন্দর। পঞ্চম গল্পটা শেষ হব-হব এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। চারপাশে সুন্দর রোদের ছটা খেলছে। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কোথায় বা সেই মেয়ে! পরে চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এই ঘরে প্রায় বছর আগে এক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন। ভদ্রমহিলা নাকি আত্মহত্যা করেন। আবার এখানকার স্থানীয় লোকেরা বলে উঁকে তাঁর স্বামী খুন করেন এই ভদ্রমহিলার অতৃপ্ত আত্মা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে দিয়েছে আর তার বলা গল্পগুলো আমার সুন্দর স্মৃতি হয়ে রয়েছে। কোনদিন সুযোগ পেলে সেই গল্পগুলো তোমাদের শোনাব

ব্যাঙাচি

শম্পা কাহার
সপ্তম শ্রেণি
বিবেকানন্দ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

এক যে ছিল ব্যাঙাচি
তার গায়ে হল ঘামাচি
চুলকে মরে বেচারা
শুকিয়ে গেল চেহারা

মা ভেবে হল খুন
ভয়ে তার মুখটি চুন
ভিজিট দিয়ে পাঁচ সিকে
আনলো ডেকে বদ্যিকে

সেরে গেল ঘামাচি
নাচে খুশি ব্যাঙাচি

ব্রেক নাচে ব্যাঙাচি
ভাঙড়া নাচে ব্যাঙাচি
এ আও - আও - আও
জলদি জলদি খানা লাও।

গল্প

বা দা ম ও য়া লা

শান্তনু মন্ডল
সপ্তম শ্রেণী
বলাগাছিয়া কর্পোরেশন বিদ্যাপীঠ

সকাল থেকে সকালে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি — বাজ পড়ার শব্দ। আজ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। বাড়ির কাছের কামারদার সেই ঐতিহ্যমন্ডিত রথের মেলা। বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু দর্শকের সমাগম হয় এই মেলায়। চারিদিকে মাইক্রোফোনের আওয়াজ, হকারদের চিৎকার, বাঁশির শব্দ, হাসি কান্নায় মুখর হয়ে ওঠে এই মেলা প্রাঙ্গন। মন-কেমনের মিষ্টি গন্ধে বাতাস সুবাসিত।

প্রতিবারের মত এবারও নিশ্চয়ই মেলা বেশ জমে উঠবে — ভাবতে ভাবতে বিকেল গড়িয়ে এল। বৃষ্টি থেমে গেছে। বিকেলের পড়ন্ত রবি ডালপালার ফাঁক দিয়ে হাসতে লাগল। শেষ বেলাকার কিরণ যেন এক স্বপ্নমধুর পরিবেশ সৃষ্টি করল।

এমন সময় আমার সহিত কেরে দাদার ডাকে। দাদা ডাকল — 'সন্ধ্যে হয়ে এল শান্তনু, মেলায় যাবি না?' আমি নিরুত্তর রইলাম। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সামান্য অভিমান করে বলল — 'হুম্!...বুঝতে পেরেছি, আমি যেতে চাইছি কিনা তাই তুই যাবি না।' সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম — 'আচ্ছা, আমি যাব। তুমি তৈরী হয়ে নাও।'

শেষ পর্যন্ত মেলায় পৌঁছলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মেলা প্রাঙ্গনে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠেছে। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ঘরে ফিরছে—হাতে বেলুন আর বাঁশি। তাদের হাতে পাঁপড় ভাজা দেখে আমি যেন আমার শৈশবকে ফিরে পাচ্ছি। মেলার ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। পুণ্যার্থীরা পুণ্যার্জনের জন্য রথ টানছে। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা নাগর দোলায় ঘুরছে বনবন। মরা মানুষের কথা শোনার জন্য বায়োস্কোপের ঘরে ঢুকলাম। জান্তব মানুষের 'মরণ কুঁয়া' দেখে রোমাঞ্চিত হলাম।

হঠাৎ বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার সময় দেখি মেলার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে এক বাদামওয়ালা, বাদাম বিক্রি করছে। দেখে দাদা বলল — 'শান্তনু আজ তোর পয়সায় বাদাম খাব।' বহুবার দাদার পকেট ফাঁক করে খেয়েছি, আজ আর না বলতে পারলাম না।

বাদামওয়ালাকে বললাম— 'দাদা, দু'টাকার বাদাম দিন তো।' বাদামওয়ালা অনন্দের সঙ্গে বলল— 'দিচ্ছি ভাই', বলতে বলতে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বাদামওয়ালা বাদামের প্যাকেটটা সবার হাতে দিল। পয়সা দিতে যাব, হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমার জামার পকেটে একটা দু'টাকার ছেঁড়া নোট ছিল। বহু চেষ্টা করেও চালাতে পারিনি। আর এই সময় এই নোটটা বাদামওয়ালাকে দেওয়া যায় তাহলে সে বুঝতে পারবে না।

যেই না ভাবা, অমনি কাজ। নোটখানি দিয়েই দ্রুত পায়ে হন হাঁটা। কিছু দূরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভাবলাম— যাক, অন্তত টাকটা কাজে লাগাতে পেরেছি।

ইতিমধ্যে বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে। পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর — ওনছ! ও ভাই ওনছ? ঘুরে দেখি বাদামওয়ালা। ওনে মনে হল — এইরে, কি বিপদ। মনে হল এক্ষুনি হয়ত লোকজনের সামনে অপমান করবে। ভয়ে ভয়ে ওর কাছে গেলাম।

বাদামওয়ালা শান্ত স্বরে বলল — 'এই নাও তোমার মানিব্যাগ। লোডশেডিংয়ের সময় ওখানে পড়ে গিয়েছিল।' হাত পেতে ব্যাগ নিলাম। কিন্তু নড়তে পারলাম না। বিবেক এসে চাবুক মারছে। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পিটছে।

মনে হল — নোংরা ময়লা পোশাকের আড়ালে অশিক্ষিত বাদামওয়ালার এত বড় মন!

আর বাহারি পোশাকের মধ্যে আমি কোন মনকে পুষছি! আমার শিক্ষার মূল কোথায়? এ মনের কালিমা কি দূর করতে পারব.....!

ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরলাম।।

জান কী ?

- একজন মানুষ ঘুমের মধ্যে প্রায় ৪০বার এপাশ ওপাশ করে। যার নিদ্রাহীনতায় ভোগে তারা এপাশ ওপাশ করে প্রায় ৭০ বার।
- ব্রাজিলে এক জাতের প্রজাপতি আছে যার রং চকোলেট, গন্ধও চকোলেটের মত
- তোমার শরীরের ভেতর যে সব রক্তবাহী শিরা উপশিরা আছে তাদের যদি টেনে সোজা করা যায় তবে লম্বায় দাঁড়াবে ১০০,০০০ মাইল। ৪বার বিশ্ব রেখাকে প্রদক্ষিণ করেও যথেষ্ট অবশিষ্ট থেকে যাবে।
- অলবার্ট আইনস্টাইন জুরিখের ফেডারেল পলিটেকনিকে ভর্তির পরীক্ষায় প্রথম সুযোগে পাশ করতে পারেননি
- পিপড়েরা তাদের নিজের ওজনের চেয়ে ১০ গুণ ভারি পাথর তুলতে পারে এবং ৩০০ গুণ ভারি বোঝা টেনে নিয়ে যেতে পারে।

আমরা মিনিটে ২৫ বার চোখের পাতা ফেলি

১৪৬২২০৪৭৯৯৯ কে ১০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ৯, ৯ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ৮, ৮ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ৭ এবং এইভাবেই চলতে থাকে।

"The quick brown fox jumps over the lazy dog" — এই বাক্যটির মধ্যে সবকটি ইংরাজি অক্ষর রয়েছে

যেকোন পূর্ণ সংখ্যার সাথে সাত সংখ্যার যেকোনো যদি ঐ পূর্ণ সংখ্যা থেকে বিয়োগ করা যায় তাহলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তা ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে

মানুষের ও পাউন্ড ওজনের মস্তিষ্ক বিশ্বের সবচেয়ে জটিল এবং সবচেয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো পদার্থ।

- ভিক্টর ইয়াকোভ বোট করে একা নর্থ আটলান্টিক পাড়ি দেবার সময় নিজের হাতে নিজের সার্জারি করেছিলেন। কেমন করে? বস্টনের ডাক্তার ভেবিড করলিন প্রায় অর্ধেক পৃথিবী দূরে বসে ই-মেলের মারফৎ তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।
- একই ফুটবল টিমে ৩ জোড়া যমজ? সান অ্যান্টোনিওর জোম হাফিস হাই স্কুলের টিমে একই মরসুমে ৩ জোড়া যমজ ফুটবল খেলেছে।

সংকলন : মণিকা পালিত

গল্প

অদৃষ্টের ফের

সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা
ক্লাস সেভেন
দে মেমোরিয়াল

"আজ কী মজাই না হবে, না রে রঙ্কা", রিঙ্কি রঙ্কাকে বলে। "হাঁ" উত্তর দেয় রঙ্কা "আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে রে" বাড়বে আর কখন যে ওরা ওখানে গিয়ে পৌঁছবে সেটা নিয়েই রঙ্কা ও তার ছোট বোন রিঙ্কি আলোচনা করছিল।

রঙ্কা আর রিঙ্কি দুজনের মধ্যে খুব ভাব। কলকাতাও হয় মাঝে মাঝে তবে বেশিক্ষণ না। এক সময়ের মধ্যেই ওদের দুজনের ভাব হয়ে যায়। দুজনে মা-বাবার সঙ্গে ভবনীপুরে থাকে। শেখরবাবু ও তুলসীবৌ মাঝে মাঝে রঙ্কা ও রিঙ্কিকে নিয়ে বেড়াতে যান। দুজনের মধ্যে রঙ্কাই বড়। ও পড়ে সাউথ পয়েন্টের ক্লাস 'ফাইভে'। যেন রিঙ্কিও ঐ একই স্কুলের ক্লাস টুতে পড়ে। বাবা শেখর সেন একজন নামকরা ডাক্তার ও মা তুলসী সেন সাউথ পয়েন্টেরই একজন শিক্ষিকা।

ওদের আর্থিক দিক দিয়ে কোনরকম অসুবিধেই ছিল না। তাই একদিকে রিঙ্কি শিখছে নাচ, গান, ছবি আঁকা, কম্পিউটার ও অন্য একদিকে রঙ্কা শিখছে আঁকা, কম্পিউটার ও ক্রিকেট। একটা জিনিসই ওদের দেখা বাকি ছিল সেটা হল সাঁতার। শেখরবাবু ঠিক করেছিলেন যে ঘুরে আসার পর ওদের দুজনকে সাঁতারে ভর্তি করে দেবেন। ওঁরা দু-তিনদিনের জন্য চন্দনপুরে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। শেখরবাবুর বোন 'তুলসীর' বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ ছিল। তাই দুই ভাইবোনের এত আনন্দ। সেদিন সাড়ে ছটার ট্রেনে ওদের যাবার কথা ছিল।

ইতিপূর্বে রঙ্কা বা রিঙ্কি কেউই গ্রাম দেখেনি। নির্দিষ্ট সময় মত ওরা ট্রেনে উঠল। ওখানে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন বাজে রাত ৮টা। রাত ৮টা মানে কলকাতার রাত ১০টা। তাই সেদিন কিছুই দেখা হল না। পরদিন ছিল বিয়ে। সেই দিনটা খুব আনন্দ করে কাটল ওরা সবাই। রঙ্কা আর রিঙ্কিরও খুব ভাল লাগল। এরপরদিনই ওদের ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সবার অনুরোধে শেখরবাবু থেকে যেতে বাধ্য হলেন। ঠিক হয় যে সেদিন ওঁরা রঙ্কা ও রিঙ্কিকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবেন। এবং ঘটনাটা হঠাৎ করে ঘটে গেল সেদিনই। কোথা হতে হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া এসে তছনছ করে দিল ওদের সংসারটাকে।

সারাটা দিন ঘোরার পর বিকেলে রঙ্কা ও রিঙ্কি খেলছিল। আশেপাশে অন্য কেউ ছিল না। নিজের মজাতেই রিঙ্কি একটি পুকুরের ধারে চলে আসে এবং ধার পিছল থাকায় পা হড়কে জলে পড়ে যায়। ভয় পেয়ে ও চেঁচিয়ে রঙ্কাকে ডাকে। বোনের গলার আওয়াজ পেয়ে রঙ্কাও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগেই বলেছি দুজনের মধ্যে কেউই সাঁতার জানত না। তবুও রঙ্কা অনেক চেষ্টা করে বোনের প্রাণ বাঁচাল কিন্তু নিজে বাঁচতে পারল না। ততক্ষণে চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এসেছে। অনেকে মিলে এবার রঙ্কার মৃতদেহ তুলল। শিউরে উঠলেন তুলসীবৌ। একেবারে যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন।

এরপর তুলসীবৌ আর কোনও দিনও কথা বলেননি। ডাক্তার হয়েও ছেলেকে বাঁচাতে না পেরে ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছিলেন শেখরবাবু। আর রিঙ্কি ? সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। হয়ত সে আজও খুঁজছে এর দাদাকে

শব্দ তৈরী কর

ম	গ	ো	অ	ন	ো	য			= ৫
ব	া	ণ	ব	ত	া	র			= ৫
চ	র	ি	চ	ি	ি	প	ত	র	= ৬
স	ল	ু	ব	ক	া	ভ	ল		= ৬
ম	্	া	ধ	ণ	ম	গ			= ৫
ত	ক	া	া	স	জ	ম	া	ি	= ৫

প্রতিটি শব্দের নির্দিষ্ট মান দেওয়া আছে। অক্ষর পিছু ১ নম্বর বরাদ্দ। তুমি তোমার মত ছকে দেওয়া অক্ষর ও চিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরী কর। দেখ কত পাও। আমাদের তৈরী শব্দগুলি ঠেকে না পৃষ্ঠায় দেওয়া হল

নিবন্ধ

মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ভূমিকম্প

সায়ন সরকার
অষ্টম শ্রেণী
হলদি কলেজিয়েট স্কুল

প্রলয় কাল থেকে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করেও মাঝে মাঝে তার ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হাঁয় হাঁয় করে প্রকৃতি এমন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে যে মানুষ নিঃসহায় হয়ে নিজের প্রাণ রক্ষার সকল চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়। পৃথিবীর কোন না কোন কোণে কখনও ঝড়, ঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদিকে ধ্বংসের চরম সীমায় পৌঁছে দেয়। ১৯৯৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ভোর-ভোরে এ রকম এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প মহারাষ্ট্রের ব্যাপক অঞ্চলে অনুভূত হয়।

পূবের আকাশে তখন নবারুণের রক্তিম ছটা দেখা দেয়নি। মুহূর্তে ওসমানাবাদ আর লাতুর জেলার সহস্র মানুষ ঘুমের মধ্যেই চমকে ওঠে। একি সামরিক ভ্রান্তি! না, ভুল নয়।

বস্তুতের কম্পনে হাজার হাজার মানুষের হাহাকার আকাশ বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বার বার চার বার ভূমিকম্প অনুভূত হয় যার পরিমাপ ছিল রিখটার স্কেল অনুযায়ী ৭.৫। লাতুর জেলার ওসমা এবং ওসমানাবাদ জেলার কিলারী শহর দুটি মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও বহু গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। কংক্রীট পাকা বাড়িগুলিও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যেন এক শ্মশান পুরী। যারা বেঁচে ছিল তারা ধ্বংসস্তূপে খোঁজে তাদের আত্মীয় স্বজনকে। তারা বেঁচে আছে কিনা দেখে।

মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প মনে করিয়ে দেয় আরও ভূমিকম্পের কথা। অসহায় মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু করার উপায় ছিলনা।

মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প নিয়ে বিজ্ঞানীরাও যথেষ্ট চিন্তিত। তাঁরাও ব্যাপারটা ধরতে পারেননি।

এরপর যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে উদ্ধারকার্য চলে। মানুষকে সাহায্য করা হয় খাবার-পানীয় দিয়ে। এছাড়াও ঘরবাড়ি সরকারি সাহায্যে পুনস্থাপন করা হচ্ছে।

এই ভূমিকম্পে বোঝা যায় পৃথিবীর বা প্রকৃতির কাছে আমরা কত ছোট। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের সমবেদনা জানাই।।

ভ্রমণ

আমার পুরী ভ্রমণ

অর্পণ ভট্টাচার্য্য
অষ্টম শ্রেণী
বালি ব্রাঞ্চ স্কুল

গত ৭/৬/২০০০ তারিখে আমি ও আমার দাদা পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম ক্যাম্পের মারফত। ক্যাম্পটি কেন ট্রেকিং ক্যাম্প নয়। পুরীতে তো আর খুব বড় পাহাড় নেই যে ট্রেকিং ক্যাম্প হবে। আমরা গিয়েছিলাম ক্যারাটে ক্যাম্পে। গত কয়েক মাস ধরে আমি ক্যারাটে শিখছি। মে মাসে আমাদের ক্যারাটের শিক্ষক আমায় বলেন যে পুরীতে ক্যাম্প হচ্ছে। রাজী হয়ে গেলাম। ৭ তারিখ বিকালে মালপত্র গুছিয়ে আমি, দাদা ও বাবা চুঁচুড়া স্টেশনে মিলিত হলাম আমাদের ক্লবের ক্যারাটে শিক্ষক ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে। সন্ধ্যা ৬টায় বর্ধমান লোকাল ধরলাম। বাবা আমাদের তুলে দিয়ে চলে গেলেন। ৭.৩০ এ আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখানে অন্যান্য স্থান থেকে আগত ক্যারাটে ক্লবের লোকেরা মিলিত হলেন আমাদের সাথে। তারপর একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সবার গায়ে নিজের নিজের পরিচয়পত্র লাগিয়ে নেওয়া হল। সব ঠিকঠাক হলে রাত ৯.৩০-এ আমরা পুরী এক্সপ্রেস ধরে রওনা হলাম। ট্রেনে উঠে যে যার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর সকলে বাড়ি থেকে আনা খাবার ভাগ করে খেলাম তারপর গল্প করে একে একে সকলে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি আমরা কটকের কাছাকাছি পৌঁছেছি। চারিদিকে কত ছোট ছোট পাহাড়! এরপরে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাবার খেয়ে জুতো মোজা পরে নিলাম। কারণ পুরী স্টেশন কটক থেকে বেশি দূরে নয়। বেলা ১১.০০টা নাগাদ আমরা পুরীতে পৌঁছলাম। সকলে ট্রেন থেকে নামলে আমরা হেঁটে হেঁটে সমুদ্র তট-এর দিকে রওনা হলাম। সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে দেখি সুবিশাল ঢেউ ও জলরাশি যেন আমাদের গ্রাস করবার জন্য অপেক্ষা করছে। ঢেউ দেখে খালি মনে হচ্ছিল কখন সমুদ্রে গিয়ে স্নান করব বাইরেকে, আমরা সকলে গিয়ে কাছেই একটি আশ্রমে উঠলাম। আশ্রমটির নাম ভারত সেবাশ্রম সংঘ। সেখানে পৌঁছে ডিনিপত্র নামিয়ে আমরা নিজেদের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। তারপর দুপুর নাগাদ বাইরের একটা হোটেলে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে নিলাম। আশ্রমটি সমুদ্র থেকে কাছেই তাই সমুদ্রের গর্জন আশ্রম থেকে শোনা যেত। এই আশ্রমে সাধু-সন্ন্যাসীর বাস। তবে বাইরের লোক এখানে এসে বসবাস করতে পারে। পরদিন সকালে আমরা সকলে ক্যারাটের পোষাক পরে অনুশীলনে বেরোলাম। বেলা ১০টা নাগাদ অনুশীলন থেকে ফিরে কিছু খেয়ে সকলে মিলে স্নান করতে বেরোলাম তার আগে একটি খাজার দোকান থেকে খাজা কিনে খাওয়া হল। খুব মিষ্টি খেতে। এবার স্নানের পালা। সমুদ্রের সামনে গিয়ে দেখি কত ঝিনুক আর রাশি রাশি বালি! আর ঢেউয়ের তো কথাই নেই। পাড়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি প্রায় মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে ঢেউ চলে যাচ্ছে সকলে খুব আনন্দে স্নান করলাম। যখন স্নান করে ফিরলাম, দেখি ৩টে বেজে গেছে। এতক্ষণ স্নান করেছি! মনেই হয়নি। তার পরের দিনগুলোও এরকম ভাবে কাটল। ১২ তারিখ বাসে করে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। কোনারক, নন্দনকানন, উদয়গিরি, খন্ডগিরি, পুরীর মন্দির, লিঙ্গরাজ মন্দির আরো কত কী দেখলাম! খুব ভাল লাগল। পরদিন ফিরে আসবার সময় মনটা ভালো ছিল না। মনে হচ্ছিল আবার পুরীতে ফিরে যাই।

কবিতা

গাছ

অর্পিতা বৈরাগী
নবম শ্রেণী
বালিকা বর্ষ মন্দির

গাছ কেটোনা, গাছ কেটোনা
গাছ আমাদের সব,
গাছেতেই তো শুনতে পাই
পাখির কলরব।

গাছের ফুল গাছের ফল
গাছের বাতাস ছায়া,
গাছের প্রতি কারুর কি নেই
একটুখানি মায়া?

গাছ কেটোনা, গাছ কেটোনা
গাছ আমাদের প্রাণ,
সবাই জেনো এই কথাটি
গাছেরও আছে জান।

শব্দছক

(সমাধান)

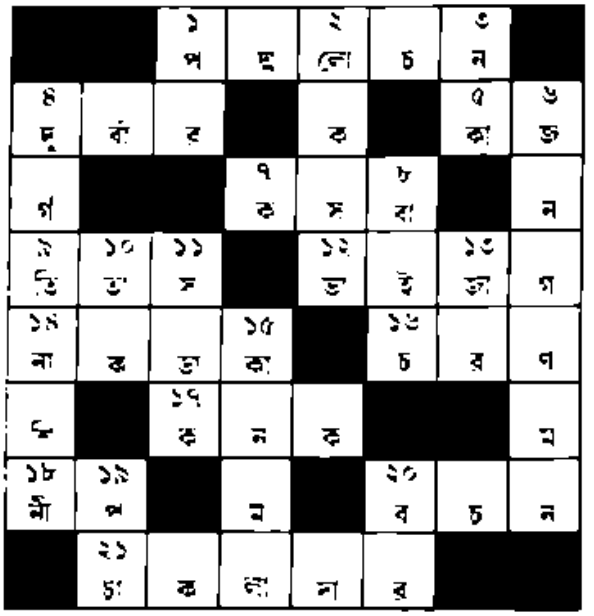

■	■	১ প	■	২ লে	■	৩ ন	■
৪ দু	■	■	■	■	■	৫ কা	৬ ড
৭ গ	■	■	৭ ক	■	৮ বা	■	■
৯ ত্তি	১০ ত	১১ ম	■	১২ ভ	■	১৩ ভা	■
১৪ না	■	■	১৫ কা	■	১৬ চ	■	■
■	■	১৭ ক	■	■	■	■	■
১৮ মী	১৯ প	■	■	■	২০ ব	■	■
■	২১ ড	■	■	■	■	■	■

শব্দ তৈরী কর

(উত্তর)

- ✪ [illegible]
- ✪ [illegible]
- ✪ [illegible]
- ✪ [illegible]
- ✪ [illegible]
- ✪ [illegible]

জবাবদিহির বারোটা

(উত্তর)

- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]
- ✻ [illegible]

খুশির খেয়ালে

শান্তনু মিত্র

ধাঁধা হাসি-কৌতুকের নতুন মজাদার উত্তর ছোটোদের বুদ্ধির ছোঁয়া থাকে বলে চলনদের ভিতরে প্রবেশ করে এবং এক অনাস্বাদ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। হেঁয়ালি আর ধাঁধার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সব হেঁয়ালি ধাঁধা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে সম্পৃক্ত হলে হেঁয়ালি ধাঁধা হয়ে যায়। হেঁয়ালি আমরা আলাদাভাবে জানানো চেষ্টা করব। হেঁয়ালির একটি উদাহরণ দিই। দুই বন্ধু আর দুই ছেলে শহর ছেড়ে চলে গেল। শহরের লোকসংখ্যা কমল তিনজন। কী করে হল? ওর বলল, ছেলে আর নাতি। হেঁয়ালির আর একটি সুন্দর উদাহরণ— দুটি ট্রেন একই সময়ে হাওড়া ও বর্ধমান থেকে ছাড়ল। হাওড়া ছেড়ে ছড়ল ট্রেন আর বর্ধমান থেকে লোকাল ট্রেন। দুটি ট্রেন যখন মুখোমুখি হবে তখন হাওড়া থেকে কোন ট্রেন বেশি দূরে! আরও একটা হেঁয়ালি করতে ইচ্ছে করছে। একটা ছোট বিয়েতে নলা মানেভঞ্জনের সময় আমি চোখে পড়ে গেলে নিলাম, 'আমি মিথ্যা কথা বলি'। উপস্থিত সকলকে ঘাবড়ে দেখে বোঝা গেল আমি ভুল ছুঁড়ে দিলাম, 'এই বক্তব্য কি মিথ্যে?' সকলের মধ্যে আবার মজাটি ফিরে এল। আমি মিথ্যা কথা বলি' সুতরাং আমার বক্তব্য মিথ্যা। তার মানে হল আমি সত্যি কথা বলি। এমনি আরো কত। হেঁয়ালি কত রকমের হয়! পৃথিবীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, কবিতা, অঙ্ক ইতিহাসে কতো লেখা। কিন্তু পৃথিবীতে ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে অল্প। শূন্য থেকে নয় এই কথা নিয়ে অনেক নজর নজর গল্পটিকে বেঁধে আছে। ধাঁধা আরও অনেক সমৃদ্ধ হতে পারে কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহের সৃষ্টি হয়নি পত্রিকের বইয়েও ধাঁধা হতে পারে। আমরা আশা করব ধাঁধা কলমের পাতে উঠুক। ছোট ছোট গল্পের ডাক নামুক।

—সম্পাদক

ধাঁধা - ১

সত্যবাদী - মিথ্যাবাদী সমস্যা

এক দার্শনিক গিয়েছেন প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে। সেই দ্বীপটির খ্যাতি বা কুখ্যাতি এই কারণে যে সেখানে দুটি উপজাতি বাস করে, যাদের মধ্যে একটি সর্বদাই সত্য কথা বলে এবং আর একটি সর্বদাই মিথ্যা কথা বলে। দার্শনিককে দ্বীপের ভিতর একটি ছোট্ট গ্রামে যেতে হবে — তাই তিনি হেঁটে চলেছেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর, যে রাস্তা সোজা চলছিল সামনে সে-ই হঠাৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুদিকে চলে গিয়েছে। দার্শনিক পড়েছেন মহা ফাঁপরে। একজন লোক সেই মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু সে যে কোন্ উপজাতির লোক, তা দার্শনিকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অথচ তিনি জানেন ওই দুটি উপজাতির কথা, যাদের একটি সদা-সর্বদা সত্য বলে এবং আর একটি সর্বদা মিথ্যা বলে। কিন্তু দার্শনিক-কে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে। এবং তার জন্য ঐ দুটি রাস্তার মধ্যে কোন্‌টি তাঁর গন্তব্যে গিয়েছে, তাও জানতে হবে। দার্শনিক কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর সেই লোকটিকে একটিমাত্র প্রশ্ন করে বুঝে নিলেন তাঁকে কোন্‌দিকে যেতে হবে। কি সেই প্রশ্ন?

ধাঁধা - ২

নকল পয়সার সমস্যা

দশটি থলির প্রতিটির মধ্যে দশটি করে মোট একশ টি আধুলি আছে। এই দশটির মধ্যে একটি থলি আছে, যার দশটিই নকল আধুলি। আসল আধুলির ওজন আমরা জানি আর দশটি নকল আধুলির প্রতিটির ওজন আসল আধুলির চেয়ে এক গ্রাম করে বেশি। কিন্তু এমনিতে শুধু চোখে সেই থলি আলাদা করার উপায় নেই একটি ওজন মাপক যন্ত্র আছে, যাতে যেকোন ছোট বা বড় ওজন মাপা যায়। সর্বাপেক্ষা কম কতবার ওজন করে নকল আধুলির থলিটিকে চিহ্নিত করা যাবে? অবশ্যই, যে কোনও থলি থেকে আধুলি বার করে নেবে।

ধাঁধা - ৩

এক মিনিটে উত্তর চাই

এখানে দুটো প্রশ্ন রয়েছে যাদের উত্তর বলতে দুটো মিনিটের এক মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। (এক) একটি পূর্ণসংখ্যা নীচে দেওয়া হল — বলতে হবে সেটি পূর্ণবর্গ কি না — আর পূর্ণবর্গ হলে তার বর্গমূল কত। ৩৪৮০৯১২৫৭৪৯০৮২২৪১১০৬৭১৮। মনে রাখবে এ প্রশ্নের উত্তরের পক্ষে আধ মিনিটও বেশি সময়।

(দুই) একটি কাঁচের বয়ামে পোকা রয়েছে। সে পোকার বিশেষত্ব এই যে তার সংখ্যা প্রতি দু'মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যায়। এক ভদ্রলোক বয়ামটির দিকে এক ঘন্টা ধরে লক্ষ্য রাখছিলেন। একঘন্টা পর তিনি দেখলেন বয়ামটি ভর্তি হয়ে গেল। তিনি কতক্ষণ আগে বয়ামটির অর্ধেক পোকা ভর্তি দেখেছিলেন?

ধাঁধা - ৪

সুলতানী আমলের এক পথিক

ভারতে তখন সুলতানী শাসন। সে-যুগে টাকা পয়সার (অর্থাৎ মুদ্রার) প্রচলন তেমন ছিল না। বিনিময় প্রথায় (অর্থাৎ জিনিসপত্র বিনিময় দ্বারাই)

তখন কাজ চলত। এক পথিক চলেছে দূরদেশে। মাঝপথে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল, ঠিক করল সেখানে সাত দিন থাকবে। সরাইখানার মালিক তাকে জিজ্ঞাসা করল সে দৈনিক কি হারে থাকতে চায়। পথিক জানাল তার কাছে কোনও মুদ্রা নেই কিন্তু সোনার একটি শিকল (chain) রয়েছে, যাতে ৭টি লিঙ্ক (link) রয়েছে। সে দৈনিক ১ লিঙ্ক হারে মালিককে খরচ দিতে পারে। মালিকের কি তাতে পোষাবে? মালিক রাজী হয়ে গেল কিন্তু একটি শর্ত আরোপ করল।

চেনটি তার ভালো লেগেছিল। সুতরাং তার প্রতিটি লিঙ্ক কেটে একটি একটি করে নেওয়াটা সরাই মালিকের মনঃপূত হ'ল না। পথিক তাকে বলেছিল সপ্তাহের শেষে পুরো চেনটা নিয়ে নিতে, কিন্তু সরাই মালিক পথিককে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না — যদি সে কিছু না দিয়েই পালিয়ে যায়! অতএব, সরাই মালিকের প্রস্তাব ছিল যে পথিক তাকে প্রথমেই চেনটা দিয়ে দিক। সে প্রস্তাব আবার পথিকের না-পসন্দ। চেনটা নিয়ে নেওয়ার পর সরাই মালিক যদি তাকে অর্ধচন্দ্র দান করে! সুতরাং দু'জনের মধ্যে রফা হল এই যে পথিক তার চেনের যথাসম্ভব কম লিঙ্ক এমনভাবে কাটবে যাতে প্রতি দিনের শেষেই সে সরাই মালিককে সেই দিন পর্যন্ত তার প্রাপ্য ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারবে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে পথিক যে কোনও দিন ভাড়া মেটানোর সময় সরাই মালিককে দেওয়া আগের লিঙ্কগুলি থেকে কয়েকটি ফেরত নিতে পারে এবং তার পরিবর্তে কিছু নতুন লিঙ্ক দিতে পারে। পথিককে সর্বাপেক্ষা কম কটা লিঙ্ক কাটতে হবে?

ধাঁধা - ৫

যাদুকরের এক কারসাজি

এক যাদুকর খেলা দেখাচ্ছেন। স্কুলে পড়া কিছু ছেলেও সেখানে বসেছিল। তারা বায়না ধরল যাদুকরকে অঙ্কের কিছু খেলা দেখাতে হবে। যাদুকর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাদের যে কেউ দু'অঙ্কের একটি সংখ্যা ভাব এবং ভাবা হলে সেই দু'টি অঙ্ক যোগ করে বলো। হয়েছে?' একটি ছাত্র বলল, 'হয়েছে'। যাদুকর বললেন, 'ঠিক আছে, প্রথমে যে সংখ্যাটি নিয়েছিলে, তার থেকে এই শেষ যোগফলটি বাদ দিয়ে যা পাবে, তাকে নয় দিয়ে ভাগ করে ফেল এবং সেই ভাগফলকে দশ দিয়ে গুণ কর। এবার ঐ গুণফল থেকে প্রথম যে সংখ্যাটি নিয়েছিলে, তার একের অঙ্কটি বাদ দিয়ে দাও। এবার এই শেষ সংখ্যাটি বল।' ছেলেটি বলল ৭২। যাদুকর বললেন, 'তোমার প্রথম সংখ্যাটি ছিল ৮৮।' আর একটি ছেলেও একই সঙ্গে হিসাব করে চলেছিল। সে জানাল যে তার শেষ ফলাফল দাঁড়িয়েছে ৫৪। যাদুকর জানালেন, তার প্রথম সংখ্যাটি ছিল ৬৬। উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেরা জানাল যে যাদুকর সঠিক সংখ্যাটিই বলেছেন। যাদুকর কি ভাবে তাদের মনের কথা জানলেন?

❖❖❖

এবার আসি শেষ ধাঁধাটিতে। এটিকে ধাঁধা যদি বলতে না চাও তো আপত্তি করব না। তবে সমাধান দেখতে চেয়ো না। মনে হবে অনেক অনেক সংখ্যার ভিড় জমেছে। দিনের বেলায় হয়ত বা আকাশের তারাও দেখবে। সত্যি সত্যি বলছি নাকি!

ধাঁধা - ৬

বিজোড় সংখ্যা

১,৩,৫,৭,৯,.....ইত্যাদি সংখ্যাকে বলে বিজোড় সংখ্যা— কারণ এরা ২ দ্বারা বিভাজ্য নয়। বিজোড় সংখ্যার প্রথমটি ১ — ১-এর বর্গ। প্রথম ও দ্বিতীয়—১৩৩, তাদের যোগফল ২-এর বর্গ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় — ১,৩ ও ৫, তাদের যোগফল ৩-এর বর্গ। প্রথম চারটি বিজোড় সংখ্যা — ১,৩,৫ ও ৭ তাদের যোগফল ৪-এর বর্গ। অর্থাৎ প্রথম থেকে (১ থেকে শুরু করে) পরপর বিজোড় সংখ্যা নিয়ে গেলে তাদের যোগফল, যে ক'টি বিজোড় সংখ্যা নেওয়া হয়েছে, সেই অঙ্কটির বর্গ। প্রথম চারটি বিজোড় সংখ্যার ক্ষেত্রে যে এই নিয়ম প্রযোজ্য, তা আমরা ওপরে দেখেছি। কিন্তু এই নিয়ম কি যে-কোনও সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? যদি হয়, তা প্রমাণ করতে হবে এবং যদি না হয়, তা-ও প্রমাণ করতে হবে।

সংখ্যার আরও মজা

সংখ্যা এক বিস্ময়কর জিনিস—তার বিভিন্ন ধর্ম যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, অনেক যাদু-ই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। পরপর যে কোনও চারটি পূর্ণসংখ্যা নেওয়া যাক। অর্থাৎ, ২, ৩, ৪, ৫ বা ১০, ১১, ১২, ১৩ বা ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ বা ২৩, ২৪, ২৫, ২৬। পরপর চারটি পূর্ণসংখ্যার (যে কোনও) গুণফলের সঙ্গে ১ যোগ করে দাও। দেখবে সেটা একটা পূর্ণবর্গ। অর্থাৎ, তার বর্গমূল একটি পূর্ণসংখ্যা। এই যাদুর পিছনে কারণটি কি?

(সমাধান ১৯৯ পৃষ্ঠায়)

দিগসুই ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপ. এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লি.

হেড অফিস - দিগসুই, হুগলি

শাখা - চাঁপারুই, তারাগুন, মানুষপুর

জেলা তথা রাজ্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে অগ্রণী সমিতি, ডিপোজিট গ্যারান্টী স্কিমে নথিভুক্ত, লেনদেন সহজ, সরল ও চটজলদি, প্রতি বৎসর লটারি মাধ্যমে পুরস্কার দান। ১০টা-৫টা লেনদেন। গোপনীয়তা রক্ষা, এন এস সি /কে ভি পি ঋণের ব্যবস্থা।

দিলীপকুমার ঘোষ — সভাপতি
আশিষ মুখার্জী — ম্যানেজার
গোলকবিহারী বিশ্বাস — সম্পাদক

সমিতির নিজস্ব শিল্পীদের দ্বারা উৎপাদিত শাড়ি ও ধুতির বিক্রয় কেন্দ্র —

জাহিপাড়া ব্লক প্রাইমারি উইভার্স কো-অপ. সোসাইটি লি.

গ্রাম ও পো: রহিমপুর, হুগলি

ফোন নং : ২১১২-৫১৮১

সোমবার বন্ধ, মঙ্গলবার পূর্ণ বিক্রয় বন্ধ থাকে।

যাতায়াত

হরিপাল হইতে ৯ বা ১০ নং বাসে, হাওড়া ও শ্রীরামপুর হইতে রাজবলহাট বাসে "রহিমপুর মোড়"

ভোলানাথ দে — সভাপতি
দীনবন্ধু ভড় — ম্যানেজার
মৃত্যুঞ্জয় দে — সম্পাদক

With Best Compliments From :

DENA BANK EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

11, BRABOURNE ROAD
CALCUTTA - 700 001

শারদ শুভেচ্ছা

P.N.B. EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(Regd Cal/49 Dt 05 04 65)

18, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA - 700 001

১৯১৮ সাল থেকে শুরু করে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে আজও অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতিরূপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে পরিগণিত —

শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

গ্রাম ও পোঃ - হাট - শ্রীধরপুর, জেলাঃ বর্ধমান, পিন কোড নং — ৭১৩ ১৪৬
রেজিস্টার্ড নং — ২০৪/২০-৪-১৯১৮
ফোন নং ঃ সাহগোছিয়া ৭০২৫৬, ৭০৩১০, ৭০৫০৮ (এস. টি. ডি - ০৩৪২)

কৃত কার্যসমূহ ঃ ব্যাঙ্কিং (ঋণদান ও গ্রহণ), বস্ত্র বিভাগ, সার বিভাগ, ধর্মগোলা, মৎস্য চাষ, কয়লা সরবরাহ, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়, মুদিখানা (মনোহারি সমেত), হিমঘর, কৃষি সরঞ্জাম বিক্রয়, কীটনাশক ঔষধ বিক্রয়, ধান ও আলু বীজ বিক্রয়, রাইসমিল, ৩৯টি মিনি-ডিপ টিউবওয়েল মারফত সভ্য ও চাষিদের সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা, কাঁসার জিনিসপত্র, আলু বণ্ড, এন এস সি, কিষান-বিকাশপত্র ইত্যাদি বন্ধক রেখে ঋণ, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মধ্য দিয়ে মহিলাদের স্ব-নির্ভরশীল করা, পোলিও ও এ্যালোপাথি চিকিৎসা ব্যবস্থা (সরকারি সহায়তায়)।

অন্যান্য শাখা অফিস

মেমারি, শঙ্করপুর, রাধাকান্তপুর, মধ্যমগ্রাম, বোহার, মাতিশ্বর, বর্ধমান, ডেহা।

[শিশুদের ও সাধারণের উপভোগ্য একটি সুন্দর পার্কসহ সংলগ্ন দিঘি, উদ্যান ও খেলার মাঠের মনোরম পরিবেশ শ্রীধরপুর সমবায় সমিতির একটি অনবদ্য সংস্করণ — সমিতিতে এলে যা আপনাকে দেখতেই হবে।]

অজয়কুমার পাল *সভাপতি*	**পরিচালমণ্ডলী** *সমিতির সভ্যগণ ও কর্মীবৃন্দ*	**বাসুদেব ঘোষ** *সম্পাদক*

With Best Compliments From :

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LIMITED

(A Licensed Bank)

HEAD OFFICE & MAIN BRANCH :

Benachity House,
Durgapur - 713 204
Phone (0343) 57-0593/57-0722

D.S.P. BRANCH :

Durgapur Steel Plant Premises
Durgapur 713 203

SALIENT FEATURES OF THE BANK

☛ Deposit Insurance under D.I.C.G.C. Scheme ☛ All kinds of Banking Business ☛ Attractive Rates of Interest on Deposits ☛ Courteous & Efficient Services ☛ Computerised Services ☛ Locker Facility Available

দি গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা - ৭০০ ০০২
দূরভাষ : ৫৫৭-৬৭৭০
স্থাপিত : ১৯২১

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে সততা, নিরাপত্তা, গুণে, মানে ও দ্রুত পরিষেবায় প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতির অবলম্বে সমবায় দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী সভ্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, স্বাবলম্বন ও স্বশাসন ক্রান্তিকালে উত্তরণ ক্রমবর্ধমান।

পুরী, গ্যাংটক ও দার্জিলিং-এ মনোরম পরিবেশে হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম

কর্তৃক প্রকাশিত চারটি অমূল্য গ্রন্থ :

- **সাঁওতাল হুল, ১৮৫৫** :: মূল্য ১০ টাকা মাত্র।
- **শায় সেরমা রেনা : অনড়হেঁ** :: মূল্য ৬০ টাকা মাত্র।
  (শত বর্ষের সাঁওতালী কবিতা সংকলন বঙ্গানুবাদসহ)
- **হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়া : কাথা** :: মূল্য ৩৫ টাকা মাত্র।

এছাড়া পাওয়া যায়

- **সাধু রামচাঁদ অনলমালা** :: মূল্য ৫০ টাকা মাত্র।

যে কোন বই একত্রে পাঁচ কপি ক্রয় করিলে আকর্ষণীয় ছাড়। আগ্রহী ক্রেতা ও এজেন্টগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

পরিচালন অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড

১২, চৌরঙ্গি স্কোয়ার (৪র্থ ও ৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

দূরভাষ : ২৪৮-১২৬৬/২৪৮-৮৮২০

"আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রথাটিই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়ে"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারায়ণীতলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম - সুভাষনগর, পোস্ট - চাপ্‌লা

রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

রেজি নং - ১৩২ তাং - ২৭/৬/৫৭

হরিসাধন মণ্ডল	বিশ্বনাথ হালদার	তপন সমাদ্দার
সভাপতি	*সহ-সভাপতি*	*সম্পাদক*

মানসকুমার মণ্ডল	কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল
হিসাব রক্ষক	*ম্যানেজার*

উত্তর মহেন্দ্রপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

সাং - উত্তর মহেন্দ্রপুর, পোঃ - গুরুদাসপুর

পাথর প্রতিমা, জেলা - দঃ ২৪ পরগনা

পিন : ৭৪৩ ৩৪৯

রেজি. নং - ১১১ তাং - ৭/৬/৬২

পূর্ণচন্দ্র ঘোড়ুই	কিশোরীমোহন ফদিকার	জগদীশচন্দ্র পাত্র
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

উপন্যাস

কমলিকার ডায়েরি

বিনয়গোপাল মিত্র

মৈনাকের সাথে আমার পরিচয় অনেক দিনের। ঘনিষ্ঠতা ছিল ঠিকই কিন্তু বন্ধুত্ব কোনদিন গড়ে ওঠেনি। ইদানীংকালে বহুদিন আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। পথে-ঘাটে দেখা হয়, কোনেও কথাবার্তা হয়, কখনো শুধুই শুভেচ্ছা বিনিময়, কখনো দরকারি কথাবার্তা। প্রয়োজন পড়লে মৈনাক বেশ নরম সুরে কোমল শব্দ চয়নে কথাবার্তা বলতে জানে। এসব কথা বলছি কারণ সাম্প্রতিককালে এমন কিছু কিছু ছোটখাটো খুটিনাটি ঘটনা ঘটেছে যাতে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে মৈনাক মানসিকভাবে জটিল। ও কোন কথা স্পষ্ট করে বলে না আর যা বলতে চায় তার কিছু প্রকাশ করে অবশিষ্টাংশ ভেতরে রেখে দেয়। তাই ওর পরিচিত মহলে ওর নাম 'হাফ সেন্টেন্স'।

একদিন মৈনাক আমাদের বাড়িতে এল। ধীর স্থির ভাব। মুখে চোখে গাম্ভীর্য ও উদ্বেগ ভাব। মনে হল মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। এ-কথা সে-কথা এলোমেলোভাবে বলতে বলতে আমাদের মধ্যে কথা বলা ও গল্প করার একটা প্রবাহ এল। ছোটবেলায় দু'জনের আড্ডা জমে ওঠে কিন্তু বড় হলে দু'জনে বোধহয় আড্ডা জমানো বেশ কঠিন কাজ।

মৈনাকের বাবা-মা ও বোনের খোঁজখবর নিতে নিতে হঠাৎ আমার মনে হল ওর দীপামাসির খবর নেওয়া যাক। আমি জানতাম দীপামাসিকে নিয়ে ওর কেমন আবেগ আছে, তেমনই মনের মধ্যে একটা দুর্বল জায়গাও তৈরি হয়ে আছে। আমি এটাও জানতাম ও যদি কোন দরকারে এসে থাকে অহলে আমি দীপামাসি বা যে প্রসঙ্গই তুলি না কেন ও ওর দরকারের জায়গায় আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলবেই।

দীপামাসির কথা জিজ্ঞাসা করাতে মৈনাক যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মৈনাক বলল, তোকে বোধহয় আমাদের গোয়া যাওয়ার গল্প করা হয়নি।

হ্যাঁ, কিছুকাল আগে শুনেছিলাম তোরা গোয়া গিয়েছিলি। তোরা গোয়া থেকে ফেরার কিছুদিন বাদে তোদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তোদের বাড়িতে গিয়ে একটা থমথমে ভাব দেখেছিলাম। তাই তখন গোয়ার কথা আর জিজ্ঞাসা করিনি। তারপরেও তোর সাথে দেখা হয়েছে কিন্তু গোয়া প্রসঙ্গ আসেনি। আমি আরও বললাম, তুই তাহলে এখন দীপামাসির গল্প রাখ, গোয়ার গল্পই শুনি। মৈনাক বলল, গোয়া থেকে ফেরার পর আমাদের বাড়িতে যে থমথমে ভাব দেখেছিলি তার রেশ এখনও রয়ে গেছে, কতদিন থাকবে জানি না, দেখ না দীপামাসি এসে যায় কি না — এই কথা বলে মৈনাক গোয়ার গল্প শুরু করল।

সেবার আমার অনার্স পরীক্ষা শেষ হয়েছে। একই বৎসরে অমর কেন ইঞ্জিনী উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ঠিক হল আমরা গোয়ায় বেড়াতে যাব। আগেই ঠিক হয়েছিল আর সেইজন্য সমস্ত আয়োজন যেমন, টিকিট কাটা, হোটেল বুক করা ইত্যাদি সবই অনেক আগে থেকেই করা হয়েছিল। শুধু অপেক্ষা পরীক্ষা শেষ হওয়ার। অনন্তের ভ্রমণসূচিতে গোয়া যাওয়ার সাথে আরও কয়েকটা জায়গা জুড়ে দিয়েছিলেন বাবা। বোম্বে, পুণা আর পুণাতে নেমে বাসে করে ঔরঙ্গাবাদ, অজন্তা, ইলোরা, মহাবালেশ্বর, পাঁচগনি ইত্যাদি জায়গাগুলোও ঘুরে নেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। বাবার এক বন্ধুর পরামর্শে আমরা এও জেনেছিলাম যে বোম্বে, পুণা আর ঔরঙ্গাবাদ স্থানীয়ভাবে দেখে নেওয়া যায় কলকাতেও ট্যুরের সাহায্যে কিংবা ট্যাক্সি ভাড়া করে

ইশানী অনেকদিন ধরে গোয়া বেড়াতে যাওয়ার জিদ ধরেছিল। ওর ইচ্ছা পূরণে বাবার তেমন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকত না। ওর এক বন্ধুর কাছে গোয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ শুনে শুনে ও মনে মনে কিছুদিন যাবৎ গোয়ায় বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। বেবের কাছে এমনভাবে গল্প ফেঁদে বসত যে শুনলে মনে হবে ও সদ্য গোয়া ঘুরে এসেছে। উদ্দেশ্য ছিল যেভাবেই হোক গোয়া যাওয়ার জন্য বাবাকে রাজি করানো। না তো সবেতেই আছে — কালে-কোলে-অম্বলে —কোনোটাতেই আপত্তি নেই। কোথাও গেলেই হল। বিশেষ কোন জায়গার জন্য বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। পছন্দের দু-তিনটি জায়গা থাকলেও আকর্ষণ তেমন প্রবল ছিল না। তবে ফিরে এসে মা অবশ্যই বলবে, আমার যাওয়ার ততো ইচ্ছা ছিল না। কারণ জানতে চাইলে অনেক রকমের কারণ ও ব্যাখ্যা মিলবে। যেমন মেয়েটার অনেকগুলো দিন পড়াশুনা নষ্ট হবে, এইজন্য কিংবা অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে, এইজন্য কিংবা পথে যদি তোর বাবার শরীর খারাপ হয়, এইজন্য। আবার কখনো বলবে, আমার বাবা-মা'র যদি

হঠাৎ কিছু হয়ে যায়। কারণ ও ব্যাখ্যা শুনলে মনে হবে মা সবটাই ঠিক বলছে। তবে মা কিন্তু সবটাই বলবে ফিরে আসার পর। বাবের এই রকমের ব্যাখ্যা শুনলে বাবা কখনো কখনো রেগে যেতেন। বলতেন, এসব কথা যাওয়ার আগে বলনি কেন? কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে মা যে সব সময় এক-পা তুলে রেডি হয়ে আছে একথা সবাই জানত। বেড়াতে যাওয়ার ঠিক হলে আমার তেমন আনন্দ হত না। নিজের জায়গায় পনেরো-কুড়ি দিন থাকতে পাব না, পনেরো-কুড়ি দিন কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হবে না ভাবলে আমার মনকষ্ট হত।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল আমরা প্রথমে যাব ঔরঙ্গাবাদ। ওখান থেকে অজন্তা আর ইলোরা। তিনদিন। তারপর পুণা, মহাবালেশ্বর, লোনাওলা ইত্যাদি। তিনদিন। বোম্বে থেকে ট্রেনে গোয়া। রেলপথে গোয়া খুবই চিত্তাকর্ষক জেনে এই ব্যবস্থা।

যাওয়ার দিন উপস্থিত হল। ট্রেন বিকেলে। সকাল থেকে খুব ব্যস্ততা। এক ফাঁকে একটু বেরিয়ে গিয়ে দু'জন বন্ধুর সাথে দেখা করে এলাম। ফিরে এসে দেখলাম প্যাকিং-এর কাজ চলছে। অনেকদিন পর আমরা বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। টানটান উত্তেজনা — এই আবেগ আনন্দের কথা হচ্ছে তো পর মুহূর্তেই টেনশনের কথা — রাগারাগি, বকাবকি সবই চলছে একই সাথে। এরই মধ্যে আমার ডাক পড়লে আমি বাবাকে সাহায্য করছি। আর ঈশানী মাকে। পরমা, ঈশানীর বন্ধু, বেলা বারোটায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। অনেকদিন বন্ধুকে দেখতে পাবে না হয়তো সেইজন্য। পরমা এর আগেও আমাদের বাড়িতে এসেছে। পড়ার ঘরে ঈশানীর সাথে গল্প করেছে, পড়াশুনার আলোচনা করেছে, চলে গেছে। কোনোদিন মেয়েটাকে ভাল করে দেখিনি। দেখার সুযোগও হয়নি। অধিকাংশ সময় এমন হয়েছে ও যখন বাড়িতে এসেছে আমি তখন বাড়িতে নেই। আমি হয় কলেজে না হয় আড্ডায়। এইদিন আমরা সবাই হাড্ডাচালে ছিলাম। আমরা সবাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরমার সাথে কথা বলে নিচ্ছি। মনে মনে আমি যে একটু পুলকিত হয়েছিলাম তা বলাই বাহুল্য। ছেলে কোন্ মেয়ের দিকে কতটা তাকাচ্ছে, কোন্ একালো কতটা অর্থপূর্ণ তা মাপজোখ করার উপায় ছিল না মা-র। চলে যাব বলে দেখা করতে এসেছে ভেবে পরমার প্রতি মনটা বেশ কোমল হয়েছিল। হলই বা বোনের জন্য। আমার বোনের সাথে দেখা করতে এসেছে, সম্মান আদায় করার জন্য এটাই তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমার বোনের সাথে দেখা করতে এসেছে, সুতরাং সৌজন্যমূলক আচরণ দেখানোর আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই — এমনটি তো আর ভাবা যায় না। তাই আমিও পরমার সাথে কথা বলার সব সুযোগই নিলাম। পরমাও এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে সকলের সাথে কথা বলছিল আর এমন একটা হাবভাব নিয়েছিল কেন এই গোয়া ভ্রমণটা ও না বললে হইই না। ঈশানী হয়ত বলেও থাকতে পারে, তার জন্যই আমাদের এই গোয়া যাওয়াটা শেষ পর্যন্ত ঠিল হল। আমাদের রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরমা কেন আমাদের বাড়িতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা পেল! এমনি করে দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হতে চলল আমাদের প্যাকিং-এর ফাইনাল রাউণ্ড চলছে তখন পরমা বিদায় নিতে চাইল। আমরা কেউ রাজি হলাম না। বললাম, ঘর থেকে একসাথে বেরব। শেষ মুহূর্তে ঈশানী তার পোশাক বদলানো ও সাজগোজে ব্যস্ত হয়ে ওঠায় পরমা আমার কাছে কাছেই ছিল।

মৈনাক বলে চলেছে : পরমা এই সময়টায় এমনভাবে আমার সাথে কথা বলছিল যেন সে যে কোন সময় আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হতে পারে। সে যে ঘনিষ্ঠ হতে চায় না — একথা ভাববার কোন কারণ নেই। তার ভাবখানা এমন যেন অন্তরঙ্গ হওয়ার কাজটা সে ইচ্ছা করেই বর্তমানে তুলে রেখেছে। তার ইচ্ছা হলেই ব্যাপারটা সে চালু করবে এবং সময়টাও ঠিক করবে পরমা নিজেই।

সময় হু-হু পায় ছুটে যাচ্ছে। এবার বেরুতে হবে। বাবা ট্যাক্সি ডাকতে বেরিয়ে গেলেন। মা শেষবারের মতো সব কিছু দেখে নিচ্ছেন। সব দরজা জানালা, আলমারি, ফ্রিজ, বড় ঘরটা ঠিক ঠিক বন্ধ হয়েছে কি না, মোট কটা লাগেজ। ঈশানী পরমাকে জিজ্ঞাসা করছে, তার চুল বাঁধা সাজগোজ ইত্যাদি ঠিক হয়েছে কি না। পরমা অন্যমনস্ক। ঠিক ঠিক উত্তর তার কাছ থেকে আসছে না। ঈশানী বলছে, দেখতে দেখতে কুড়িটা দিন কেটে যাবে, মন খারাপ করিস না। ট্যাক্সি এল। পরমা বলল, কাকিমা আমার জন্য কিন্তু একটা স্মৃতিচিহ্ন এনো। সবাই ট্যাক্সিতে উঠলাম। পরমা বাইরে দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সি ছাড়ার আগে সবাই একযোগে টা-টা বললাম। পরমা হাত নাড়ল, কিন্তু সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকেই চেয়ে থাকল। যখন তার সম্বিত ফিরল তখন একটু ছুটে ট্যাক্সির পাশে পাশে এসে বলতে লাগল, কাকু কাকিমা টা-টা, ঈশানী ভাল থাকিস।

পরমার সেই নিষ্পলক দৃষ্টি হৃদয়ে-মনে গেঁথে নিয়ে আমরা এসে ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেন ছাড়ল ঠিক সময়। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় পর্যাপ্তরা এক একটি বার্থে। মনে আনন্দের জোয়ার। ভ্রমণের আনন্দ বোধহয় এখান থেকেই শুরু হয়। আমাদের চারটি বার্থের দুটি সাইডে আর দুটি ভেতরে। ভেতরের চারটির মধ্যে আর দুটি এক নবদম্পতির। ঠিক হল সাইডের দুটি বার্থে আমি আর বাবা শোব এবং ভেতরের দুটিতে মা ও ঈশানী। ট্রেনে উঠলে মা সব সময় ওপরের বার্থই পছন্দ করেন, কারণ বেশি দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা যায়। আমি আর ঈশানী সকাল হতে না হতেই উঠে বসতে চাইব, মাকে জোর করে ওঠাব — এই কারণে ওপরের বার্থে মা শুতে চান। ভেতরের নীচের দুটি বার্থে থাকল ঈশানী আর ঐ নতুন বউটি।

নবদম্পতির সাথে আমাদের আলাপ হল। জানা গেল, ওরা প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিনে হানিমুনে বেরিয়েছে। ওরাও গোয়া যাবে। বম্বেতে কয়েকদিন থাকবে, তারপর যাবে। ছেলেটি বাঙ্গালোর থেকে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি করেছে আর মেয়েটি শিবপুর থেকে বি ই (ইলেকট্রিকাল)। ওরা প্রশ্নমালিক উত্তর দিচ্ছিল বলে আর বেশি কিছু ওদের সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়নি। অলোভন হবে মনে করে ওরা কোথায় থাকে ওদের নাম কি এসব প্রশ্নও করা যায়নি।

রাত ন'টার পর ডিনার খেয়ে আমরা সবাই শুয়ে পড়লাম। এক ঘুমে সকাল হল। নীচে নেমে দেখলাম ঈশানী তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে না জাগিয়ে আবার ওপরে উঠলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ঈশানী জাগল। আমি নীচে নেমে এলাম। ঈশানী আর আমি পাশাপাশি বসে নানা কথা বলছিলাম। হঠাৎ ঈশানী কিসফিস করে বলল, দেখ দাদা ঐ নতুন বউটির ঘুম ভাঙো গাঢ়, সেই গভীর রাত থেকে দেখছি বউটির একটি হাত

একইভাবে পর্দার বাইরে বেরিয়ে আছে। ঈশানী আরও বলল, ঘুম আসছিল না, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। বলতে বলতে একটু থেমে ঈশানী বলল, কী যে দেখলাম মনে করতে পারছি না, রাত্রে ঘাম দিয়ে আমার শরীরটা খারাপ লাগছিল, বাবাকে ডাকব কি না ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম ধরে গেছে বুঝতে পারিনি।

আরও কিছু সময় কাটল। বাবা-মা ঘুম থেকে উঠেছেন। কামরার সবাই উঠে পড়েছে। এক একটা বার্থ থেকে চাদর-কম্বল-বালিশ ফেরত নিচ্ছে। আমাদের বার্থের কাছে এসে ঐ নবদম্পতির ওপরের বার্থ থেকেও চাদর-কম্বল-বালিশ নিল, কিন্তু ওপরে সেই ছেলেটা ছিল না। আমাদের সন্দেহ হল, কারণ আমরা অনেকক্ষণ জেগে বসে আছি ঐ ছেলেটাকে নামতে দেখিনি। মনে মনে আমার ভয় হল। নীচের বার্থের পর্দা সরাতেই আমরা আঁতকে উঠলাম। দেখে মনে হল বউটি মৃত। যে চাদর-বালিশ-কম্বল তুলতে এসেছিল সে ট্রেনের গার্ড ও পুলিশকে খবর দিতে গেল। ট্রেন চলছে। কামরার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল উপোটাদিকে কে শুয়েছিল, সে কিছু জানে কি না। আমি এই ভয়টাই করছিলাম। অনেক লোক জড়ো হয়েছে। এক একজন এসে বউটাকে দেখে যাচ্ছে। সকলের প্রশ্ন ছেলেটা কোন্ স্টেশনে নামল। এত লোকের মাঝে আমি ঈশানীকে শিখিয়ে দিতে পারছি না যে তুই কিছু দেখেছিস বা জানিস বা সন্দেহ করছিস বলে স্বীকার করবি না। পুলিশ এলে তো আগে ঈশানীকে, তারপর আমাদের জেরা করবে। দাঁত মাজবার ছল করে ঈশানীকে টেনে নিয়ে গেলাম বাথরুমের কাছে। ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওকে শিখিয়ে দিলাম, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, গভীর রাত থেকে বউটার একটা হাত একইভাবে পর্দার বাইরে বেরিয়েছিল এসব কোন কথা যেন ও না বলে। ঈশানীকে বললাম তোর একটাই জবাব, রাতে আমি ঘুমিয়েছি, আমি কিছুই জানি না। রায়পুরে গাড়ি থামল। ছোট বড় মেজ মাপের পুলিশ অফিসাররা এলেন। ট্রেনের অনেককে এবং অ্যাটেন্ডেন্টকে জেরা করে আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরা কিছু জানি কি না, কাউকে কোন সন্দেহ করার মত কিছু ঘটেছিল কি না এসব প্রশ্ন করে পুলিশ অফিসাররা চলে গেলেন। ঈশানীকে আলাদা করে কোন প্রশ্ন করেননি। আরও পরে অন্য একদল পুলিশ এসে বউটির বিছানা, শরীরের অনাবৃত অংশ ইত্যাদি পরীক্ষা করে নোট লিখলেন এবং সঙ্গের পুলিশদের বউটিকে নামাবার কথা বললেন। প্রায় দু'ঘন্টা এইভাবে কাটার পর আবার ট্রেনটি চলতে শুরু করল।

আমাদের ভ্রমণসূচি অনুযায়ী আমাদের যাত্রা শুরুর ন'দিন পরে গোয়া পৌঁছলাম। ছোট ট্রেনে যখন যাচ্ছিলাম অনেক টানেল পার হয়েছি। পথে পড়েছে 'দুধ সাগর' একটি জলপ্রপাত। এই দুধ সাগরকে প্রদক্ষিণ করে পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘিরে ট্রেনটি সমতলে নেমে এসেছে গোয়ার। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছি মারগাঁও-এ এবং সেখান থেকে বাসে পানাজি। পানাজিতে আমরা উঠেছিলাম হোটেল জিন্যুজ-এ। হোটেলে দু'টি কামরায় আমরা ছিলাম। একটাতে বাবা আর আমি। অন্যটাতে মা আর ঈশানী। আমাদের পুরো যাত্রাপথে আমরা ট্রেনের ঐ দৃশ্য বরে বেড়িয়েছি। তার রেশ এখনো কাটেনি।

আমরা যেদিন গোয়ার হোটেলে উঠলাম ঠিক তার পরের দিন দীপামাসিরা ঐ হোটেলে এসেই উঠলেন। এসেছেন দীপামাসি, মেসোমশাই, ছেলে শৌভিক ও দুই মেয়ে সুরঞ্জনাদি ও সুতপা। সুতপা আমার চাইতে তিন বছরের ছোট আর শৌভিক প্রায় সমবয়সী। আমরা একসময় বহরমপুরে থাকতাম। দীপামাসির বাড়িতে আমরা ভাড়ায় ছিলাম। মেসোমশাইয়ের নাম সুনীল সিকদার, জিলা পরিষদে চাকরি করতেন। খুবই সাদাসিধা, অমায়িক লোক। বেশ রাশভারি আর গম্ভীর প্রকৃতির। উনি খেয়াল গাইতেন। দীপামাসির সাথে হঠাৎ দেখা হোটেলের অফিসে। কতদিন দেখা হয়নি। দীপামাসিকে দেখে কী যে আনন্দ হয়েছিল। দীপামাসির কাছ থেকে এত আদর-যত্ন-ভালবাসা পেয়েছিলাম তা ভুলবার নয়। আমার কাছে একেবারে মাতৃমূর্তি। দীপামাসির বাড়িতে কেউ এলে ছোট-বড় সকলেরই গল্প-কথাবার্তা হত দীপামাসির সাথে। মেসোমশাইয়ের কাছ ঘেঁষতে কেউ সাহস করত না, আত্মীয়-স্বজনেরাও নয়।

বহরমপুরে শৌভিক আর আমি এক ক্লাসেই পড়তাম। ওরা লেখাপড়ায় ছিল সাধারণ। দু'টি মেয়ে নাচ-গান শিখত। নাচ-গান শেখা ছিল সখের। বিয়ের বাজারে অতিরিক্ত যোগ্যতা। সুরঞ্জনাদির বাঁ-পায়ে সামান্য ত্রুটি ছিল। চলার ভঙ্গিতে ধরা পড়ত। ওদের সংসারে এ নিয়ে আলোচনা হত। একজন কে বলেছিল নাচ শিখলে চলার ভঙ্গিতে যে ত্রুটি চোখে পড়ে তা দূর হয়ে যাবে। নাচের সাথে সাথে ওর চলার ভঙ্গি এমন সুন্দরভাবে বদলে যাবে যে ওর ত্রুটি আর চোখে পড়বে না।

পড়াশুনা থেকে ছুটি পেলেই দৌড়ুতাম চলে যেতাম দীপামাসির কাছে। মা অনেক সময় রাগ করতেন পড়াশুনার সময় ঠিকমত পড়াশুনা করলে এবং পড়া বললে পড়া বলতে পারলে বাবার আর কিছু চাই না। সবটাতেই বাবার প্রশ্রয় ছিল। আমার মায়ের কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক ওজর আপত্তি থাকত।

গোয়ায় যখন দীপামাসির সাথে দেখা হল তখন মনে হল দীপামাসি যেন অনেক বদলে গেছেন। আগের মতো তেমন সস্নেহ হাসি দিয়ে আমার কত্তা কথা বললেন না। একেবারেই যেন মামুলি সাক্ষাৎ। অথচ বেশিদিনের কথা নয়, পাঁচ বছর হল আমরা বহরমপুর থেকে কলকাতায় চলে এসেছি।

দীপামাসি মায়ের কাছে অনেক কথা বলেছেন। মেসোমশায়ের শরীর ভাল নয়, ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল করেনি, দু'টি মেয়ে বড় হচ্ছে, তাদের বিয়ের কথা ভাবনায় এসে যাচ্ছে। সুরঞ্জনার তো বিয়ের বয়স হয়েছেই, সুতপার জন্য না হয় আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে। দীপামাসি বলেছেন, সুরঞ্জনার মন থেকে হাসি-আনন্দ-উচ্ছলতা যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

পাঁচ-ছ' বছর আগেও সুতপা আমি সুরঞ্জনাদি শৌভিক আর ঈশানী একসাথে খেলেছি। সুতপা কখনো কখনো লুকিয়ে লাড়ু, মিষ্টি, পাটালি এনে খাইয়েছে। আমিও যখন যা পেয়েছি লুকিয়ে ওকে দিয়েছি। খেলায় দল ভাগ হলে সুতপা আমার দিকে থাকতে চাইত। অনেক সময় অনেক সত্য কথা লুকিয়ে আমার দোষ ঢাকতে চাইত। কোন অপরাধে মায়ের কাছে বকুনি খেলে ও মায়ের ওপর রাগ করত। আর এই গোয়ায় কী দেখলাম জানি। সুতপা আমার থেকে দূরে দূরে থাকছে। কোনদিন বহরমপুরে ছোটবেলা যে একসাথে কেটেছে তা বুঝবার উপায় নেই ওর আচরণে।

দীপামাসির ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল এই মনে করে যে দীপামাসি নিশ্চয়ই সুতপাকে শিখিয়েছে, এখন বড় হয়েছে, আগের মতো মেলামেশা করা আর চলে না। সুতপা যে কয়েকবার আমার সাথে কথা বলেছে, লক্ষ করেছি, ও খুব সতর্কভাবে মাঝে মাঝে একবার দীপামাসির দিকে আর একবার আমার মায়ের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমার সাথে কথা বলার জন্য দু'জনেরই অনুমতি চাইছে।

সুতপা রীতিমত সুন্দরী। যৌবনের ছোঁয়া পেয়ে আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছিল ও যে সুন্দরী সে ব্যাপারে ওকে বেশ সচেতন মনে হয়েছিল। গোয়া ভ্রমণ আমার কাছে মোটেও সুখকর হল না। অপ্রত্যাশিতভাবে যদি বা ওদের সাথে দেখা হল সুতপার সাথে আলাদাভাবে মিশবার কোন সুযোগই পেলাম না। দীপামাসিদের সাথে একসঙ্গে অনেক জায়গা বেড়ালাম, কিন্তু ভ্রমণসঙ্গীদের আমার বডিগার্ডের মতো মনে হতে লাগল। কখনো ভ্রমণসঙ্গীদের মনে হতে লাগল গোয়েন্দা বিভাগের ছোট-বড় অফিসার। অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে সুতপার সাথে একান্তে দুটো কথা বলারও সুযোগ পাইনি। কতবার মনে হয়েছিল জিজ্ঞাসা করি গোয়া তোমার কেমন লাগছে। পারিনি। ভয় হয়েছিল, সুতপা যদি তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে নিরুত্তর থাকে, অন্যেরা যদি ভাবে ছেলেটা কেমন বোকা বোকা প্রশ্ন করল। মনে হয়েছিল জিজ্ঞাসা করি, বহরমপুরে আমাদের দিনগুলো তোমার মনে পড়ে? 'আমার কথা তোমার মনে হয় না!' মনের গভীরেও এরকম কথা আনবার সাহস পাচ্ছিলাম না।

গোয়া থেকে একসঙ্গে দুই ফ্যামিলি ফিরে এল। মৈনাক অনার্স পাশ করেছে। একটা কোম্পানিতে একটা সাধারণ চাকরি পেয়েছে। কয়েকটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েছে এবং এইরকম পরীক্ষার আবারও বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংসারে হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। গোয়া থেকে ফেরার পাঁচ মাস পরে মৈনাকের বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। বাড়িতে আর্থিক অনটনের সমস্যা হয়নি। মৈনাকের বাবা যা অর্থ উপার্জন করে রেখে গেছেন তা দিয়ে অনেকদিন ভালভাবেই কেটে যাবে। ঈশানীর বিয়ের জন্যও অর্থের অভাব ঘটবে না। মৈনাক এখন একটা অতি সাধারণ চাকরি করলেও সে যে সময়ে একটা ভাল চাকরি পাবেই এ ব্যাপারে মা ও ছেলের কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঈশানীর কাছে বাবা ছিলেন পরম সম্পদ। ঈশানীর কাছ থেকে সেই সম্পদ হারিয়ে গেল।

গোয়ায় বেড়িয়ে ফেরার পর থেকে ঈশানী কেমন যেন খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। পড়াশুনা তখনো চলছে। পরনাও আসছে। ঈশানীর কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আগ্রহ নেই।

একদিন রাত্রে বাড়িতে একটা ফোন এল। বেশ উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, মৈনাক বলছ?

উত্তর দিলাম, হ্যাঁ বলছি।

ওপার থেকে এবার বলল, আমাকে চিনতে পারছ? আমি অংশুমান। মেদিনীপুরে কমার্স কলেজে একসাথে পড়তাম। আমি এখন তোমাদের কাছাকাছি এসে গেছি। আমাকে এখন আসতেই বলে। বল প্রথম দেখা করব কোথায় হবে। সৌরভ ও অর্ণবকে সাথে নেব। তুমি তো ওদের চেনো।

ঝড়ের বেগে কথাগুলি বলল। আমি থতমত খেয়ে আমতা আমতা করছি, অংশুমান শোনাল, জানি তুমি একটা বড় কোম্পানির এক্সিকিউটিভ, তোমার সময়ের দাম আছে। তুমি কি আমার সর্বশেষ খবর জান?

বদলির কারণে বহরমপুর থেকে মেদিনীপুরে গিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়েছিলাম। তারপর থেকে অংশুমানের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। ওকে স্মরণ করার জন্য তো কয়েক মুহূর্ত সময় দিতে হবে। স্থান-কাল ঠিক করার ব্যাপারটাও তো ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সারতে হবে। তাই এই আমতা আমতা। ফোন ধরে রেখে স্মরণ করতেই অংশুমানের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। অংশুমানকে প্রসন্ন করে আরও অনেক কথা মনে এল। ইতিমধ্যে ও আরও বলল, কারুর ঘরে বসব না। বসব মাঠে-ময়দানে কিংবা পার্কে। শেষে যেটা যোগ করল, বউকে বলে এসো ফিরতে রাত হবে।

আমি বললাম, শনিবার বিকেল চারটায় ভিক্টোরিয়ায় বসা যেতে পারে। ও বলল, আর একটু আগে করা যায় না? বিকেল তিনটায় কর। ঠিক এসো কিন্তু — বলে ফোনটা ছেড়ে দিল।

ফোনটা ছাড়ার পর শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হল। আচমকা এরকম ফোন পেলে সব কিছুই গুলিয়ে যায়। অংশুমানের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। ও একনাগাড়ে অনেকক্ষণ আড্ডা দিতে পারত। যখন চুপ দিত তখন অনেকদিন ওর দেখা পাওয়া যেত না। স্কুলে আসত এবং স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যেত স্বাভাবিক নিয়মে। কোনো খেলাধূলা করত না। লেখাপড়ায় ছিল ভাল ছেলে।

মনে দ্বিধা ছিল, তাও শনিবার গেলাম ভিক্টোরিয়ায়। সকলেই উপস্থিত। বেশ আনন্দ হল। চারজনেই ছোটবেলার বন্ধু। কেউ কারুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকের কাছে আর এখানে সেখানে বন্ধুদের কাছে ভাসাভাসা যে খোঁজখবর পাই তা দিয়ে ভ্রান্তি বাড়ে, আসল খবর কিছুই জানা যায় না। আমার সম্বন্ধেই অংশুমানের কাছে ভুল খবর পৌঁছেছে যে আমি বড় কোম্পানির এক্সিকিউটিভ আর আমি বিয়ে করেছি। অথচ ছোটা ঘটনা সেটা হল আমি একটা কোম্পানিতে অতি সাধারণ একটা চাকরিতে অল্পদিন হল ঢুকেছি আর আমার এখনও বিয়ে হয়নি।

আলাপের প্রথম পর্বে আমরা সেরে নিতে চাইলাম কে কোথায় কোন্ চাকরিতে আছি, চাকরির সংক্ষিপ্ত হালহকিকত, বাবা-মা-রা সাথে আছেন না দেশের বাড়িতে, ভাই-বোনেদের খবর, আর কে কে বিয়ে করেছে।

আড্ডাটা এভাবে শুরু করতে সৌরভের খুব আপত্তি। সে বলল, এটা তো ইন্টারভিউ নয় যে বিষয়গুলির ওপর সাদাসিধা উত্তর এসে যাবে। জীবন তো বহুমুখী, তাই আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ের ওপর আলাদা আলাদা টীকাটিপ্পনি এসে পড়বে আর আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই এরকম ভাষ্যকার আত্মপ্রকাশ করবে বিষয়গুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে।

সৌরভের কথাগুলি কঠিন শোনাল, কিন্তু একটু ভেবে নিয়ে আমরা সবাই একমত হলাম। সত্যি তো, মাঝাখানের বছরগুলিতে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কতো মানুষের আনাগোনা ঘটেছে।

সৌরভ বলল, আমরা এখন জীবনের যে পর্যায়ে এসেছি সেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভই আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। এই চিন্তার পাশাপাশি রয়েছে রোমান্টিক ভাবনা ও অনুভূতি — সর্বক্ষণের জন্য সমস্ত মন অধিকার করে রয়েছে নানা রঙে রসে। বিচিত্রবর্ণ রঞ্জিত কল্পনায় আমাদের রোমান্টিকতার কিছু অংশ যদি এই আড্ডায় এসে যায় তাহলে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারব আর আমাদের আজকের এই সন্ধ্যাটাও ভাল কাটবে।

অর্ণব সৌরভের কথায় সায় দিয়ে বলল, অংশুমানের জীবনটা বেশ রোমান্টিক, যতটুকু মাঝে মাঝে জেনেছি, শুনেছি, ওর জীবন বেশ গতিময়।

তাহলে তোমরা বলছ আড্ডাটা আমিই শুরু করি। সে তো অনেক কথা। তোমাদের কি ?ধৈর্য থাকবে! বয়ে চলেছি খণ্ডিত জীবন। বঞ্চনার হিসেবের পরিমিল বেড়েই চলেছে। কী দিয়ে ভরাব এই খাদ।

মৈনাক বলল, তুমি সোজাসুজি কমলিকা দিয়েই শুরু কর।

কমলিকা! চমকে উঠল অংশুমান।

তুমি কমলিকাকে জানো। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল অংশুমান।

হ্যাঁ জানি। সে গ্রাম থেকে শহর নগরে উঠে এসেছিল। যতদূর জানি এখন সে ভারতের বাইরে সুদূর আমেরিকার, যার উত্তরণ, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' থেকে 'তোমাকে সুন্দরী বললে তুমি এত রাগ কর কেন বল তো' এই অলঙ্করণে।

মৈনাক আরও বলল, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আমি মেদিনীপুর ছেড়েছিলাম। কলকাতায় এসে স্কটিশে ভর্তি হলাম। স্কুলের বন্ধুরা যে কোথায় ছিটকে পড়ল জানতে পারিনি। কলকাতায় প্রথম বছর বন্ধুহীন ছিলাম বললেই হয়, মেলামেশা তেমন যেন খুব নিয়মমাফিক ও আনুষ্ঠানিক মনে হত। একদিন জানলাম দীপান্বিতা ছেলে শৌভিক কলকাতায় চলে এসেছে। শৌভিক প্রথমে ওর মামাবাড়িতে কাশীপুরে থাকছিল, মাসছয়েক পরে ও চলে এল বিধান সরণির একটা মেসে।

সৌরভের দিকে তাকিয়ে মৈনাক বলল, অংশুমান সিটি কলেজে ও কমলিকা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে এখবর আমি প্রথমে জানতে পারি শৌভিকের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে আমি শৌভিকের মেসে যেতাম। শৌভিকের কাছে কমলিকার কথা অনেক শুনেছি। কমলিকার কথা শুনতে শুনতে কমলিকাকে দেখার ইচ্ছাও জেগেছিল। প্রেসিডেন্সিতে আর কফি হাউসের আড্ডায় কমলিকাকে দেখেছি। অনেক কিছুই শুনতাম, অংশুমানের নাম এসে পড়ত বলেও জানবার আগ্রহ জন্মাত। দু-চারবার ওদিকে গিয়েছি কিন্তু অংশুমানের সাথে দেখা হয়নি। আমরা অংশুমানের কাছ থেকে এখন ওর রোমান্সের কাহিনী শুনতে পারি।

আমি তখন মেদিনীপুরে কমার্স কলেজে টুয়েলভ ক্লাসে পড়ি। কমলিকা এসে ভর্তি হল ইলেভেনে। প্রথম দিনের কথা। ভর্তি হতে এসেছে, হাতে মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড ইত্যাদি, সঙ্গে অভিভাবক। অভিভাবকের চেহারায় গ্রামভাব ফুটে উঠেছে কিন্তু মেয়েটিকে দেখলে শহর-নগরের মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল। ইচ্ছে হল ভর্তির ব্যাপারে মেয়েটিকে সাহায্য করি।

আপনি কি উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে এসেছেন? আমি আপনাকে সাহায্য করে দেব?

না, আপনাকে কোন সাহায্য করতে হবে না। অফিসটা কোথায় বলুন না। ভর্তির ফর্ম কোথা থেকে নেব?

আপনাকে তো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের অফিসে যেতে হবে। ওরাই আপনাকে ফর্ম দেবে, ফর্ম লিখতে সাহায্য করবে আর ফর্ম জমা দেওয়ারও ব্যবস্থা করে নেবে।

ফর্ম তো কলেজের অফিস থেকেই পাওয়ার কথা। স্টুডেন্টস ইউনিয়নে যেতে হবে কেন?

আসলে, নবাগত ও নবাগতাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই কথা ভেবে তাদের স্বাগত জানানোর জন্য এই সাহায্য ব্যবস্থা। আপনি ইচ্ছা করলে কলেজের অফিস থেকেও ফর্ম নিতে পারেন। মেয়েটিকে আমি কলেজের অফিস দেখিয়ে দিলাম। এরপর ঐদিনের জন্য আমি হাল ছেড়ে দিলাম। পরের দিন মেয়েটিকে আবার দেখলাম। যতদূর মনে হল মেয়েটি একা, অভিভাবক সাথে নেই। কাছাকাছি চারদিক তাকিয়ে নিয়ে অভিভাবকের কোন চিহ্ন পেলাম না। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল ফর্ম জমা দেওয়া হয়েছে তো?

না, কাল ফর্ম পাইনি। যাঁর কাছে ফর্ম থাকে তিনি ছিলেন না। আজও নাকি তিনি আসবেন না।

আমি বললাম, তাহলে চলুন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফিসে যাই। আজ মেয়েটি আর আপত্তি করল না। আমি দারুণ উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে মেয়েটিকে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সামনে দাঁড় করিয়ে ফর্ম পূরণ করিয়ে জমা দিয়ে দিলাম। ফটোকপি করানো এবং সেগুলিকে প্রত্যয়িত করানো ইত্যাদি সবই করলাম।

অংশুমান অর্ণব ও সৌরভের দিকে তাকিয়ে বলল, দ্বিতীয় দিনে আমার আগ্রহের আতিশয্য কেন বুঝতে পারছ? ঐদিন মেয়েটি এসেছিল একা। কচিৎ কদাচিৎ এরকম সুযোগ পাওয়া যায়। ফর্ম জমা দেওয়া হল। এবার মেয়েটিকে বললাম, চলুন ঐ গাছতলায় বসে একটু বিশ্রাম করে নিই, একটু আলাপ-পরিচয়ও হয়ে যাবে

আমার বিশ্রাম করার দরকার নেই। আপনি গাছতলায় বসুন গিয়ে। ভর্তি যখন হচ্ছি আলাপ-পরিচয় তো হবেই। আজ থাক। বাবা চিন্তা করবেন।

কাল আপনার সাথে যিনি ছিলেন, উনি কি আপনার বাবা?

হ্যাঁ। আচ্ছা, আজ আসি।

মেয়েটি দ্রুতগতিতে কলেজ থেকে বেরিয়ে চলে গেল। দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত আমি ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। আকৃষ্ট হওয়ার মতো মেয়ে।

প্রায় পনেরো দিন বাদে ইলেভেনে ক্লাস শুরু হল।

ক্লাস শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরের কথা। ভাবলাম আজ যেমন

করেই হোক মেয়েটিকে ধরব। আলাপ করতে হবে তো! কোথায় থাকে, বাবা-মা কেমন — কড়া না নরম প্রকৃতির, জাঁদরেল না সাদাসিধা, ভাই-বোন ক'জন — এসব খোঁজখবর নিতে হবে তো! আসলে বাবা-মা'র তাড়া খাওয়া কিংবা ভাই বা দাদার তেড়ে আসার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্যই এই চিত্তচাঞ্চল্য। ছুটির পর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে বললাম।

আপনি কোথায় থাকেন?

কেন! হোস্টেলে।

হতাশ হলাম। হোস্টেল মানে তো কলেজে যা যতটুকু দেখাসাক্ষাৎ হবে। কলেজের বাইরে দেখা হওয়ার কোন সুযোগই থাকল না। এবার জানতে চাইলাম, মেদিনীপুর জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে?

এ তো আমার নিজের জায়গা। খুবই পরিচিত জায়গা। আমার বাড়ি দিঘো। এখানে আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন।

ভাবলাম 'নিজের জায়গা', 'অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন' এই কথাগুলি বলে কমলিকা আমাকে সতর্ক করে দিল। কমলিকা আকর্ষণীয় হলেও কেমন যেন একটা হাবভাব নিয়ে থাকত, যে কারণে ছেলেরা ওর কাছে সহজে ঘেঁষতে সাহস পেত না। কমলিকার কাছ থেকে এরকম সাদাসাপ্টা নীরস জবাব পেয়েও দমলাম না। মনের মধ্যে নিরন্তর নানারকম ছল-ছুতো খোঁজার কাজ চলতেই থাকল।

অংশুমান একটু থামল। তারপর নৈনাকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল — নৈনাক, স্কুলে তোমার শিল্প ছাড়ত না সেই বন্ধুটি — অমিতাভ, একদিন একটা কাণ্ড করে বসল। কমলিকার কাছাকাছি এসে চড়া সুরে গাইল গান, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। গানের সাথে ছিল উঁচ্চা নৃত্যভঙ্গি। আর যায় কোথায়! কমলিকার মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠল। সে দ্রুতগতিতে সোজা চলে গেল প্রিন্সিপালের কাছে। অভিযোগ জানাল। অমিতাভ'র ডাক পড়ল প্রিন্সিপালের ঘরে। প্রিন্সিপাল অমিতাভকে যারপরনাই তিরস্কার করে সতর্ক করে দিলেন। এখানেই শেষ নয়। ডাক পড়ল অমিতাভ'র বাবার। প্রিন্সিপাল অমিতাভ'র বাবাকে সাফ জানিয়ে দিলেন এরপর অমিতাভ'র আচরণ অশোভন হলে তাকে চিরদিনের জন্য পড়াশুনা থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে। ছেলেটা স্বভাবে সত্যিই নিরীহ। আবেগের জোয়ার এসে হঠাৎ ওর সব কিছু গোলমাল করে দিয়ে গেল। এই ঘটনার পর থেকে ও কেমন ম্রিয়মান হয়ে গেল। কারুর সাথেই আর তেমন করে মিশত না। ওকে দু-একবার একটা অদ্ভুত কথা বলতে শোনা গেছে, না তো মেয়েছেলে, মা এই ঘটনা শুনে আমাকে কি মনে করল! এই চিন্তা ওকে বোধহয় সবচাইতে বেশি বেদনা দিত।

এই ঘটনার পর সবাই ভয় পেয়েছিল। কমলিকার দিকে নজর দিতে আর কেউ সাহস করত না।

অংশুমান বলে চলেছে — আমি কিন্তু এই ঘটনায় দমেও যাইনি, ভয়ও পাইনি। আমি সাবধান হয়েছিলাম। নানা ছলাছুতো করে ওর সাথে কথা বলা ও ভাব জমাবার চেষ্টা করতাম।

কমলিকা খুব একা হয়ে যাচ্ছিল। কমলিকা নিজেও হয়ত মনে মনে তাই ভেবেছিল। কমলিকা কি বুঝতে পারছিল না যে সব ছেলেই যদি ওর প্রতি উদাসীন নির্লিপ্ত ও নির্মোহ হয়ে যায় তাহলে ওর নারী জীবনের অস্তিত্বের প্রকাশ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। হয়তবা এইরকম কোন উপলব্ধি থেকে কমলিকা একটু সহজ হতে শুরু করেছিল।

অংশুমান আরও বলল, কমলিকাকে আমি ছেড়ে দিইনি। নানা ছলাছুতোয় ওর সাথে মিশবার চেষ্টা করেছি। ও কিন্তু কিছুতেই আমল দিতে চাইছিল না। একদিন কলেজ ছুটির পর ও যখন হোস্টেলের পথে পা বাড়িয়েছে, আমি ডাকলাম। বললাম, একটা দরকারি কথা আছে। ও একটু ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বলুন, কি বলবেন।

স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নির্বাচন আসছে। তুমি কি দাঁড়াবে?

প্রত্ত জবাব এল, না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

ও বলে বসল, আপনাকে কি তার কৈফিয়ত দিতে হবে না কি?

আমি বললাম, কৈফিয়ত দেবে কেন। না চাইলে দিও না। কারণ জানতে পারলে একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের গুরুত্ব বাচাই করা যায়। আর এইভাবে সকলের মধ্যে তার স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ও এবার বলল, কারণ অন্য আর একদিন বলব।

এইভাবে বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখে কমলিকা আমাকে আর একদিন কথা বলার সুযোগ করে দিল।

অংশুমান কমলিকাকে নিয়ে এবার একটা মজার ঘটনা বলল।

একদিন আমাদের ক্লাসে একটা নোটিশ পড়ে শোনান হল। নোটিশের মর্ম হল, ইংরেজির একজন অধ্যাপক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় ইলেভেন ও টুয়েলভ ক্লাসের ইংরেজি ক্লাস একসাথে নেওয়া হবে এবং ছ'নম্বর রুমে সেই ক্লাস হবে। টুয়েলভের জন্য নির্দিষ্ট অথচ পড়ানো হয়নি এমন গদ্য ও পদ্যগুলি পড়ানো হবে এবং সেগুলি ইলেভেন ক্লাসের পাঠ্যসূচিতে যুক্ত হবে। ইলেভেনের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি বাদ যাবে এবং সেগুলি পরে টুয়েলভে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অধিকাংশে ছেলের মধ্যে উল্লাস ধ্বনি। ইলেভেনের আরও অনেকগুলি মেয়ে আসবে আর প্রথম কয়েকটি বেঞ্চ নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠবে। সবচাইতে বড় প্রাপ্তি কমলিকার উজ্জ্বল উপস্থিতি। কয়েকটি ছেলে বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে জেনে এল প্রথম দিন 'দি সলিটারি রিপার' পড়ানো হবে। গোল বাঁধল প্রথম স্তবকে Stop here or gently pass! এক ছাত্র অকৃত্রিম সরলতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, স্যার, কবি একথা কি করে বলতে পারলেন। নির্জন শস্যক্ষেত্রে একা মেয়ে শস্য কাটছে, সেখানে কি কেউ থেমে দাঁড়িয়ে ঐ মেয়ের গান শুনতে পারে? ঐ মেয়ে তো আপত্তি করতে পারে, ভয় পেতে পারে। গান শুনতে শুনতে শুধু আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাওয়া যায়। ঐ ছেলেটির পত্রের কথাগুলি খুব মজাদার। স্যার, কমলিকাও তো সেদিন দাঁড়িয়ে শুনতে পারত কিংবা আস্তে হেঁটে চলে যেতে পারত। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' শুনে প্রিন্সিপালের কাছে অমিতাভর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ঠিক হয়নি। ক্লাসে হাসির রোল উঠল।

কমলিকা সবই দেখল ও শুনল? ওর করার কিছু ছিল না। ক্লাস শান্ত হলে স্যার বললেন, তোমরা ছোট তাই তোমরা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় কাজ কর। তোমরা বড় বড় হতে থাকবে পরিণত হবে তত তোমাদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞিজ্ঞতা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে দূরে সরিয়ে দেবে।

এরপর থেকে ক্লাসে কমলিকার ডাকনাম হয়ে গেল 'দি সলিটারি রিপার'।

কলেজে কমলিকা ক্রমেই বিখ্যাত হয়ে উঠছিল। তবুপরি ও কিন্তু হাসির পাত্র হয়ে ওঠেনি। সকলেরই ওর প্রতি একটা সমীহবোধ ছিলই। ও নিজেকে সেইভাবেই তৈরি করছিল। অনিতাভ'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ওর কিন্তু বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বা অপরাধবোধ দেখা দেয়নি। বরং ওর মনোভাবটা ছিল এইরকম, তোমার কাজ তুমি করেছ, আমার কাজ আমি করেছি।

অংশুমান ছোটবেলায় শিলোয় থেকেছে। শিলোর সমৃদ্ধ গ্রামে উভয়েরই বাস ছিল কিন্তু কেউ কাউকে জানত না। কমলিকার বাড়ি শিলোয় জানার পর থেকে অংশুমান শিলোর সাথে যুক্ত ওর পরিচিতদের কাছ থেকে কমলিকা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছে। এজন্য অংশুমানকে আগ্রহ দেখাতে হয়নি, চেষ্টাও করতে হয়নি।

অংশুমান কমলিকাকে যেমনভাবে জেনেছে তা বলতে গিয়ে বলল, এক একজন মেয়ে থাকে যারা কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে পা বাড়াতে না বাড়াতে স্বরচিত অনেক নিষিনিষেধের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলে আর গড়ে তোলে সংযমের প্রাচীর। নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে গড়া এই প্রাচীর যখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত সকলের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায় ও আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠে তখন লক্ষ্মণরেখার মতো ঐ গণ্ডি পার হতে পারে না এইরকম মেয়েরা। কখনো নীতিবোধ, কখনো সংস্কারের শিকুটান অথবা আভিজাত্যের অভিমান অথবা একটানা ঈর্ষণীয় সাফল্য এইরকম গণ্ডিকে দুর্ভেদ্য করে তোলে। কমলিকা ছিল এইরকম একটি মেয়ে। কলেজে পড়ার সময় মিতভাষী এই মেয়েটি স্মিতহাস্যে সৌজন্যমূলক শুভেচ্ছা বিনিময় করত সকলের সঙ্গে। কারুর সঙ্গে কেন ঘনিষ্ঠ হতে নেই। কখনো কোন মিতভাষী দরাজ মনের ছেলে যদি সন্তর্পণে ভালবাসা সন্তর্পণে নিয়ে এই লক্ষ্মণরেখা গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে এগিয়ে যায় তখন সব কিছুই খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। অনেক সময় ছেলেটিকে মূল্য দিতে হত প্রচুর।

অংশুমান নিজের কথা আর টানতে পারছিল না। রাত্রি নেমেছে। সকলেরই ফেরার তাড়া। ভিক্টোরিয়ায় আড্ডাটার ইতি টানতে হল। পরে আবার একদিন বসা যাবে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ আর আসেনি।

মেদিনীপুরে উচ্চমাধ্যমিক সেরে অংশুমান কলকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কমলিকাকে ছেড়ে এসেছে মেদিনীপুরে। কোন যোগাযোগ নেই। সিটি কলেজে এখন সে একজন ছাত্রনেতা। তার লক্ষ্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও চার্টার্ড সেক্রেটারি হওয়া। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। কমলিকা ভর্তি হল প্রেসিডেন্সি কলেজে। অংশুমানের মনে হল একেই বলে ভাগ্যের লিখন। যে কমলিকা হারিয়ে যাওয়ার কথা, যার সাথে কোন যোগসূত্রই গড়ে ওঠেনি, যার সাথে ভালবাসা ব্যাপারটাই গড়ে তোলা যায়নি, তার সাথে এইভাবে নতুন করে দুটো বছরের সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের লিখন তো নিশ্চয়ই।

কমলিকা কলকাতায় পড়তে এসে ঠিক হয়েছিল সে মামাবাড়িতে থাকবে। কমলিকার মামা বড় পুলিশ অফিসার। কমলিকার দুই মামাতো বোন এশাকী আর এবা। এশাকী কমলিকার চাইতে এক বছরের বড় আর এবা এক বছরের ছোট। এই তিন বোনের মধ্যে ভাব-ভালবাসা ছিল বরাবরই। শিলোয় গেলে এশাকী আর এবা সর্বক্ষণের জন্য কমলিকার সাথে গল্পগুজব করেই কাটাত।

কমলিকার বাবা রাজনৈতিক ব্যক্তি। তাঁর রাজনীতি ছিল মূল্যবোধের রাজনীতি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, ভিন্ন দলের লোকেদের হেনস্থা করার রাজনীতি, স্থানীয় স্কুল-কলেজে ছাত্র-শিক্ষক আঁতাতের রাজনীতি তিনি পছন্দ করতেন না। কমলিকা দেখেছে তার বাবার টাইপের রাজনীতিতে ওপরে ওঠা যায় না এবং সেইজন্য বাবা স্থানীয়ভাবে রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেন। ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের হাবভাব চালচলন কমলিকাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। সে তার মামাকে ক্ষমতাবানদের অন্যতম বলে মনে করত। ক্ষমতার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ সংক্রান্ত ছোট ছোট ঘটনা সে মনোযোগ দিয়ে শুনত। মামাও উৎসাহ পেতেন।

মামা ক্ষমতাবান আর মামিমা কূটকৌশলে। মামার বাড়িতে এসে কমলিকা দেখল তার মামিমা অত্যন্ত পরশ্রীকাতর। সমালোচনা ও নিন্দার বরাদ্দ রয়েছে সকলের জন্য, স্বামীও বাদ যান না। অনেক কথা বলেন, শোনেন না কারুরই। স্বামীর অফিসের কথা এমনভাবে বলে চলেন যেন উনি নিজেই পুলিশ অফিসার। ওনার মতামত উনি ব্যক্ত করেন অন্যের জবানিতে। উজ্জ্বলার মা বলল ...., সৌমর মা বলেছে .... পদ্ধতিতে উনি নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চান। ওনার কাছে ওনার বাপের বাড়ির যাঁরা অর্থবান তাঁরাই কেবল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কোন পুরুষ মানুষের সাথে উনি সহজ সহকারে কথা বলেন না ছোট মেয়ে এবা একেবারে মায়ের মতো। মেয়েদের ভাল-মন্দ দেখার অধিকারটুকুও খুইয়ে বসে আছেন মামা। এইরকম পরিবেশে কমলিকার সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত হতে থাকল। কমলিকা মামা-মামিমাকে দূর থেকে দেখেছিল, অল্প সময়ের দেখা আর সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যুক্ত হয়ে যে ছবি তৈরি হয়েছিল তা মামাবাড়িতে থাকতে এসে অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল। বাপের বাড়ির লোকজন দিয়ে উনি ভরিয়ে রাখেন সংসার, সময় ও বিনোদন। কমলিকার বুঝতে সময় লাগেনি যে সে আশ্রিতা। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন হল যে এবা কমলিকাকে সহ্য করতে পারছে না। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধতে লাগল। কমলিকা মামাকে দেখল স্বার্থ সন্ধানে, চাটুকারিতায় আর ভয়ে। এই ধরনের মানুষের ওপর নির্ভর করলে হতাশ হতে হয়।

কমলিকা যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে তার সাথে মামার বাড়ির পরিবেশের কোন মিল নেই। মামাকে দেখে দেখে আর ভিন্নজনের সাথে মেলামেশা করতে এবং কারুর মারফতে মামার কথা বলার মধ্য দিয়ে কমলিকা যেভাবে মামাকে চিত্রিত করেছিল তা কমলিকার ডায়েরি থেকে পেয়েছিলাম। কমলিকা লিখছে — পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা সারাদিনের নানা কাজকর্ম ও আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে স্বার্থসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরে আর উপযুক্ত তদবির আবিষ্কার করতে পারে। এ আবিষ্কার

চলে প্রতিদিন, প্রতি কাজকর্মের সূত্র ধরে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে পার্থিব বিষয়ে প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল করতে কোন না কোন মানুষকে খুঁটি হিসাবে এরা ধরে রাখে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন না কোন খুঁটি এদের থাকতেই হয়। খুঁটি না হলে এদের চলে না। এরা খুঁটির ওপর নির্ভর করে। অন্যের বাস্তবরূপ উপেক্ষা করে, লজ্জা, ভয় ও সঙ্কোচকে অতিক্রম করে এই খুঁটি-নির্ভর মানুষেরা স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন দিতে অতি সহজেই খুঁটির সেবাদাস হয়ে উঠতে পারে। খুঁটির কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেলে এরা খুঁটিকে শুধু ত্যাগ করে না, ঘৃণাত উপেক্ষা এবং বস্তুত নিন্দা-সমালোচনার দ্বারা একদা গৌরবান্বিত খুঁটিকে খাটো করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এদের না থাকে ব্যক্তিত্ববোধ না আত্মমর্যাদাবোধ। এরা সমাজে, সংসারে, কর্মজীবনে এসে খুঁটির মধ্যে শক্তির সন্ধান করে চলে। খুঁটির শক্তি যাই হোক না কেন তা যদি সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট মনে হয় তাহলে এরকম ব্যক্তিত্বহীন মানুষেরা খুঁটিকে আরও বেশি শক্তিমান বলে ভুলে ধরে। এরা কিন্তু খুঁটির শক্তি ও ক্ষমতার নিখুঁত পরিমাপক যন্ত্র। আরও শক্তিমান ও ক্ষমতাবান দেখানোর পরিসরটুকু সৃষ্টি করে অকৃত্রিম ভক্তের উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ কার্যকরী অথচ বিষয়মুখী সেই ক্ষেত্রগুলি এরা দ্রুত আবিষ্কার করতে পারে এবং সেইভাবে খুঁটির সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এই ধরনের মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে এরা সচেতনভাবে খুঁটির কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির রূপ রাখবার জন্য উৎসাহিত বোধ করে এবং এতদুদ্দেশ্যে এরা নানারকম গল্প ফেঁদে নিজের ক্ষমতা জাহির করে। আবার এ-কথাও সত্যি যে, খুঁটির ক্ষমতাকে উৎস মেনে এরা সেই ক্ষমতার ছিটেফোঁটার অধিকারী হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর মানুষের একাংশ আবার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই সমস্ত মানুষ আর আর যে সমস্ত দোষ-গুণে বিভূষিত সেগুলি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আনি অকৃত্রিম ভক্তের রসে সিক্ত। এই স্বার্থান্বেষী দুর্বলচিত্ত মানুষেরা ভয় করে সেই সমস্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে, যারা ক্ষমতা প্রয়োগের সাথে সহজেই মিশিয়ে ফেলতে পারে ক্ষতি করার মানসিকতা।

কমলিকা কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আসার পর থেকে অংশুমানের সাথে পার্কে, রেস্টুরেন্টে, কফি হাউসে বসেছে। এখন সে আর আগের মতো নেই। অংশুমান একদিন সেই পুরনো কথা তুলল। স্টুডেন্টস ইউনিয়নে কমলিকাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কমলিকা রাজি হল না। কমলিকার মতে স্টুডেন্টস ইউনিয়নে দলীয় রাজনীতি বজ্রকঠোরভাবে কাজ করে। ছাত্র-স্বার্থের কথলে দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই যেন এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিবেদিত। কমলিকা তার মনোভাবকে সুস্পষ্ট ভাষার নথিভুক্ত করেছিল। কমলিকা বহুরূপে রাজনীতি দেখেছে। তার বাবা পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ, সারাটি জীবন মূল্যবোধের রাজনীতি করেছেন। কমলিকা বাবার কাছ থেকে শিখেছে, মানুষকে মুক্তি ও শান্তি দিতে না পারলে তাকে চিন্তা করার সময় দেওয়া হয় না। আর তাকে স্থিরভাবে চিন্তা করার সুযোগ না দিলে তার কাছ থেকে সমাজের জন্য স্থায়ী অবদান পাওয়া সম্ভব নয়। কমলিকা দেখেছে তার বাবা হেলপ্লা হয়েছেন খুব সাধারণ সাধারণ মানুষের কাছে। যাঁরা যত সুযোগ নিয়েছেন, তাঁরা তত বিদ্রোহী হয়েছেন, কারণ সুযোগ নেওয়া স্বাভাবিক নিয়মে একদিন থামবেই। বাবা বারবার বলেন, গরিব তো কী হয়েছে। সরকারের কাছে এত প্রত্যাশা করা তো ঠিক নয়। সবাই একা একা আলাদা আলাদা উন্নত হতে চায়। ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা নেই। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার সামাজিক চরিত্র লক্ষণটুকুও ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। এমনিভাবে সব চলছে, কোন প্রতিবাদ নেই, নেই কোন প্রতিকার। গ্রামে গ্রামে রাজনীতির নামে চলছে কাদাছোঁড়াছুড়ি। গ্রামের পটভূমিতে বসে কমলিকা দেখেছে এক শিক্ষক ছাত্রদের একাংশকে লেলিয়ে দিচ্ছে আর এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে, শিক্ষকদের একাংশ ছাত্রদের একাংশকে লেলিয়ে দিচ্ছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর প্রধান শিক্ষক মাথা মুড়িয়ে ছুটছে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে। একই স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে ঐক্য নেই। শুধু দলাদলি আর রেষারেষি। ছাত্ররা কি দেখছে! তারা কি অন্ধ? তাদের বোধবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা উন্মেষের অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষকরা তাদের গণ্ডি পার হয়ে পড়ে থাকছে রাজনৈতিক প্রসাদ লাভের উদ্দেশ্যে। গ্রামের চিত্রের পাশাপাশি শহর-নগরের চিত্র রাখলে কী ভয়ঙ্কর লাগবে এই শহর-নগরের কাহিনী। যাঁরা বুদ্ধিজীবী তাঁরা বুদ্ধিজীবী খেতাব ত্যাগ করুন। গ্রামেগঞ্জে মানুষ নীতিহীনতায় ভুগছে। সমগ্র পরিস্থিতিটা অসহ্যতর। ছাত্ররা দেখছে তারা অসহায়। অভিভাবকরা দেখছে তারা অসহায়। সমাজ দেখছে কিন্তু তারা এতভাবে বিভক্ত যে তারা সবচাইতে অসহায়। সমাজ কেমনভাবে বিভক্ত তা বর্ণনার অতীত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত, জাতপাতে বিভক্ত, ধনের বৈষম্যে বিভক্ত, চাষি-অ-চাষি, শ্রমিক-অ-শ্রমিক ইত্যাদি আরও অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা দেখতে গিয়ে আমরা সমষ্টির জন্য স্থায়ী কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলিনি।

কমলিকা মামার বাড়িতে আছে। পিসোয় বাবা-মার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। কমলিকা মামার বাড়ির পরিবেশের কথা বলতে পারছে না। মামাবাড়ি ছেড়ে কোন হোস্টেলে যাওয়ার মত সিদ্ধান্ত ওর একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। এরকম একটা পদক্ষেপ নিতে গেলে আলোচনা ও উপযুক্ত ব্যাখ্যা চাই এবং দুই ফ্যামিলির অতি আপনজনেরা জড়িয়ে পড়বেন। কমলিকা ভেবে পায় না সে কী করবে। এলাকীও কমলিকার প্রতি উদাসীনভাব দেখাচ্ছে। মামার বাড়িতে মামার সাথে কিছু কথা বলা যায় কিন্তু ভরসা নেই। মামা একনই কোনো ব্যাপারে হয়ত সম্মত হবেন আবার পরক্ষণেই মামিমা যদি ঘোল বাঁধিয়ে দেন তাহলে চুপ করে যাবেন। মামিমার তো বাপের বাড়ির রেজিমেন্ট আছেই। কোন কথা মামাকে বললে, মামা যে সে-কথা মামিমাকে কিভাবে বলবেন তার ওপরও ভরসা নেই। নিজের মেয়ের ক্ষেত্রেও মামিমার কথাই শেষ কথা। ছোট মেয়ে এবা বলবে, বাবাকে এত পাত্তা দিও না তো! ছোটমেয়ের এরকম কথা মা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে আর বাপের বাড়ির লোকের সাথে বসে গল্প করবে। মামিমা কোন সময় বলবে, তোর মামা অনেক বড় অফিসার তো! একটু পরেই হয়ত শোনা যাবে মামাকে বলছে, তোমার কি আছে? দুটো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সেই তো আমার বাপের বাড়ি থেকে আনতে হবে। মেয়েদের পড়ার ব্যাপারে তো কিছুই দেখ না, শুধু বল এইটা করতে হবে, ঐটা করতে হবে। ওদের ক্ষমতায় না কুলোলে কি হবে। ওদের তো ছোটবেলা থেকে পাঁচটা মাস্টার দাওনি। এখন বললে কি হবে। এইভাবে মামিমা সংসারের প্রতিটি ব্যাপারে নাক গলান এবং সব পরামর্শ আসে বাইর থেকে। কখনো অরিন্দমের মা কখনো সুজাতার বাবা, কখনো নারায়ণদা আর সব সময়ের জন্য বাপের

বাড়ির লোকজন। বাড়িতে পূজা করা, ভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে যাওয়া ইত্যাদি কাজে মামার খুব আগ্রহ। অথচ মেয়ে যদি পরীক্ষায় ফেল করে তাহলে মামিমার হুকুমে প্রয়োজন মতো ইউনিভার্সিটিতে দিয়ে তদবির করতে ছাড়েন না। মামা এভাবে মেয়েকে যে অতীতে পাস করিয়েছেন তাও গর্ব করে ঘটা করে বলতে মামিমার কোন দ্বিধা হয় না। দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই আনার জন্য মামিমা মাঝে মাঝে বলছেন। দুটো জামাই কলকাতারই হতে হবে। তার মধ্যে একজন ডাক্তার হওয়া চাই। মামিমার অনেক কাল্পনিক রোগ আছে। সর্বসময়ের জন্য এবং বহুরের প্রতিদিনের জন্য কোন না কোন ওষুধ মামিমার চাই-ই। স্বাদ পাল্টানোর জন্য কখনো কখনো মামিমা হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ওষুধও খান। উনি এক ডাক্তারের ওষুধ বেশিদিন খাওয়া একদম পছন্দ করেন না। উনি যেদিন বুঝতে পারেন অ্যালোপ্যাথিকে সাইড এফেক্ট আছে কিংবা একথা ওনার বাপের বাড়ির লোক অথবা বাইরের কেউ যখন স্মরণ করিয়ে দেন তখন উনি গাড়ি ডাকিয়ে স্বচ্ছন্দে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে পৌঁছে যান। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওনার প্রথম কথা, উনি অনেক বড় অফিসার তো তাই আসতে পারলেন না।

আমি যখন এই আখ্যানিকা লিখতে বসলাম তখন আমার বারবার মনে হয়েছিল যে সন্তানের ওপর পিতা-মাতার যে চাপ অলক্ষ্যে কাজ করে তাকে জীবনের উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে তা আমি কেমন করে লেখনীতে প্রকাশ করব। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের ভারসাম্য বজায় রাখা যে কি সুকঠিন কাজ তা আমরা উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারলেও কাজে পরিণত করার সময় এমন এমন সময় ও পরিস্থিতি আসে যে আমরা অসহায় বোধ করি। ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়েও আমরা দেখি মাতৃত্বের অসামঞ্জস্য, ব্যবধান ও বৈষম্য সর্বদা প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল ও কোথাও থাকে।

অংশুমান ও কমলিকা মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বসে গল্প, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি দিয়ে সময়টাকে উজ্জ্বল করে তোলে, কিন্তু কমলিকার মনে যে সুখ নেই তা গোপন থাকে না। কমলিকা তার সমস্যার কিছু কিছু কথা অংশুমানকে বলেছে। অংশুমানের যে কিছু করার নেই কমলিকা তা ভাল করেই বোঝে। একদিন জীবনের জটিল দিক নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা চলছে আর কমলিকাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছে এরকম সময় পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্য অংশুমান বলল, তোমাকে সুন্দরী বললে তুমি এত রাগ কর কেন বল তো?

আমি সুন্দরী, তোমাদের মতো দু-চারজনের কাছে। সবার চোখে, আমি তো সুন্দরী হয়ে উঠতে পারব না। আমার সৌন্দর্য সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতেও পারব না। আমি সুন্দরী শুনলে আমার আনন্দ হয় না। যদি বা ক্ষণিকের জন্য আনন্দ পাই তা চকিতে মিলিয়ে যায়।

তোমার সাথে আলাপ অল্পদিনের। তুমি জান না আমি অলক্ষ্যে তোমার ওপর নজরদারি করে চলেছি অনেকদিন ধরে। আমার মধ্যে একটা ভয় অনেকদিন ধরে আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পাছে তুমি কোনদিন কোথাও ধরা দাও কিংবা হঠাৎ যদি তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে যায়। তুমি অন্যের অধিকারে ... তাহলে আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ি, আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসে।

তুমি কি তাহলে আমি তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি। আমার ওপর তোমার অধিকার জন্মেছে?

আমি ঠিক এরকম ভাবিনি। তোমার সাথে এখানে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার আতঙ্ক অনেকটা কেটেছে। আশা-ভরসা এমনিতেই এসে যায়। আশা-ভরসার জন্য তো তপস্যা করতে হয় না, হতাশ বা নিরাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত তা জীবন্ত থাকে।

সেদিনের ঘটনা তোমাকে বলা হয়নি। শুনলে তুমি চিন্তিত হবে।

একদিন খুব ঘটা করে আর দামি পোশাক পরিচ্ছদ ও প্রসাধনে প্রস্তুত হয়ে মামা মামিমা ও এবা ভিনারের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেলেন মামার ওপরওয়ালা যোগীন্দ্র মজুমদারের বাংলোয়। মামা আমাকেও যেতে বলেছিলেন, আমার ইচ্ছে হয়নি। মনে হয়েছিল মামিমা প্রাণে খুশি হয়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম মামা আমাকে যেতে বলেছিলেন বলে মামিমার কাছে খুব কথা শুনতে হয়েছিল। ডিনার থেকে ফিরে আসার পর দেখলাম সবাই খুব খুশি কেবল মামার কোন উচ্ছ্বাস ছিল না।

বল্ এবা, ছেলেটা কী সুন্দর দেখতে। লম্বা, কর্সা, স্বাস্থ্য ভাল, মুখশ্রী সুন্দর, কথাবার্তাও ভাল, সব সময় আদবের সাথে থেকে আনন্দ দিয়েছে, কোন অহঙ্কার নেই। আমরা এতদিন না গিয়ে খুব ভুল করেছি।

তুই কিন্তু ওর দিকে হাত বাড়াবি না। ওকে আমি মানেজ করে নেব। ও আমার জন্যই থাক।

যোগীনবাবুর ছেলে রঞ্জতাভকে দুই মেয়েরই পছন্দ হয়েছে জেনে মামিমা এগিয়ে এসে বললেন, তোদের বাবাকে কতদিন ধরে বলছি ওখানে একদিন চল। আমার কথা মোটে কানেই নেয় না। বাড়িতে দুটো মেয়ে রয়েছে আর ওঁদের একমাত্র ছেলে। ওর জন্যে কি আছে বলা যায়! অতবড় অফিসারের ছেলে!

কমলিকা বলল, রঞ্জতাভ সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছুই জানতে পারিনি সেদিন। মামিমা এপাশী আর এবা প্রায় সব সময়ই একসাথে বসে নানারকম আলোচনা করে, একসাথে মার্কেটিং করতে বেরোয়, একসাথে সিনেমা-থিয়েটারে যায় আর একসাথে টিভি সিরিয়াল দেখে। নারকের আলোচনা যত হয় সেই তুলনায় নারিকার আলোচনা কম। পড়াশুনার আলোচনা হয় না, হয় পরীক্ষা পাসের আলোচনা।

কমলিকা বলে চলল, ঐদিনের পর থেকে মা ও দুই মেয়ের আরম্ভ হল কেমনে রঞ্জতাভ'র সাথে কথা বলার প্রতিযোগিতা। একদিন যোগীন-বাবুর ফ্যামিলি এলেন ডিনারে। বাড়িতে হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। মা ও দুই মেয়ের মধ্যে কার বেশি আনন্দ তা বুঝবার উপায় ছিল না। মামিমা আমাকে দায়িত্ব দিলেন পরিবেশন করার। বললেন, এপাশী আর এবা তো রঞ্জতাভ'র সাথে কথা বলতে ব্যস্ত থাকবে, তাই এই কাজটা তুমিই কোরো। অতবড় অফিসারের বেলায়ে তো আর কাজের মাসি আর জন্য কাজের লোক দিয়ে পরিবেশন করানো যায় না।

জানো অংশু, যোগীনবাবুকে দেখে আমার খুব মজা লাগছিল। এই সেই লোক, যিনি আমার মামার মতো বড় অফিসারকে ফোনে ধমক দেন আর ধমক খেয়ে মামা শুধু বলেন, আপনি ভাববেন না, স্যার। একদিন তো দশ মিনিটের ফোনে আমি হিসেব করে দেখলাম মামা ন'বার বললেন, আপনি ভাববেন না, স্যার। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, যাই হোক, নয় সংখ্যাটা তো ওর। রঞ্জতাভ'র সাথে আমারও আলাপ হল। আলাপ

করিয়ে দিলেন মামা। মনে মনে কষ্টও পেয়েছিলাম, হয়ত এই আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যও মামাকে মামিমার কাছে বকুনি খেতে হবে। যোগীনবাবু নিজের থেকে আমার খোঁজখবর নিলেন এবং যোগীনবাবুর স্ত্রী বললেন, ওমা! সেদিন আপনার ভাগ্নিকে নিয়ে গেলেন না কেন! আমরা কী করে জানব আপনার ভাগ্নি এখানে থাকে, তাহলে ওকেও আলাদা করে নেমন্তন্ন করতাম। রজতাভ'র কিন্তু আমার দিকে কোন দৃষ্টিই ছিল না, এলাকী আর এষাকে নিয়ে গল্প ও কথায় মশগুল ছিল। বয়সে তরুণ বলে লজ্জায় ও সঙ্কোচে পরিবেশনের সময় রজতাভ'র প্রতি আমি একটু কম দৃষ্টিই দিয়েছিলাম। যোগীনবাবু আমাকে পাশে বসিয়ে আমার মুখ থেকে সোজাসুজি অনেক কথা জেনে নিলেন। যোগীনবাবুর স্ত্রীর মুখে হাসিটি লেগেই ছিল।

দুই ডিনারের ফেল টেনে রজতাভ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতে শুরু করল। অনেকদিন দেখেছি এলাকী আর এষা দুজনেই রজতাভকে সঙ্গ দিত। মামিমা নিশ্চিন্তে তাঁর অন্দরমহলে বাপের বাড়ির পোষাদের নিয়ে আহ্লাদে ভরপুর হয়ে উঠতেন। লেখাপড়ায় রজতাভ অতি সাধারণ, এলাকী, এষাও তাই। এলাকী, এষা হয়ত কোনদিনই গ্র্যাজুয়েট হতে পারবে না। রজতাভ সাধারণ বি এস-সি। যোগীনবাবু তাঁর ছেলেকে ইলেকট্রনিক্স-এর এক কোম্পানিতে সেলস্-এর কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। রজতাভ স্মার্ট। কোম্পানির কাজ করছিল বেশ দক্ষতার সাথে। বড় পুলিশ অফিসারের ছেলের যদি দক্ষতাও থাকে তাহলে সুনজরের পরিমাপটাও বড় হয়ে যায়।

মামা লেখাপড়ার মর্ম বুঝতেন না, তা নয়। মামার ছাত্রজীবন মোটামুটি ভাল। চাকরিতে এসে ব্যক্তিত্ব খুইয়েছেন, বিয়ে করে মনুষ্যত্ব। মাঝে মাঝে মনে এসে যায় মামিমার কাছে মামার দুর্বলতা কোথায়। বিয়ের সময় মামিমার বাপের বাড়ি থেকে কি অনেক টাকা নিয়েছিলেন? মহিলা নেজরিটি সংসারের ফেমিনিন প্রেসার এর আগেও দেখেছি। বেচারা পুরুষ মনুষ্যটা হাঁসফাঁস করে মরে। অসামঞ্জস্য, বৈষম্য ও ব্যবধানে ভরে ওঠে এই রকমের সংসার। সাহিত্যের দরবারে এই সংসার চিরদিন পুরস্কৃত। এই সংসারেই আছে জীবনের খোঁজ।

চিত্র পাল্টাতে লাগল একটু একটু করে। রজতাভ এলে এখন শুধু এলাকী সঙ্গ দেয়। এষা কাছেও যায় না। আমার সাথে মাঝে মাঝে শুধু হাসি আর দৃষ্টি বিনিময় হয় ঘরের ভিতরে চলাফেরার কালে। মাপা হাসি আর মাপা দৃষ্টি। মনে হতে পারে হয়ত তাকানো নিষিদ্ধ, হাসতেও মানা। মাঝে মাঝে শুনতে পাই, এলাকী রজতাভ'র সাথে সিনেমা দেখে এল, এলাকী রজতাভ'র সাথে ভারতভ্যারবারে গেছে, কাল ছুটির পর রজতাভ ভিক্টোরিয়ায় যাবে — এলাকীকে যেতে বলেছে, এমনি আরও কতো প্রোগ্রাম।

এমনি করেই চলল কয়দিন। প্রায় দু'বছর। আস্তে আস্তে এলাকীর জিনও শেষ হয়ে এল। রজতাভকে নিয়ে বাড়িতে আর সে উচ্ছ্বাস নেই। মামিমার মুখে 'রজতাভ' নাম আর শোনা যায় না। এষা, এলাকী দু'জনই রজতাভ'র কাছে ফেল করল বলে মনে হল। মামিমা-ই বা নয় কেন। মামা এসবের মধ্যে ছিলেন না, যতই হোক ওপরওয়ালার ছেলে তো।

দুই ফ্যামিলির উক্ত সম্বন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। মামা আর তাঁর ওপরওয়ালা তাঁদের নিজেদের অবস্থানে ঠিক থাকলেন। রজতাভকে দোষারোপ করা বা তার নিন্দা-সমালোচনা করা কোনটাই হতে দেখিনি। কেন যে রজতাভ সম্বন্ধে মা ও দুই মেয়ে এত নীরব হয়ে গেলেন তা জানতে পারিনি।

মৈনাক আমার বাড়িতে এসে গোরার গল্প, পীসামাসির গল্প বলেছিল। তারপর ওর বাবা মারা যাওয়ার খবর পেয়েছিলাম। মৈনাক, অংশুমান, সৌরভ ও অর্ণব ভিক্টোরিয়াতে আড্ডায় বসেছিল তাও শুনেছি। এই আড্ডায় যাওয়ার জন্য আমাকে ওরা খবর দিতে পারেনি। আসলে এই আড্ডাটার উদ্যোগ নিয়েছিল অংশুমান। অংশুমান কিছুকাল কলকাতার বাইরে ছিল বলে পুরনো বন্ধুদের সবাইকে একসাথে স্মরণ করতে পারেনি।

মৈনাকের খোঁজখবর নেওয়া দরকার মনে করে একটা রবিবার মৈনাকের বাড়ি গেলাম। মাসিমা দরজা খুলে সস্নেহে ভিতরে বসালেন। মৈনাকও এসে বসল। জিজ্ঞাসা করলাম ঈশানী কোথায়। নিরুত্তাপভাবে মাসিমা বললেন, ভেতরে আছে, বাবা। সাধারণ কুশল বিনিময়ের পর মাসিমা উঠে গেলেন। মৈনাক বলল, একটা ভাল খবর আছে।

আমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বনবিভাগে যোগ দিয়েছি। চাইবাসায় আমার পোস্টিং। চাইবাসায় এক মাস কাজ করাও হয়ে গেছে। সপ্তাহশেষে চলে আসব ঠিক করেছি। এখন সপ্তাহের সবদিন অফিস করার দরকার নেই। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বলে কাজের সময় দশটা-পাঁচটা সীমানার বাইরে কাজ করতেই হয়, তাই সব কাজের দিনগুলো কাজের দিন না মানলেও চলে।

একটু দ্বিধা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ঈশানী কেমন আছে?

জানিস তো আমার বোনের শারীরিক কোন রোগ নেই, মানসিক রোগে ভুগছে। এক এক সময় এমনভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে যে আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। মায়ের কাছে আগের থেকে অনেক বেশি আদুরি হয়ে উঠছে। বয়সোচিত নয়। কথা বলা অনেক কমে গিয়েছে। আমার ঘরে মাঝে মাঝে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার নজর পড়লে, কোন কথা যদি বলি তো পালিয়ে যায়। কোন কথা না বললে, একটু সময় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এক-দু'দিন জোর করে আমার কাছে বসিয়েছি। জোর করে কাছে বসিয়ে কথা বললে ঈশানী কিছু কিছু কথা বলে। একদিন আমার কাছে বসে বলল, মাঝে মাঝে তোমার ঘরে আসি, তোমার কাছে বসি একথা কেউ যেন জানতে না পারে, মাকেও বলবে না। আর একদিন বলল, তুমি যে চাইবাসায় একা থাক, তোমার ভয় করে না?

আমি বললাম, তুই আমার কাছে থাকবি চল। তাতে রাজি হ'ল না। বলল, বাব্বা! মাকে ছেড়ে!

মৈনাক আরও বলে চলল, দু'জন মনোবিজ্ঞানীকে তো দেখালাম। একজন মানসিক-রোগবিশেষজ্ঞও দেখেছেন। তাঁরা ওকে নানাভাবে কথা বলিয়েছেন, কিন্তু রোগের কারণ ধরতে পারছেন না। রোগটা কি তাও বলতে পারছেন না। তাঁরা যা যা পরামর্শ দিয়েছেন সবই তো পালন করলাম। কোন ফল হয়নি। তাঁরা ওর জীবনের ছোট-বড় সব ঘটনাই জানতে চেয়েছেন। আমি আর মা একসাথে বসে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমরা কোন্ কোন্ সময়ে কোথায় কোথায় বাস করেছি, তাও বলেছি। বাবার মৃত্যু, হাঁ সে-কথাও উঠেছিল।

ডাক্তারবাবুরা আরও জানতে চেয়েছিলেন, ওর এই রোগটা কখন শুরু হয়েছিল। আমরা কখন প্রথম বুঝতে পারলাম। কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝেছিলাম কি না। আমরা এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। তবে ডাক্তারের কাছ থেকে প্রশ্নগুলো শোনার পর থেকে মা ও আমি খুবই চিন্তা করে চলেছি আমাদের কিছু মনে পড়ে কি না। একই ঘরে বাস করে ঘরের লোকেদের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তনের দিনক্ষণ মনে করা সম্ভব হয় না। রোজ রোজ একসাথে একই বাড়িতে বাস করা মানুষের একটু একটু পরিবর্তন চোখে পড়ার কথা নয়। একটু একটু করে পরিবর্তনটা বড় হলে চোখে পড়ে। বাইরের লোকের চোখে এ ধরনের পরিবর্তন বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে মনে থাকতেও পারে। একদিন আমি ঈশানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না?

একদম না। ছেলেদের দেখলে আমার ভয় করে। বাড়িতে কোন ছেলে এলে আমি কাছে আসি না। ছেলেদের কাছে আমার বসতে ভাল লাগে না। বাবাকে আমার ভয় করত না, বাবার পাশে বসতেও না।

দুঃখ-কষ্টের এইসব কথা শুনতে শুনতে মনটা ভারী হয়ে উঠছিল। মৈনাককে বললাম, আমার মনে হচ্ছে গোয়া বেড়িয়ে আসার পর থেকে ঈশানীর পরিবর্তন চোখে পড়ছে।

মৈনাক বলল, তুই এসেছিস ভাল হয়েছে। আমি আজ তোর বাড়ি যাব ভাবছিলাম। ক'দিন ধরে মা বলছেন তোকে সঙ্গে নিয়ে একবার বহরমপুর যেতে। গোয়া বেড়িয়ে ফেরার পর থেকে দীপামাসিদের কোন খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। শৌভিক তো এখন আর কলকাতায় থাকে না, পরীক্ষা দিয়ে চলে গেছে বহরমপুরে। তার ঠিক পরেপরেই গোয়ায় দেখা হয়েছিল।

তুই কি কাল চাইবাসায় ফিরে যাচ্ছিস না?

তুই যদি আমার সাথে বহরমপুর যেতে রাজি থাকিস তাহলে আমি চাইবাসা ফিরছি না।

এমন সময় মৈনাকের বাড়িতে অর্ণব এসে হাজির।

মৈনাক বলল, বহরমপুর যাওয়ার উদ্দেশ্য তোকে খুলে বলি। মা বলছেন, শৌভিকের সাথে যদি ঈশানীর বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়। শেষবারে ডাক্তার বলেছেন ওর বিয়ে দিয়ে দিলে সংসার করতে করতে ও বোধহয় ভাল হয়ে যাবে। ঐ মেয়ের তো সাধারণ পদ্ধতিতে বিয়ে হওয়া মুশকিল। জানাশোনা ঘর যদি রাজি হয় তাহলে সম্ভব। চিকিৎসা তো চলছে, তার সাথে ডাক্তারের পরামর্শ মতটা মানা যায়।

অর্ণব শেষের কথাগুলি শুনে হঠাৎ বলে বসল, আমিও তোদের সাথে বহরমপুর যাব।

মৈনাক খুশিই হল। উৎসাহ নিয়ে ওর সমস্যাটা সংক্ষেপে অর্ণবকে বলল। ঠিক হল বুধবার বহরমপুর যাওয়া হবে।

একদিন কলেজ চত্বরে হঠাৎ কমলিকার সাথে রজতাভর দেখা হয়ে গেল। কমলিকা অবাক। রজতাভ বলল, আপনাদের কলেজ কিছু ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি কিনবে। আমার কোম্পানি অর্ডার পেয়েছে। তাই অফিসে কথা বলতে এসেছিলাম। আরও এক-দু'দিন আসতে হবে। যন্ত্রপাতি সরবরাহের সময় আর ফিটিং করার সময়।

কমলিকার প্রয়োজন থাক বা না থাক রজতাভ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কর্মসূচি বলে গেল। কমলিকার মাথায় হঠাৎ একটা মতলব এল। ভাবল, রজতাভর যদি সময় থাকে তাহলে কোথাও একটু বসে নিলে হয়। কমলিকার বিদেশ পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিনের। পাসপোর্ট ভিসার জন্য রজতাভ কাজে লাগতে পারে ভেবে প্রস্তাব দিল, আপনার কি সময় আছে? কোথাও একটু বসবেন। রজতাভ সম্মতি জানাল। রজতাভ ও কমলিকা সামনের পার্কে গিয়ে বসল।

কমলিকা বলল, আপনার সাথে কোন পত্রিকার লোকের পরিচয় আছে। আমার লেখা ছাপিয়ে দিতে পারবেন?

কোন বিষয়ের ওপর লেখা, সেটা আগে বলুন।

সুবিধাবাদের রাজনীতি কলম মূল্যবোধের রাজনীতি, কমলিকা বলল।

আঁতকে উঠল রজতাভ। বলল, কোন ভাল পত্রিকা এসব জিনিস ছাপে না। পুলিসের সাথে পত্রিকার যোগ তো আছেই। আমি বাবাকে বলতে পারি। তবে আমি নিশ্চিত যে বাবা বিষয়টি শুনলেই মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

কমলিকা দেখল ব্যাপারটা জমল না। এরপর কমলিকা অন্য প্রসঙ্গ আনল। আপনি কি সিনেমা, থিয়েটার গানের প্রোগ্রামে যান?

রজতাভ বলল, গান আমি ভীষণ ভালবাসি। গানের প্রোগ্রামে একা যাই আর সঙ্গী পেলে অবশ্যই সিনেমা যাই। বাবা তো গান, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির কত কার্ড পান। সবই তো নষ্ট হয়ে যায়।

কমলিকা বলল, আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাবেন?

একটু থেমে রজতাভ বলল, সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব। এমনি করে এদিনের সাক্ষাৎটা শেষ হল।

কমলিকার এখন সর্বসময়ের চিন্তা — কবে, কখন মামাবাড়ি থেকে ছাড় পাবে। কমলিকার এটা স্থির-নিশ্চয় হয়েছে যে গ্র্যাজুয়েশনের পর মামিমাও ওকে রাখতে চাইবে না আর সে নিজেও মামাবাড়িতে কিছুতেই আর থাকবে না। মামাকে পুলিশ অফিসার হিসাবে দেখার শখ তার মিটে গেছে।

দ্বিতীয় দিন সাক্ষাতের স্থান ও সময় ঠিক করাই ছিল। দেখা হল দু'জনের। সঙ্কোচ নেই কারুরই, দুই বাড়ি পরিচিত। একে অন্যের কাছাকাছি হওয়ার এই তো পরিবেশ। এই পরিবেশের সদ্ব্যবহার করে কমলিকার মনের আনাচে কানাচে প্রেম দেখা দিল। মামাবাড়ি থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুলতায় ওর মন অজান্তে নির্ভর করার একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমনি করে সিনেমা, পার্ক, রেস্টুরেন্ট আর মাঠে-ময়দানে দু'জনেই দু'জনকে মেলে ধরল। কমলিকা ভাবল, অংশুমানের সাথে ওর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বন্ধুত্বের গণ্ডি পার হয়ে ওদের সম্বন্ধ প্রেম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি আর রজতাভর সাথে প্রথম পর্যায়েই এল প্রেম।

অংশুমানের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। পরীক্ষা খুব সামনে, সুতরাং সে আর বেশি সময় দিতে পারে না।

একদিন রজতাভ কমলিকাকে প্রস্তাব দিল একটা রিসোর্টে গিয়ে দু'জনে রাত কাটাবে। একটু ইতস্তত করে কমলিকা রাজি হল। কয়েকটা শর্ত দিল। রজতাভ মেনে নিল। এমনি করে মাঝে মাঝে আরও কয়েকদিন কমলিকা আর রজতাভ রিসোর্টে রাত কাটাল। দু'জনে দু'জনকে নানাভাবে

জানল। একদিন রজতাভ জানাল যে সে যদি কমলিকাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তার মায়ের সম্মতি আছে, কিন্তু বাবার মতামত নেওয়া হয়নি।

কমলিকা বলল, এখনই এরকম কোন মতামত নেওয়ার দরকার নেই, কারণ তার ফাইনাল পরীক্ষা হতে তখনও প্রায় এক বছর বাকি। রজতাভর অপেক্ষা করতে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে নিশ্চিত হতে চাইছিল। কমলিকাকে মনস্থির করতে সময় তো দিতেই হবে।

একদিন রজতাভ আর কমলিকা একটা পার্কে বসে নানারকম এলোমেলো কথাবার্তায় সময় কাটাচ্ছে। রজতাভ বলল, তোমাকে একটা খবর দিই।

কমলিকা উৎসুক হয়ে মুখের দিকে তাকাল। রজতাভ কমলিকার কোলের কাছে মাথা নিয়ে গিয়ে আড়ভাবে শুয়ে বলল, আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি।

কমলিকা সামনের দিকে ঝুঁকে কোমল স্পর্শ দিয়ে প্রবনে কপালে একটি ছোট্ট চুম্বন দিল, তারপর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট এনে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, কবে যাচ্ছ?

আগামী সেপ্টেম্বরে যাচ্ছি। আমার কোম্পানি আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ঘরোয়া ইলেকট্রনিক জিনিসের প্রসার ঘটাতে আমাকে প্রথমে ট্রেনিং-এ পাঠাচ্ছে। আমরা মোট পাঁচজন যাচ্ছি। তিন মাস ট্রেনিং হবে। আমেরিকার কোম্পানির ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তৈরির মডেল আমাদের দেখাবে। ট্রেনিং-এর পর আমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তারপর কি হবে জানি না। হয়তো পরে আমেরিকায় থাকতে হবে।

কমলিকা তার নিজের অবস্থানের কথা ভেবে নিল। পরীক্ষা পর্যন্ত তো তার কোথাও যাওয়া চলবে না। সে কিছুতেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে পারবে না। কমলিকা আরও ভাবল, রজতাভ যে তাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে এমন কোন কথাও তো বলেনি। ভাববার সময় তো আছে। একেবারে অঙ্কের হিসাবের মতো খুটিনাটি সব দিক ভেবে নিল মনে মনে। সেপ্টেম্বরও দেরি আছে। প্রায় ছ'মাস।

রজতাভ দেখল, কমলিকা নির্বিকার। রজতাভ মনে মনে একটু দমে গেল। রজতাভ হয়ত ভেবেছিল, ওর আমেরিকা যাওয়ার কথা শুনে কমলিকা আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু তা হল না।

ছেলেবেলা দেখলে ঈশানীর ভয় করে এটা একটা নতুন ইঙ্গিত। ডাক্তারকে বলতে হবে। আগেই ঠিক ছিল সোমবার তিনজন ডাক্তার একসঙ্গে বসে ইলেকট্রিক শক দিয়ে ঈশানীকে কথা বলাবে যদি মনের গভীর গহনে লুকিয়ে থাকা কথা ইলেকট্রিক্যাল্ড নার্ভের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ইলেকট্রিক শক খেয়ে ঈশানী বলছে ছেলেবেলা দেখলে আমার ভীষণ ভয় হয়। সেদিন তো দরজার ফুটো দিয়ে দেখলাম পরমার দাদা বউটার ওপর অত্যাচার করছিল, বউটা ছটফট করতে করতে কেমন যেন কষ্ট পাওয়ার শব্দ করছিল। তারপর স্থির হয়ে গেল। আমরা গোয়া যাচ্ছিলাম। ট্রেনে রাতে আমার ঘুম আসছিল না। দেখলাম ওপরের বার্থ থেকে ছেলেটা নেমে এল। নীচের বার্থে ওর বউটা ছিল। পর্দা টানা ছিল। আমি উল্টোদিকে নীচের বার্থে ছিলাম। দেখলাম দু'জোড়া পা ওপর-নীচ হয়ে খুব নড়ছে। উঠে বসলাম। পর্দার দু'দিকে ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। সবাই ঘুমোচ্ছে। পরমার দাদার বউটা যেমন শব্দ করছিল, এখানেও সেই এক শব্দ! তারপর দেখলাম বউটার বাঁ-হাতের খানিকটা অংশ পর্দার বাইরে বেরিয়ে স্থির হয়ে গেল। শীতাতপ কামরায় আমার খুব ঘাম গিতে লাগল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি! সকালে উঠে দেখলাম হাতের ঐ অংশটুকু একইভাবে পর্দার বাইরে বেরিয়ে আছে। দাদা ঘুম থেকে উঠবার পর বললাম। আরও পরে জানলাম ছেলেটা পালিয়েছে, বউটা মরে গেছে।

ছেলেদের ভয় করার কারণ ডাক্তাররা খানিকটা বুঝলেন, খানিকটা অনুমান করলেন। যে দুটি ঘটনা শুনলেন সেগুলো আমরা জানি কি না জিজ্ঞাসা করলেন। মৈনাক সবিস্তারে দু'টি ঘটনাই বলল। দ্বিতীয় ঘটনায় বউটার মৃত্যু ঘটলেও প্রথমটা ছিল অতি সাধারণ পরিচিত ঘটনা। পরমার দাদার বিয়েতে ঈশানী পরমার বাড়িতে তিনদিন কাটিয়েছে। বিয়ের দিন বাসর জেগেছে। অনেক হৈ হুল্লোড় ও মজা করেছে। ফুলশয্যার রাতে বাড়ির সব মেয়েরা পালা করে দরজার ফুটো দিয়ে অনেক দৃশ্য দেখেছে। সকালে দেখা গেল ঈশানীর শরীর খারাপ। দুটি ঘটনা ঘটেছে ছ'মাসের ব্যবধানে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশানীর তখন বয়স কত? সতেরো কিংবা আঠারো। ডাক্তাররা আবারও বললেন, বিয়ে দিয়ে দিলে হয়ত ও সুস্থ হয়ে যাবে। ওর অসুস্থতা এখনও গুরুতর নয়। বিয়ের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ সম্বন্ধটা ওর কাছে বাস্তব করে তুলতে হবে। ও খুব সহজেই সেরে উঠবে। যৌনচেতনার নার্ভ সজীব হয়ে উঠলে ওর রোগ সেরে যাবে।

আগের কথা মতো আমি, মৈনাক ও অর্ণব বুধবার বন্ধুরত্নপুত্রে দীপামাসির বাড়ি হাজির হলাম। দীপামাসি ও সুরঞ্জনাদি এগিয়ে এলেন। শৌভিক জিলা পরিষদে চাকরি পেয়েছে। বাড়িতে নেই, অফিস গেছে। মেসোমশাই-এরও একই অফিস। পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে দীপামাসি খবর পাঠালেন, আমরা এসেছি। উদ্দেশ্য, অফিস থেকে যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। সুরঞ্জনাদি আমাদের দুপুরের খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সাথে মাঝে মাঝে এসে কথাও বলছেন। আমি আর অর্ণব, ঐ বাড়ির সকলের কাছে অপরিচিত। দীপামাসি সুরঞ্জনাদি আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করলেন যে আমরা অপরিচিত মনেই হল না। সুতপা কলেজটাতের ক্লাস করতে গিয়েছিল। আমাদের পৌঁছানোর দু'ঘন্টা বাদে ফিরে এল। ঈশানী সম্বন্ধে ততক্ষণে সবিস্তারে সব কথাই দীপামাসিকে বলা হয়ে গেছে। দীপামাসি আমাদের তিনজনের খোঁজখবর নিলেন। অনেক দ্বিধা, অনেক সঙ্কোচ নিয়ে যখন ঈশানীর সাথে শৌভিকের বিয়ের প্রস্তাব দিলাম তখন সুতপা ও সুরঞ্জনাদি আমাদের সামনে বসে। দীপামাসিকে আমার মায়ের অনুরোধের কথা বললাম। দীপামাসির কাছে ঈশানী সম্বন্ধে কোন কথাই গোপন করিনি।

দীপামাসি সব শুনে একটু চিন্তা করে বললেন, তোমার মেসোমশাই ও শৌভিকের মতামত তো নিতে হবে, বাবা। বাড়ির সকলের সাথে আলোচনা করে পরে জানাব।

আমি কি চাকরি করছি আর চাইবাসায় কতদিন থাকব বা কোথায় কোথায় আমার বদলি হতে পারে সেসব কথা জিজ্ঞাসা করে আর একবার

জেনে নিলেন। তিনটায় সময় দুপুরের খাওয়া খেলাম। মেসোমশাই মৌডিককে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মৌডিক এল চারটেয়। মৌডিক, সুরঞ্জনাদি আর সুতপার সাথে আমরা তিনজন অনেক গল্প করলাম। পুরনো দিনের কথাই বেশি করে এসে গেল। আমি আর অর্ণব নীরব শ্রোতা হয়েই থাকলাম। মাঝে মাঝে কুট কেটে মশলা সংযোগ করা ছাড়া আমাদের কিছু করার ছিল না।

রজতাভ আর অংশুমান কমলিকাকে নিয়ে যে যার হিসাব মতো চলছে। অংশুমানের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, সেপ্টেম্বরও এসে গেল। অংশুমান সি এ পড়বে আর রজতাভ আমেরিকা যাবে। কমলিকা যেখানে যেমনভাবে আছে এখন থাকবে সেভাবেই।

আমেরিকা যাওয়ার দিন রজতাভকে বিদায় জানাতে কমলিকা বিমানবন্দরে গিয়েছিল। রজতাভ'র বাবা-মাও এসেছিলেন। ওনারা কমলিকাকে আগে থেকেই চিনতেন। রজতাভ'র মা কমলিকাকে একই গাড়িতে ফিরতে বললেন। বাড়িতেও নিয়ে এলেন। রজতাভ'র মা কমলিকার বাবা-মার খোঁজখবর নিলেন। কমলিকার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি তাও জানতে চাইলেন। সবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রজতাভকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ?

কমলিকা বলল, মাসিমা আমার ফাইনাল পরীক্ষা হতে তো এখনও ছ'মাস বাকি।

মাসিমা বললেন, ছ'মাসের কথা নয়, কথা পছন্দের, ভালবাসার আর সিদ্ধান্তের।

কমলিকা বলল, আমি এখনো বাবা-মার সাথে কথা বলিনি।

মাসিমা সবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি অন্য কোন ছেলেকে ভালবাস?

সোজাসুজি হ্যাঁ উত্তর এল, না।

রজতাভ'র মায়ের সঙ্গে তার বাবা-মার গল্প, দেশের বাড়ির গল্প এবং স্কুলের জীবন নিয়ে অনেক কথা হল। মাসিমা তাকে বারবার বললেন, মাঝে মাঝে এসো।

দীপামাসির কাছ থেকে চিঠি এল। মৈনাকের মাকে লিখেছেন . চিঠির মর্ম এইরকম : ঈশানীকে খুব ছোটবেলা থেকে দেখছি। তার প্রতি আমার স্নেহ-মায়া-মমতা করুনার জলের মতই স্বচ্ছ ও বহমান। ডাক্তারের পরামর্শ যদি ঠিক হয় তার দুঃসময় কেটে যাবে। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ মতো কাজ করতে হলে এক্ষেত্রে কোন না কোন মানুষকে মূল্য দিতে হবে প্রচুর। কে দেবে সেই মূল্য? এই প্রশ্নটাই আমাদের সকলকে নাড়া দিয়েছে প্রচুর। অনেক বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনা করে আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম সৌডিক আর ঈশানীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন হোক। আমাদের সকলের মধ্যে থেকে ঈশানী পুরনো দিনের অনেক কিছুই ফিরে পাবে এবং সেটাও তার অতিরিক্ত পাওয়া হবে এবং এটাও ওর মনকে সবল সচেতন ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

দীপামাসি আরও লিখেছেন, আমাদের এই মতামতের সাথে একটি প্রস্তাব রাখছি আপনার সুবিবেচনার জন্য। যেমন সৌডিক ও ঈশানী ছোটবেলায় এখানে একসাথে মিলেমিশে বড় হয়েছে তেমনি সুতপা ও মৈনাক তাদের ছোটবেলা একসাথে কাটিয়েছে। মৈনাকের সাথে সুতপার বিয়ে খুব মানানসই হবে। আমার মেয়ে সুন্দরী, আচার-ব্যবহারেও ভাল, আপনি ও মৈনাক সবই জানেন, আপনাদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। আপনার মতামতের অপেক্ষায় থাকলাম।

যদি আমরা উভয় পক্ষ একমত হতে পারি তাহলে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা দেরি করব না। আমার দিক থেকে একটা অবস্তি সুরঞ্জনাকে নিয়ে। আমি সুরঞ্জনার সাথে একান্তে কথা বলেছি — ওর মনোভাব জানার জন্য। সুরঞ্জনা খুব ভাল মেয়ে, ও আমার আপনার সব ভাবনার সাথে সায় দিয়ে সুতপা ও ঈশানীর বিয়েতে রাজি হয়েছে। আপনাকে আরও একটি অনুরোধ করে রাখি, সুরঞ্জনার জন্য একটি পাত্রের খোঁজে থাকুন।

সমস্ত সমস্যার সমাধান এইভাবে হয়ে যাবে মৈনাক ভাবতেই পারেনি। মৈনাক দীপামাসির চিঠি পাওয়ার পর আমাকে আর অর্ণবকে সব কিছুই জানাল।

অর্ণব শুনে খুব আনন্দ পেয়েছিল। অর্ণব তোলন ও নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। দীপামাসির মতামত ও প্রস্তাব শুনে অর্ণব জিজ্ঞাসা করেছিল, তাহলে সুরঞ্জনাদির কি হবে! একদিন বহরমপুর গিয়ে সে সুরঞ্জনাদিকে ভোলেনি, সুরঞ্জনাদির মনের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা তার চিন্তায় স্থান পেয়েছিল বলেই তার ঐ সরল প্রশ্ন : তাহলে সুরঞ্জনাদির কি হবে?

তিন মাসের ট্রেনিং সেরে রজতাভ দেশে ফিরে এল। এই সময়ের মধ্যে কমলিকা মাত্র একবার রজতাভ'র বাড়ি গিয়ে রজতাভ'র মায়ের সাথে দেখা করেছিল। রজতাভ কমলিকার জন্য বিদেশ থেকে পারফিউম, পোশাক, ইলেকট্রনিক খেলার জিনিস এনেছিল। বাবা-মার জন্য শাল, পোশাক, পেন ও ঘড়ি। রজতাভ ফেরার পর কমলিকার সাথে কথা হয়েছিল অল্প সময়ের জন্য। কলেজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ও নষ্ট করতে চায়নি। অপরপক্ষ ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ফর্ম ও টাকা জমা দেওয়া, লাইব্রেরির ছাড়পত্র নেওয়া ইত্যাদি আরও অনেক ছোট ছোট কাজে কমলিকা কয়েকদিন ব্যস্ত থাকল। একটু সামলে নিয়ে একদিন রজতাভ ও কমলিকা রিসোর্টে দু'দিন থাকবে ঠিক করল। রিসোর্টে বসে কমলিকা আমেরিকার অনেক গল্প শুনল। আমাদের দেশি খাবার পালং শাক, মটরশুটি, বিন্ডা, পটল, পারসে মাছ, পাবদা মাছ — সবই ওখানে পাওয়া যায় শুনে অবাক হল। ওখানে অনেক ভারতীয় আছে, ভারতীয়দের জন্য আলাদা দোকান বাজার আছে শুনে কমলিকা খুব চমৎকৃত হল। আমেরিকায় গিয়ে বাস করার ইচ্ছা ওর মধ্যে ক্রমেই প্রবল হতে থাকল। কমলিকা জানতে চাইল ও আমেরিকায় গেলে চাকরি পাওয়া কতটা সহজ বা কঠিন হবে এবং উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ কতটা পাওয়া যাবে। রজতাভ এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে পারল না।

কমলিকা প্রথমদিন রিসোর্টে আসার সময় শর্ত দিয়েছিল। রজতাভ তা মেনে নিয়েছিল, লঙ্ঘন করেনি। আজ কমলিকা নিজেই নিজের দেওয়া শর্ত ভেঙে ফেলল। আশা-ভরসার দোলায় দোদুল্যমান কমলিকা সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহের মিলনোৎসবে মেতে উঠল। অজানা আতঙ্কে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। কে কাকে বাঁচাবে কে কাকে ভরসা দেবে। দৈহিক মিলনের পর কমলিকা একেবারে বদলে গেল। তার স্নেহে, তার শর্ত এখন পরস্পরের সমর্পণ।

মৈনাক আর মৈনাকের মা বহরমপুর গেলেন দীপামাসির বাড়ি। বিয়ের দিন স্থির করতে হবে। দুটো ভিন্ন দিনে দুটো বিয়ে স্থির হল। সুতপার কিন্তু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় বিয়ের দিন প্রায় সাত মাস পিছিয়ে গেল।

বাবা-মাকে সব কিছু জানানোর ব্যাপারটা কমলিকা আর স্থগিত রাখতে পারল না। ঠিক করল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই বাবা-মাকে সব কিছু জানাবে। তার আগে রজতাভ'র সাথে শেষ কথা বলে নেওয়া দরকার। রজতাভ'র সাথে কমলিকার প্রেমময় সম্পর্কের কথা অংশুমান কিছুই জানত না। অংশুমান ইদানীংকালে অর গ্রাজুয়েশনের পর কেরিয়ার নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকছিল। কেরিয়ার ও রোমান্স দুটোই একসাথে সমান দক্ষতার সাথে চালাতে পারছিল না বলে অংশুমান কমলিকার ক্ষেত্রটিই অনাবাদী রেখে চলছিল। তাই অতি সহজেই হাতবদল হল ক্ষেত্রটির।

কমলিকা ও রজতাভ একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বসল। ঠিক হল, ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার আগে কমলিকা সময় করে নিয়ে শিলোয় গিয়ে বাবা-মাকে সব কিছু জানাবে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর রজতাভ ও কমলিকা আমেরিকা যাবে। রজতাভ'র কোম্পানি আপাতত দু'বছরের জন্য রজতাভকে আমেরিকা পাঠাবে ঠিক হওয়ায় রজতাভ'র পক্ষে কমলিকাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। কমলিকা আমেরিকা গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা নেবে। কমলিকার বাবা-মা একদিন এসে রজতাভ'র বাবা-মার সাথে দেখা করে উভয় পক্ষের সৌজন্য বিনিময় করবেন। কমলিকার পরীক্ষা শেষ হতে আর তিন চার মাস বাকি।

এই সময়ের মধ্যে কমলিকা ও রজতাভ মাঝে মাঝে দেখা করেছে। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার।

সময় দ্রুত পার হয়ে গেল। রজতাভ'র বাবা পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করলেন। রজতাভ কোম্পানিকে বলে আমেরিকায় ফ্যামিলি নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করল।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু'দিন পরে রজতাভ ও কমলিকা আমেরিকা চলে গেল। নিউ জার্সিতে এখন থাকবে।

একদিন অংশুমান আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছে। ঘরে একা। এলোমেলো অনেক ভাবনা এসে ভিড় করছে। রাশি রাশি সময়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল মনের ওপর দিয়ে। কী পেয়েছি আর কী পাইনি, কী-ই বা জীবনে ধরা দিল না কোনদিন — এইসব হিসাব চলছে মনের মধ্যে। শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নজরে পড়ল মৃদুমন্দ বাতাসের চুম্বনে গাছগুলির প্রাণে এসেছে আনন্দের হিল্লোল। হঠাৎ বদলে গেল দৃশ্য, ঝড় উঠেছে, নিমেষেই ঝাঁপিয়ে পড়ল গাছগুলির ওপর, ঝড়ের প্রচণ্ড প্রহারে গাছগুলি জর্জরিত। অঝোরে বৃষ্টি নামল। প্রহারে জর্জরিত গাছগুলি ধীরে ধীরে আবার শান্ত হয়ে এল। বাইরের দরজায় কে কেন টোকা মারল। অংশুমান দরজা খুলে দেখল, মৈনাক এসেছে। হাতে তিনটি চিঠি। দুটি বিয়ের চিঠি আর তৃতীয়টি ঘামে আঁটা এসেছে আমেরিকা থেকে। মৈনাকের বিয়ে, শৌভিকের বিয়ে। কথা হল। বিয়ের ঠিক হল কিভাবে অংশুমান জানল। এবার আস্তে আস্তে তৃতীয় চিঠিটি খুলল। কে লিখেছে দেখতে গিয়ে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে চিঠিটি পড়ল।

নিউ জার্সি,
আমেরিকা
১৮-৯-৯২

প্রিয় অংশু,

তুমি হয়ত এতদিনে জেনে গেছ আমি আমেরিকায় আছি। আমেরিকার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে তোমাকে জানাইনি সেটা আমার অপরাধ। বলতে পার কোন্ মুখে তোমার কাছে গিয়ে বলব যে আমি আমেরিকায় চললাম রজতাভ'র সঙ্গে। আমি তো ঘোর স্বার্থপরের মতো এই পথ বেছে নিয়েছি। ভাল-মন্দ যাই করে থাকি না কেন সবটাই আমার নিজের। আমরা মেয়েরা যখন কঠোর, নির্দয়, নিষ্ঠুর হই জেনেই হই, আমরা যখন স্বার্থপর হই, হিসেব কষে স্বার্থপর হই, জেনেই হই। তোমাদের মতো আমরা কোথাও বিবেকের দোহাই দিয়ে, কোথাও মানবিকতার দোহাই দিয়ে, কোথাও উদারতার দোহাই দিয়ে আবার কোথাও বা বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে নিজের সাথে বঞ্চনা করি না। আমাদের নামে সাধারণভাবে যে ছলনার অভিযোগ তোলা হয়, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আমরা তোমাদের সাথে ছলনা করি, জেনেই করি। আমরা আমাদের নিজের কাছে কোন ছলনার আশ্রয় নিই না। আমরা যা নয় তাই দিয়ে নিজের কাছে নিজেকে সাজাই না। আমি বলতে চাইছি যে কোন কিছুর দোহাই দিয়ে আমি আমার কাজকে পুরোপুরি সমর্থন করে তোমাকে লিখছি না। মামাবাড়িতে আমার অবস্থা যে কী ভীষণ দুর্বিষহ হয়েছিল তা আমি কোনদিন কাউকে পুরোপুরি বোঝাতে পারব না। আমি যে ওখানে পড়তে গিয়েছিলাম একথাটা প্রাধান্য দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে মাথায় রাখতে হবে। আমি আমেরিকায় এসে পড়বার লোভ সামলে দিতে পারিনি। আমি সব ছেড়েছুড়ে শিলোয় গিয়ে বসে থাকার জন্য কলকাতায় আসার মতলব করিনি। আমার অস্তিত্বের ব্যালেন্সশীটের ডানায় কি এত সহজে খালি করা যায়। জীবনের সব সম্ভাবের পরিসমাপ্তি কি ওভাবে ঘটানো যায়। এই মুহূর্তে আরও অনেক কথা মনে আসছে, সব কি লেখা যায়!

তুমি জীবনে উন্নতি কর এই আমার কামনা। তোমার সাড়া পেলে পরে আরও বড় চিঠি দেব। আমেরিকায় চলে এস। বেশ ভাল লাগবে। আমরা ভাল আছি, গুরুজনদের আমার প্রণাম জানিও। তোমার জন্য রইল আমার অফুরন্ত শুভেচ্ছা। আমাদের সম্পর্ক প্রীতিময় থাকুক।

ইতি,
তোমার কমলিকা।

শৌভিক আর মৈনাকের বিয়েতে দু'পক্ষ থেকেই অর্ণব নিমন্ত্রিত। দুই দিকেই বিয়ে ও বউভাত খেল। সুরঞ্জনাদির সাথে অনেক কথা বলল। দীপামাসি ও সুরঞ্জনাদিকে এক জায়গায় এনে অর্ণব বলল, মাদিমা আমার মায়ের সাথে কথা হয়েছে, আমি সুরঞ্জনাদিকে বিয়ে করব। দু'জনে তো অবাক। অর্ণব বলল, আমি জানতাম না, মায়ের কাছে শুনলাম আমার মায়ের বিয়ের সময় ঠিক এইরকমই হয়েছিল। আমার মা এখন বিধবা। উনি সুরঞ্জনাকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। আপনারা ব্যবস্থা করুন। □

With
Best
Compliments
From :

The Shipping Corporation Co-operative Credit Society Ltd.

13, STRAND ROAD
CALCUTTA - 700 001

With
Best
Compliments
From :

DAIGHATA THANA AGRIL. PRY. MARKETING CO-OP. SOCIETY LTD.

CHANDPARA, NORTH 24 PARGANAS
W.B. PIN - 743 262

পুরীতে
(স্বর্গদ্বারের কাছে)
ও
গ্যাংটকে
(ডিজেল পাওয়ার হাউসের পিছনে)

সমিতির হলিডে হোম্

বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কো-অপ. ক্রেডিট সোসাইটি লি.
দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং, ক্যালকাটা - ৭০০ ০৭৩
ফোন নং : ২৪১-৪৬৪২

পূজা অবসর বিনোদনের জন্য চলে আসুন —

দার্জিলিং

মনোরম পরিবেশে চার শয্যাবিশিষ্ট 'হলিডে হোম'
দুটি ঘর — দুয়ার সম্পূর্ণ ও সুসজ্জিত।

জলপাইগুড়ি পিপল্‌স্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.
স্থাপিত : ১৯১৩
হেড অফিস - জলপাইগুড়ি
শাখা : ময়নাগুড়ি, বানারহাট, নাগরকাটা, কুমারগ্রাম ও মেটেলি

বামাপদ গুহ
সম্পাদক

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু
সভাপতি

শারদীয়া শুভেচ্ছায় —

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

২৩, ব্রাবোর্ন রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

দীপককুমার সেন
সভাপতি

সুব্রত সরকার
সহ-সভাপতি

পিনাকপাণি দত্ত
সম্পাদক

মনোরঞ্জন সাধুখাঁ
অধিকর্তা

উত্তম চক্রবর্তী
অধিকর্তা

সমবায় আন্দোলনকে সঞ্জীব রাখতে

ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

৪৫, গনেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু, কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

ফোন : ২৩৭ ১২১২-১৫ :: এক্স : ২১৭

পরিচালিত

হলিডে হোমে সুলভ মূল্যে মনোরম পরিবেশে চলুন বেড়িয়ে আসি —

দিঘা ✹ পুরী ✹ রাজগীর ✹ দার্জিলিং ✹ গ্যাংটক

যোগাযোগের সময়

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার

বেলা ১১.০০ হইতে ২.০০টা পর্যন্ত

এগরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লি.

এগরা, মেদিনীপুর

দূরভাষ : (০৩২২০) ৪৪৩৫০

রেজি নং - ৬৬ মিড্

সদস্য সংখ্যা	*৫২০১ জন*
সংগৃহীত শেয়ার মূলধন	*৩৭ লক্ষ টাকা*
আমানতের পরিমাণ :	*১৪ কোটি টাকার অধিক*
কর্মচারী সংখ্যা	*২৭ জন*

একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি হয়ে আমরা কেবলমাত্র সদস্যদের ঋণ দাদন করি না। আমরা আমাদের "EARN AND SAVE POLICY"-র মাধ্যমে এলাকাবাসীর সকলকে সঞ্চয়ের অভ্যাসে ব্রতী করাই।

। সকলের সহযোগিতাই আমাদের পাথেয় ।

শ্রী কানাইলাল মাইতি	শ্রী তপনকান্তি কর	শ্রী দিলীপকুমার সাউ
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কাঁথি + মেদিনীপুর + ফোন ঃ ৫৫-০২৩

আমানত ও বিনিয়োগের মাপকাঠিতে পূর্ব ভারতে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শীর্ষে

* সমগ্র মেদিনীপুর জেলা সহ কলিকাতা মহানগরী এই ব্যাঙ্কের এলাকাধীন।
* গ্রাহক পরিষেবায় ও আমানত সুরক্ষায় আমরা অতন্দ্র প্রহরী।
* সর্বোচ্চ হারে সুদ সহ রয়েছে আকর্ষণীয় আমানত প্রকল্প।
* আমানত বিমা দ্বারা সুরক্ষিত — এগরা ও নন্দকুমার শাখায় রয়েছে নিত্য সঞ্চয় প্রকল্প।
* পুরীতে ব্যাঙ্কের 'হলিডে হোম'।
* কম্পিউটার পরিষেবায় অগ্রণী সমবায় ব্যাঙ্ক।

কাঁথি ✦ রামনগর ✦ এগরা ✦ হেঁড়িয়া ✦ মঙ্গলামাড়ো ✦ বেলদা ✦ দুর্গাচক ✦ পাঁশকুড়া ✦ মহিষাদল ✦ নন্দকুমার ✦ বাড়বরিষা ✦ নন্দীগ্রাম ✦ বড়বাজার (কলিকাতা)

১৩৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০০৭

সব শাখায় লকার পাওয়া যায়

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় কর *সভাপতি*

সোহনজ্যোতি মাইতি *সহ-সভাপতি*

হৃদয়াংশুশেখর সুর *সম্পাদক*

বর্ধমান শহরে মহিলাদের স্বনির্ভর করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ঃ—

বর্ধমান মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৩৩ নং পার্কাস রোড, বর্ধমান - ১ . ফোন ঃ ৬৪৮৪৯
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ বর্ধমান, গুসকরা, গলসি, পানাগড়

রেজি নং - ১/৯৪ তারিখ - ১০/৩/৯৪

মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য অল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে সহজ কিস্তিতে ঋণ দানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য জাতীয় ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদে বিভিন্ন ধরনের আমানত প্রকল্প চালু আছে।

আমানত প্রকল্পগুলিকে মজবুত করতে সকলের সহযোগিতা কাম্য। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত পদাধিকারীদের সহিত যোগাযোগ করুন।

শ্রীমতী বকুল মুখার্জি
চেয়ারপার্সন
ফোন নং - ৬৭৯৭৬

শ্রীমতী আশা বড়ুয়া
সেক্রেটারি

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রায়
ম্যানেজার
ফোন নং - ৫৬৪৩৯

বিঃ দ্রঃ - অল্প সুদে মেয়াদি ভিত্তিতে ঋণের মাধ্যমে বহু দুঃস্থ বেকার মহিলা উপকৃত

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM

THE STEWARTS LLOYDS INDIAN TUBE EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED

41, CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA - 700 071

প্রবন্ধ

মানবাধিকার

অসীম রায়

জন্মের সাথে সাথে কান্নার মাধ্যমে শিশু তার সবকিছু পাওয়ার মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সামাজিক প্রয়োজনে তার সেই অধিকারের পরিধি পরিশীলিত ও সঙ্কুচিত হতে থাকে। সাধারণভাবে জন্মসূত্রে পাওয়া মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে জীবনধারণ, গঠন ও পালনের সর্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য (inalienable), ও অবিভাজ্য (indivisible) অধিকারগুলিকেই বলে মানবাধিকার। সর্বজনীন এই অর্থে যে এই অধিকার সবার মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে সবার জন্যেই সমভাবে রয়েছে। এই অধিকার অবিচ্ছেদ্য কারণ তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যাবে না বা একজন অপরকে স্বেচ্ছায় অর্পণও করতে পারবে না। আবার এ অধিকারকে কোনরূপ বিভাজনও করা যাবে না। নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সব অধিকারই সমভাবে সবার প্রয়োজন। এক অধিকার থেকে অপর অধিকারকে ভাগ করা যাবে না। এক অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্যে অপর অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করাও যাবে না। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

একের অধিকার সম্পর্কে অপরের শ্রদ্ধা থাকা দরকার। অপরের অধিকার লঙ্ঘনের অর্থই হল পরোক্ষে ও পরিণামে নিজেকেও অধিকারের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা। মানুষের সহজাত অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অসম্মান থেকেই পৃথিবীতে জন্ম নেয় বিবেক-বিরোধী হিংস্র ও বর্বরোচিত কাজকর্ম। প্রতিকারের সর্বশেষ পথ হিসাবে মানুষ যাতে পরিশেষে বিদ্রোহের পথে না যায় তার জন্যেই বিভিন্ন পর্যায়ে এই অধিকার সুরক্ষায় আইনগত বাধ্যবাধকতা কায়েম করতে হয়। ব্যক্তি-ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথেচ্ছাচারের পাশাপাশি নানারূপ সামাজিক প্রথা-প্রকরণ ও কুসংস্কারজনিত অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও এই আইন রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে মানব অধিকারকে সার্বিকভাবে সুরক্ষিত রাখবে। তাই আইন রচনার ভিত্তি হবে অধিকার বোধের পরিধি। আইন আগে নয়-অধিকারই আগে। অধিকার সম্মত আইন চাই। আইন কখনই অধিকারের রক্ষক হতে পারে না; রক্ষকের ভূমিকাই তাকে পালন করতে হয়। মানবাধিকার ব্যক্তি-মানুষের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। সংখ্যাগরিষ্ঠের হিতের দোহাই দিয়ে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে খর্ব করার রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই মানবাধিকার আন্দোলনের জেহাদ।

মানবাধিকার প্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। মন্টেস্কু (১৬৮৫-১৭৫৫), রুশো (১৭১২-১৭৭৮) প্রমুখ বিদেশি মনীষীদের চিন্তা ভাবনার পাশাপাশি ভারতীয় সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদ রাজা রামমোহনেরও (১৭৭৪-১৮৩৩) এ বিষয়ে বিশাল অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার টানাপোড়েনে সংঘটিত বিপ্লবের সাথে কিছু বিবর্তনের বন্ধুর পথও মানবাধিকারকে পরিক্রমা করতে হয়েছে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে অনেক সংঘাত-সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার (Universal Declaration of Human Rights) বহু আগে থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ১২১৫ সালে ৬৩টি প্রকরণ (ক্লজ) সম্বলিত যে সনদটিতে ইংলন্ডের তদানীন্তন রাজা জন স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক নাম হল — ম্যাগনা কার্টা। রাজক্ষমতার সঙ্কোচন ও প্রজাদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্প্রসারণের সবচেয়ে ঐতিহাসিক ইতিহাস তখন থেকেই শুরু হল বলা চলে। ১৬৮৮ সালে ইংলন্ডের সিংহাসন থেকে শান্তিপূর্ণভাবে দ্বিতীয় জেমস্-এর অপসারণের মাধ্যমে সংঘটিত গৌরবময় বিপ্লবের সাফল্য স্বৈরাচারী রাজার ওপর জনসাধারণের স্বাধীনতার ও অধিকার ভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বকেই সাব্যস্ত করেছিল। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই ইংরেজের ১৩টি উপনিবেশ সম্মিলিতভাবে জর্জ ওয়াশিংটনের (১৭৩২-১৭৯৯) নেতৃত্বে পরিচালিত আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেখানকার সমস্ত মানুষের জীবনে স্বাধীনতাকে অবিচ্ছেদ্য অধিকার হিসাবে সুরক্ষিত রাখার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই-এর আমলে ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গ পতনের ফলে সকলের জন্য ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণীই ওতপ্রোত হয়েছিল।

১৮১৫ সালের ১৮ই জুন ওয়াটারলু-র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতনের পর সম্পাদিত

ভিয়েনা চুক্তিতে দাস ব্যবসা উচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৩৩ সালের ইম্যানসিপেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন থেকে দাস ব্যবসার অবসান ঘটে। ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-১৮৬৫) এক ঘোষণার দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাস ব্যবসা তুলে দিয়েছিলেন। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এর ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো ও ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত দাস ক্যাপিটাল-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে সর্বহারার অধিকার ও সাম্যের জয়গান প্রচারিত হল। রাশিয়ার জার নিকোলাসের আমলে ১৯১৭ সালে লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যের পর ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে 'রাশিয়ান সোস্যালিস্ট ফেডারেটেড সোভিয়েট রিপাবলিক' (RSFSR)-এর জন্য যে সংবিধান রচনা করা হয়েছিল সেখানে প্রতিটি নাগরিকের জন্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছিল। ১৯২২ সালে নবাকৃতিত সোভিয়েত ইউনিয়নের (USSR) নতুন যে সংবিধান ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চালু হল তাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের স্বাধীনতাকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন (১৯৩৯-৪৫) পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদী ইতালি ও ন্যাৎসি জার্মানির অন্যায় আগ্রাসন ও অবর্ণনীয় অত্যাচার মানুষের মানবাধিকারের এতদিনের পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত ভিত্তিমূলে চরম আঘাত হেনেছিল। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস্-এ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রস্তাবিত সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সরকারিভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের (United Nations Organisation) জন্ম হয়। এই তারিখটিই সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস হিসাবে পালিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে যে তিনজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন — এ রামস্বামী মুদালিয়র, ভি টি কৃষ্ণমাচারী এবং বিজয়রাজ খাঁ নূন। জন্মলগ্ন থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবাধিকার সুরক্ষায় বিশেষ আগ্রহী। তার উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে ১৯৪৫ সালে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। মানুষের অধিকার সম্পর্কে দলিল তৈরির কাজ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে মানবাধিকার সম্পর্কিত দলিলের খসড়া জমা পড়ে। এই দলিলের খসড়া প্রস্তুতের ক্ষেত্রে রেনি কেসিন সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনে সনদটি অনুমোদিত ও ঘোষিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে প্রসারিত মানবাধিকারগুলি সংক্ষিপ্ত সনদে নিম্নলিখিত ত্রিশটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ (আর্টিকেল)- ১ : বিশ্বের প্রতিটি মানুষ জন্মস্বাধীন। সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিয়েই তারা জন্মেছে। প্রত্যেকেই যুক্তিনিষ্ঠ ও বিবেকমন্ডিত। তাই অন্যের প্রতি একের ব্যবহারের মধ্যে যেন ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশিত হয়।

অনুচ্ছেদ - ২ : কোনরূপ বৈষম্যের অবকাশ না রেখে মানবাধিকারের এই দলিলে বর্ণিত সব অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিদার প্রতিটি মানুষ। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতাদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য সামাজিক মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠাগত কোনরূপ ভেদাভেদ মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ৩ : প্রতিটি মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-নিরাপত্তার অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ - ৪ : দাসত্বের শৃঙ্খলে কাউকে বেঁধে রাখা হবে না, আর কোন ধরনের দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসা থাকবে না।

অনুচ্ছেদ - ৫ : কারও প্রতি শারীরিক অত্যাচার বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অমর্যাদাকর ব্যবহার করা হবে না বা কাউকেই অনুরূপ কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ৬ : আইনের চোখে প্রতিটি মানুষ সর্বত্র মানবিক মহিমায় স্বীকৃত থাকবে।

অনুচ্ছেদ - ৭ : আইনত সবাই সমান বলেই কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে আইন সকলকে সমানভাবে সুরক্ষা দেবে। ঘোষিত মানবাধিকার লঙ্ঘন করে কোনরূপ বিভেদমূলক আচরণ করা হলে এবং অনুরূপ আচরণের প্ররোচনা দিলে আইন সমানভাবে তার প্রতিবিধান করবে।

অনুচ্ছেদ - ৮ : দেশের সংবিধান বা আইন যে সমস্ত মৌলিক অধিকার মঞ্জুর করবে সেগুলির কোনরূপ লঙ্ঘন ঘটলে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন জাতীয় ন্যায়ালয়ের কাছ থেকে কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকের থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৯ : কোন মানুষ স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসনের শিকার হবে না।

অনুচ্ছেদ - ১০ : অধিকার ও দায়বদ্ধতা নিরূপণে এবং আনীত অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ন্যায়ালয়ের কাছে ন্যায্য ও প্রকাশ্যভাবে বক্তব্য বলার সমান সুযোগ পাবে।

অনুচ্ছেদ - ১১ : (১) দণ্ডনীয় অভিযোগ আনা হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা প্রদানের প্রেক্ষিতে প্রকাশ্য আদালত কর্তৃক আইনগতভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের নির্দোষ ভাবার সঙ্গত অধিকার থাকবে। (২) কোন কাজ করা বা না করার দ্বারা সংঘটিত শাস্তিমূলক অপরাধের দায়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যদি তা সংঘটনের সময়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়ে না থাকে। শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময়কালে যতটুকু বিধিবদ্ধ ছিল তা অপেক্ষা অধিকতর কোন শাস্তি কাউকে দেওয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ১২ : কারও ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গার্হস্থ্য জীবন বা আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ হবে না। কারও মান ও মর্যাদার ওপর কোনরূপ আক্রমণ করা চলবে না। অনুরূপ হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইন প্রত্যেককে সুরক্ষা দেবে।

অনুচ্ছেদ - ১৩ : (১) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে প্রত্যেকের যাতায়াত ও বাসস্থানের অধিকার থাকবে। (২) প্রত্যেকের নিজের দেশসহ যে কোন দেশ ত্যাগের ও নিজের দেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ - ১৪ : (১) অন্যায় নিগ্রহ বা উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য দেশের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ও আশ্রয় গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। (২) তবে প্রকৃত অরাজনৈতিক অপরাধ বা রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিবিরোধী কোন কাজের ফলস্বরূপ নির্ধারিত নির্যাতন বা নিপীড়নের ক্ষেত্রে এ অধিকারের আশ্রয় পাওয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ১৫ : (১) কোন জাতির সদস্যতা লাভের অধিকার প্রত্যেকের আছে। (২) নিজস্ব জাতীয়তা থেকে কাউকে স্বৈরাচারীভাবে বঞ্চিত করা যাবে না তেমনি আবার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চাইলে তা থেকেও কাউকে বিমুখ করা চলবে না।

অনুচ্ছেদ - ১৬ : (১) বর্ণ, কুল, জাতি বা ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর বিবাহের ও পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার আছে। বিবাহ, বিবাহোত্তর জীবনযাপন ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে সকলের সমান অধিকার আছে। (২) বিবাহে ইচ্ছুক নারী ও পুরুষের স্বাধীন ও সম্পূর্ণ সম্মতিতেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে। (৩) পরিবার হল সমাজের প্রাকৃতিক ও মৌলিক এক গোষ্ঠী। তাই প্রতিটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ১৭ : (১) একক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের আছে। (২) কাউকে স্বৈরাচারীভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ১৮ : নিজস্ব ভাবনাচিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রত্যেকের আছে। নিজের ধর্মমত বা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতাও রয়েছে। একক বা অপরের সাথে সমষ্টিগতভাবে প্রকাশ্যে বা একান্তে ধর্ম বা বিশ্বাসের শিক্ষাপ্রদান, আচার-আচরণ, পূজা-প্রার্থনা এবং ক্রিয়া-কর্ম পালন করার অধিকারও রয়েছে।

অনুচ্ছেদ - ১৯ : স্বাধীনভাবে মতামত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার প্রত্যেকের আছে। কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মতামত পোষণ এবং সীমান্তের বেড়াজাল নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যম থেকে তথ্য ও তত্ত্ব সন্ধান, গ্রহণ ও প্রদানের স্বাধীনতাও এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে।

অনুচ্ছেদ - ২০ : (১) শান্তিপূর্ণ সম্মেলন ও সঙ্ঘ গঠন এবং যোগদানের অধিকার প্রত্যেকের আছে। (২) তবে কোন সংগঠনে শামিল হতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ২১ : (১) প্রত্যক্ষভাবে অথবা স্বাধীনভাবে পছন্দমত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজের দেশের সরকারে প্রত্যেকের অংশ গ্রহণের অধিকার আছে। (২) নিজের দেশের সরকারি কৃত্যকে (পাবলিক সার্ভিস) যোগদানের সমান অধিকার সকলের আছে। (৩) জনগণের ইচ্ছাই সরকারি কর্তৃত্বের ভিত্তিভূমি। সেই ইচ্ছা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত যথার্থ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ভোটে বা একই স্বাধীন ভোট পদ্ধতি অনুসারে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ - ২২ : সমাজের সদস্য হিসাবে সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গতি ও সম্ভাবনা অনুসারে প্রতিটি মানুষ সেই সমস্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পাওয়ার দাবিদার যা তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য।

অনুচ্ছেদ - ২৩ : (১) প্রত্যেকের কাজের, স্বাধীনভাবে কাজ পছন্দের ও কাজের উপযুক্ত অনুকূল শর্তাদির এবং বেকারত্ব থেকে পরিত্রাণের অধিকার থাকবে। (২) কোন ভেদাভেদ ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্যে সমান বেতনের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। (৩) যে কাজ করবে তার নিজের ও পরিবারবর্গের মানবিক মর্যাদা বজায় রাখার মত ভরণপোষণের উপযুক্ত ও অনুকূল পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার থাকবে। প্রয়োজনবোধে এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা দিয়েও বাড়ানো যেতে পারে। (৪) নিজের স্বার্থ সুরক্ষার জন্যে প্রত্যেকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ - ২৪ : ন্যায়সঙ্গত কাজের সময় ও নির্দিষ্ট সময় অন্তে সবেতন ছুটিসহ প্রত্যেকের বিশ্রাম ও অবকাশ যাপনের অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ - ২৫ : (১) প্রতিটি মানুষ জীবনযাত্রার এমন মানের অধিকারী হবে যা তার নিজের ও পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। এর মধ্যে থাকবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা। তাছাড়া অসুস্থতা, অক্ষমতা, বেকারত্ব, বৈধব্য, বার্ধক্য বা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোন কারণে জীবিকাহীন হয়ে পড়লে তা মোকাবিলার উপযুক্ত নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারও সবার আছে। (২) মাতৃত্ব ও শিশুর বিশেষ যত্ন ও পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী। শিশুর জন্ম বিবাহের ফলে, হোক বা না হোক সব শিশু একই সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার হকদার।

অনুচ্ছেদ - ২৬ : (১) শিক্ষার অধিকার প্রত্যেকের আছে। অন্তত প্রাথমিক ও অত্যাবশ্যক মৌলিক (fundamental) স্তরে শিক্ষা হবে অবৈতনিক। তবে প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবশ্যই বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও পেশাদারি শিক্ষা সাধারণভাবে সকলেই নিতে পারবে। মেধার ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষাও সকলের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে। (২) মানবিক গুণাবলির পূর্ণ বিকাশ এবং মানব অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিভূমিকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। শিক্ষার কাজ হবে সমস্ত জাতি, বর্ণ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং বন্ধুত্বের প্রসার ঘটানো। তাছাড়া শান্তিরক্ষার রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজকর্মের ক্ষেত্রেও সহায়তা দেবে। (৩) ছেলে-মেয়েদের কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে তা পছন্দের অগ্রাধিকার মা-বাবারই থাকবে।

অনুচ্ছেদ - ২৭ : (১) সমষ্টির সাংস্কৃতিক জীবনে স্বাধীন ভাবে যোগদান, শিল্পকলার রসাস্বাদন এবং বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা ও তার সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার থাকবে। (২) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক এবং সাহিত্য ও শিল্পকর্মের স্রষ্টা প্রত্যেকেরই তার সৃষ্টির ওপর নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ বজায় রাখার অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ - ২৮ : মানবাধিকারের দলিলে ঘোষিত অধিকার ও স্বাধীনতা যাতে প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে পেতে পারে তার জন্যে সকলে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আনুকূল্য পাবে।

অনুচ্ছেদ - ২৯ : (১) যে সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব সেই সমষ্টির প্রতিটি ব্যক্তিকে তার করণীয় কর্তব্য পালন করতে হবে। (২) অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকলকে আইন নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে কাজ করতে হবে। এই সীমাবদ্ধতার কারণ হল অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি উপযুক্ত স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং গণতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ কল্যাণ সাধন, গণশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ন্যায্য নৈতিকতার চাহিদাপূরণ। (৩) কোন পরিস্থিতিতেই রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি লঙ্ঘন করে কোন স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ৩০ : মানবাধিকারের সনদে ঘোষিত কোন কিছুই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ও কর্ম সম্পাদনের সূত্রে দলিলে এতদ্দ্বারা ঘোষিত কোন অধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

মানবাধিকারের ক্ষেত্র হয়তো আরও বিস্তৃত হবে। আমরা সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে মানবিকতার ঔদার্য মিশিয়ে চরম দলিল রেখে যাব। ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার সাথে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের অনেক শ্রম ও শক্তি ব্যয় করতে হবে। সরকারি ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর দিকে সবচাইতে বেশি জোর দিতে হবে। অভিযোগ উঠলে তবেই মানবাধিকার ধারণাটি যদি আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং অন্য সময় সুপ্ত থাকে তাহলে মানবাধিকার ধারণাটিই অসামাজিক হয়ে পড়বে।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের মানবাধিকারগুলি ছিল কেবল রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার। ১৮ বছর ধরে বিতর্কের পর ১৯৬৬ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৬৩ সাল থেকে ভাবনা চিন্তা করা হলেও ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি মানবাধিকারগুলি সুরক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখার জন্য হাই কমিশনারের পদ সৃষ্টি করে। মহাসচিবের পক্ষে তিনিই এ সম্পর্কে কার্যতীয় ভাজকর্ম করেন। ভারতবর্ষে ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার আইন পাশ হয় ও ঐ বৎসরের শেষের দিকে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। এ বিষয়ে দীর্ঘদিন কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রায়ই ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে — রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের কাছে জবাবদিহিও করতে হয়েছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জে এস ভার্মা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন। ১৯৯৭ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৯৮ সালের ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি বিচারপতি ভার্মাকে মনোনীত করেন। শ্রী ভার্মার আগে ভারতের মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ছিলেন বিচারপতি এম এন ভেঙ্কটাচেলাইয়া।

পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয় ১৯৯৪ সালে। প্রথম সভাপতি ছিলেন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। বর্তমান সভাপতির নাম মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গই ভারতের প্রথম রাজ্য। যেখানে স্বত প্রণোদিতভাবে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার প্রেরণা ছিল রাজনৈতিক বন্দী-মুক্তি আন্দোলনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও অপেক্ষাকৃত কম। মানবাধিকার কমিশনের কাজ শুরুর আগে ধারণা ছিল সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের এক্তিয়ার সঙ্কুচিত হতে পারে। বর্তমানে অবশ্য তা কেটে গেছে। আদালতের ওপর চাপ এতে অনেক কমেছে।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (পার্ট) ১২ থেকে ৩৫ অনুচ্ছেদে (আর্টিকেল) মৌলিক অধিকারগুলিকে মোট সাতটি বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ থেকে ১৮ অনুচ্ছেদে সাম্যের অধিকার — ১৯ থেকে ২২এ স্বাধীনতার অধিকার —২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে শোষণ থেকে ত্রাণের অধিকার — ২৫ থেকে ২৮ এ ধর্ম স্বাধীনতার অধিকার ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদে কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার — ৩১ অনুচ্ছেদে সম্পত্তির অধিকার এবং ৩২ থেকে ৩৫ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রতিকারসমূহের অধিকার সম্পর্কে বলা আছে। তবে ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারটি ১৯৭৯ সালের ২০শে জুন থেকে বাতিল হয়েছে।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারতীয় সংবিধান সার্বিকভাবে মানবাধিকারগুলি রক্ষার জন্যই প্রসারিত করে দিয়েছে। আমাদের সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষার আনুষঙ্গিক আইনগত ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে মানবাধিকার কমিশনের আদৌ কি প্রয়োজন আছে! প্রসারিত ব্যবস্থা যখন প্রত্যাশিত প্রতিকার করতে পারে না — তখনই বিকল্পের খোঁজে যেতে হয়। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টই মৌলিক অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আজ্ঞালেখ (রিট) বা নির্দেশ জারি করতে পারে। সেদিক থেকে এই দুই আদালতই মানবাধিকার রক্ষার জাগ্রত প্রহরী। তবে এই দুই আদালতের সাহায্য গ্রহণ যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনই কষ্টসাধ্য। এই ন্যায়ালয়গুলি রাজ্য ও জাতীয় রাজধানীতে অবস্থিত বলে সাধারণ মানুষের নিকট সহজলভ্য ও সহজগম্য কোনটাই নয়। তাছাড়া কোন আদালতের নিজস্ব নিরপেক্ষ তদন্তকারী বা সত্য সন্ধানী সংস্থা না থাকায় সরকারি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু মানবাধিকারের অনেকটাই তো সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা বা ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অধিকার। তাই এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও অধিকার সুরক্ষার সুযোগও সীমিত হয়ে পড়ে। সাধারণ আদালতের মাধ্যমে আইনের আশ্রয় নিয়ে প্রতিকার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন তার খুব একটা পরিবর্তন এতদিনেও হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি লিখেছিলেন, "আইন? সে তো তামাশা মাত্র। যাঁহার পয়সা আছে তিনিই খরচ করিয়া সেই তামাশা দেখিতে পাইবেন।" তাছাড়া উচ্চ আদালতগুলি বিভিন্ন ধরনের মামলায় খুবই চাপে থাকে বলে মানবাধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত মামলাগুলি তেমন গুরুত্ব পায় না। তারপর তানানি অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় বিলম্বিত বিচার হয়ে পড়ে বিড়ম্বিত ও বঞ্চিত বিচার। এই সমস্ত অসুবিধার জন্যই মানবাধিকার কমিশন ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। পূর্ববর্ণিত ছোট ছোট অপরাধগুলি ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে সৃষ্টি হয়। অনেক বিচার বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই অপরাধগুলির অধিকাংশকে হয়তো সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের আওতায় সবগুলিকে নয়। সুতরাং মানবাধিকারের ক্ষেত্রটি অতি বৃহৎ ও সুদূর প্রসারী। সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হওয়া ছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘনে উঠে আসে বিশেষ ক্ষেত্র থেকে এক সামগ্রিক ক্ষেত্রের রূপ ও তার প্রতিকারের উপায়।

১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হওয়ার পর ৫২৪টি অভিযোগ এসেছিল। তার মধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ পদ্ধতিগত নিয়মকানুন ও মানবাধিকার কমিশনের এক্তিয়ার সম্পর্কিত উপযুক্ত উপলব্ধির অভাবের কারণে বাতিল হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতার উপযুক্ত প্রসার ঘটানো খুবই প্রয়োজন। তবে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ৫৪টি ক্ষেত্রে অভিযোগের নিষ্পত্তি

করে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। এটি অনেকটাই আশাপ্রদ। মানবাধিকার কমিশন যে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সামিল হচ্ছে তার প্রমাণ হল কমিশনের দরবারে ১৯৯৭-৯৮ সালে দায়ের করা অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১৩০টি। ১৯৯৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা কমিশনের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে কমিশনের প্রায় সব সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। সুপারিশ অনুযায়ী এ পর্যন্ত তিন জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে সরকার ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছেন। বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে ৮ জন পুলিশ অফিসার, ৭ জন ডাক্তার ও ৭ জন কারা অফিসারের বিরুদ্ধে। একাধিক সরকারি অফিসারকে সতর্ক করা হয়েছে। বিভিন্ন অভিযোগের ঘটনায় কমিশনের অসন্তোষের কথা সরকারকে জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সুপারিশ অনুযায়ী সরকার দিয়েছেন। বিচার বিভাগীয় হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় কমিশন গভীর উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। বন্দীমৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিশেষ উদ্বিগ্ন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৬-৯৭ সালে মোট বন্দীমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬০টি। তার মধ্যে পুলিশি হাজতে মৃত্যু হয়েছিল ১৬ জনের আর বিচার বিভাগীয় বন্দীমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪৭টি।

১৯৯৭-৯৮ সালে ২২০ পৃষ্ঠার যে প্রতিবেদনটি পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছেন তার বেশি অংশেই জুড়ে রয়েছে পুলিশি প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে — যথেষ্ট কারণ না থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতার করা হয়। কেন থানায় ধরে আনা হল তা জানানো হয় না। ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে অত্যন্ত কুৎসিত এবং অশ্লীল ভাষায় কথা বলা হয়। জোর করে সাদা কাগজে সই করানোর মত বেআইনি পথ অবলম্বন করা হয়। কথা মত না চললে সাক্ষীকে মামলায় জড়ানোর হুমকি দেওয়া হয়। অনেক সময় রাতে ধরে এনে সারারাত লক-আপে রেখে সকালে টাকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রেফতার করার অনেক পরে কোর্টে তোলার সুবিধা মত সময় বুঝে তা নথিভুক্ত করা হয়। আগে ধরে এনে পরে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হয়। চিকিৎসকদের ভয় দেখিয়ে হাসপাতালের রেকর্ডও বিকৃত করা হয়। বিশেষ করে থানা পর্যায়ের পুলিশ প্রশাসন রাজনৈতিক নেতাদের কথায় কাজ করেন ও ইদানীংকালের প্রোমোটারদের সাথে তারা ওতপ্রোত করেন —এসব কমিশনের তদন্তেই প্রকট হয়েছে।

সাধারণভাবে অভিযোগগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কতকগুলি ঘটনার প্রেক্ষিতে। তারই কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল। অবশ্য এক কনস্টেবল কিন্তু বেআইনি কাজে ওপরওয়ালার নির্দেশ মেনে সহমত হতে পারেননি বলে মিথ্যা অভিযোগে অনেক দূরে বদলি করা হল। তার অনুপস্থিতিতে চুরির অভিযোগে তার ছেলেকে থানায় ধরে এনে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। চুরির অভিযোগের সংশ্লিষ্ট কোন জেনারেল ডায়েরি থানায় ছিল না। পুলিশ ভ্যানে ৯০ বছরের এক বৃদ্ধকে টানতে টানতে তোলা হচ্ছে কেন এ প্রশ্ন বৃদ্ধটি করলে পুলিশ অফিসার তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলেন। এক স্কুটার আরোহীকে পুলিশের ভাড়া করা গাড়ি ধাক্কা মারলো। দোষ হল স্কুটার আরোহীর। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী মানুষজনের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে জোর করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। তার সাতদিন পরে অজ্ঞাত পরিচয় রোগী হিসাবে একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হল। দুষ্কৃতি ধরতে গিয়ে এক পুলিশ অফিসার রাস্তায় পিছলে পড়ে গেলে এক হতভাগা হেসে ফেলেছিল। এই হাসার অপরাধে পুলিশ তাকে ধরে আনে থানায়। পুলিশি হেফাজতেই তার মৃত্যু হয়। পুলিশের হাতে নির্যাতনের এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় একশ্রেণীর পুলিশ ক্ষমতার দম্ভে কত মোহগ্রস্ত। চিন্তাভাবনা না করে সরাসরি ও তাৎক্ষণিক বলপ্রয়োগ অথবা ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে যার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে তাকে সংযত হওয়ার জন্যও সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। আক্রমণের মুখোমুখি না হলে কিম্বা প্রতিপক্ষ প্রবল না হলে এবং আত্মরক্ষা করার মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে পুলিশকে শান্ত ও সংযত আচরণ করতেই হবে।

এসব তো গেল পুলিশের হাতে নিরপরাধদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ ঘটনা। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতির মতে অপরাধীদেরও মানবাধিকার আছে। সে অধিকার লঙ্ঘন করাও অপরাধ। সেই অপরাধী খুনি, সন্ত্রাসবাদী, অপহরক, প্রতারক বা সাধারণ চোর ডাকাতও হতে পারে। স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে পুলিশ লক-আপে তাকে নির্যাতন করার কিংবা পিটিয়ে মারার অধিকার কারোর নাই। পুলিশ বন্দীদের ওপর যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করে তাকে 'থার্ড ডিগ্রি' বলে। সম্ভবত ১৯০১ সালে 'থার্ড ডিগ্রি' শব্দটির উৎপত্তি হয় ব্রিটেনে। ওখানে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে ফার্স্ট ডিগ্রি বলে। দ্বিতীয় ধাপ হল তাকে থানায় নিয়ে আসা। আর থার্ড ডিগ্রি হল, উক্ত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র যৌক্তিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা। কিন্তু বর্তমানে এই 'থার্ড ডিগ্রি' কথাটি একটি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে যৌক্তিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া অসহায় বন্দীর ওপর অন্য কোন রূপ অত্যাচার করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ও ৩৩১ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্তর বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রহার-নিগ্রহ-নির্যাতন তো দূর অস্ত, এমনকি বন্দীকে ভয় ও ত্রাস দেখানও ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৩ ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগের নির্যাতনমূলক অনেক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে একটি হল — বন্দীকে পা দুটি ওপরে ও মাথা নীচের দিকে রেখে ঝুলিয়ে দিয়ে কম্বল পেটাই দেওয়া যাতে হাড় ভাঙলেও শরীরে কোনও রকম দাগ থাকবে না। এভাবে ঝুলিয়ে নির্যাতন আসলে অসহায় ও নিরুপায় মানবাধিকারকেই ঝুলিয়ে নির্যাতনের নামান্তর। এক্ষেত্রে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার আগে সরকারি ব্যয়ে সম্পূর্ণ শারীরিক অবস্থার একটি মেডিক্যাল চেক-আপ করিয়ে রাখার কথা ভাবা যেতে পারে। অপরাধ সংঘটিত হলে অবশ্য এ ব্যয় সংশ্লিষ্ট অপরাধীকেই বহন করতে হবে। অপরাধ করলেই অপরাধী হয়; অপরাধ বিচার সাপেক্ষ। একজন আপাতভাবে অপরাধ করলেই তার সমস্ত সত্তার ওপর রাষ্ট্রের এক্তিয়ার কায়েম হয় না। অপরাধীর মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও ভাই বোনেরা তার মনোরাজ্যে বিচরণ করে। সুতরাং রাষ্ট্র অধিবেচনাবশত অপরাধীকে আঘাত করলে সে আঘাত এতগুলি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আর এতগুলি মানুষ একসাথে রাষ্ট্রবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। একজন পুলিশ কর্মচারীর অসংযত আচরণ রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতা ও বিদ্বেষের প্রসার ঘটায়।

পুলিশি মহলের নিচুতলার বক্তব্য হল

তাদের ওপর তলার নির্দেশে কাজ করতে হয়। দোষের বদনামের দায়টা তাদের ওপরেই পড়ে। মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে কারও কারও মধ্যে অন্যায় ও অপরাধ করার প্রবণতার কথা বাদ দিলে পুলিশ বিভাগ যে নায়-সঙ্গত ও আইন অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা পায় না সেটা অনেকেই বলেন। পুলিশের তদন্তের কাজে রাজনৈতিক চাপ ও অন্য কিছুর প্রভাব পড়ছে কিনা তা দেখার জন্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিটি রাজ্যে একটি করে নজরদার সংস্থা গড়ার সুপারিশ করেছে। এই সংস্থার নাম হবে 'পুলিশ সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড কমিশন' (PSIC)। রাজ্যের এই সংস্থাকে যথাযথ তথ্য সরবরাহ করার জন্য জেলায় জেলায় গণ-অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র গঠন করার সুপারিশও জাতীয় কমিশন রেখেছে।

কেবল পুলিশি নির্যাতনেই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় না। জেলখানার ভিতরে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। আবার মানসিক রোগীদের সাধারণ অপরাধীদের মতো জেলে পুরে রাখাতেও তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। আলিপুরের ভবানীভবনে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের সভাপতির কাছে শুধু যে থানা-পুলিশ ও জেলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আসে তা নয়। কর্ম নিয়োগ কেন্দ্র থেকে সাক্ষাৎকারের কোন ডাক আসেনি-চাকরি পাওয়া হয়নি-পেনশন মেলেনি-আনুতোষিক তহবিলের (প্রভিডেন্ট ফান্ড) টাকা পাওয়া যায়নি-কারখানা বন্ধের চক্রান্ত চলছে-বিদ্যুৎ সংযোগ মিলছে না, ১৯৯৮ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই ধরনের প্রায় ১৩০টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। সভাপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বড় বেশি চাপ পড়ছে মানবাধিকার কমিশনের ওপর। জেলায় জেলায় মানবাধিকার আদালত গড়া হলে কিছুটা সুরাহা হত বলে তিনি মনে করেন।

গত ১২ মার্চ (২০০০) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি জে এস ভার্মা পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে বৈঠকে বসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্তে জেলা স্তরে তদারক কমিটি-গড়ার সুপারিশ করেন। জেলা জজ, জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে নিয়ে জেলায় জেলায় আলাদা কমিটি গঠন করা হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা তারাই দেখতে পারবেন। রাজস্থানে রাজ্যভিত্তিক কমিশন গঠিত না হওয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনই দেখাশোনা করেন। তবে সেখানে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক তিন কর্তাকে নিয়ে যেমন জেলা কমিটি আছে পশ্চিমবঙ্গেও সেইরকম গঠনের সুপারিশ রাখা হয়।

সার্বিকভাবে সারা বিশ্বে মানবাধিকার সুরক্ষার অবস্থাটা কেমন তা জানার জন্যে 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-র প্রতিবেদনের দিকে তাকানো যাক। "অ্যামনেস্টি"-র (Amnesty) শব্দগত অর্থ হল রাজনৈতিক অপরাধীদের ব্যাপক ক্ষমা। ব্রিটিশ আইনজীবী পিটার বেরেনসন বিশ্বজোড়া মানবাধিকার সংস্থা হিসাবে "অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল" গঠনের আবেদন জানিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৬১ সালের ২৮ মে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সদর দপ্তর লন্ডনে। আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের ৭০টি দেশে তার স্থানীয় সংগঠন আছে। ১৯৭৭ সালে সংস্থাটিকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এই সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বের ১৯২টির মত রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪১টি রাষ্ট্রই মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে —বিচার বিভাগকে টপকে ৫৫টি দেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে — ১১৭টি দেশে বিনা দোষে নির্যাতন করা হয়েছে বিশ্বের ১৩০ কোটি মানুষের দৈনন্দিন রোজগার ১ মার্কিন ডলারের কম, অর্থাৎ দারিদ্র্য সীমার নীচে বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করছে। সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগে ৩৫ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। বিশ্বের — ১০০ কোটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ লিখতে পড়তে পারে না। এদের অধিকাংশই মহিলা। কোন দেশের নাম উল্লেখ না করে সাধারণভাবে বলা যায় রাজনৈতিক বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে গিয়ে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশের বহু মানুষ কোনরকম হিংসাত্মক বা দুর্নীতিমূলক কাজ না করেও জেলে বন্দী হয়ে আছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন দেশে নিশ্চিন্তে সুখে নেই। অন্য দেশে বসবাস করতে গেলে জোর করে তাদের নিজ বাসভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শুধু আইন জারি করে মানবাধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যাবে না। পরিবর্তনটা আনতে হবে মূলত ভিতর থেকে শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে। বিশ্বজুড়ে 'মানবাধিকার শিক্ষা দশক' হিসাবে ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়কালকে রাষ্ট্রপুঞ্জ ধার্য করেছে। এ সম্পর্কিত বিস্তৃত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অধিকার ভোগী ও অধিকাররক্ষী উভয়ের জন্যেই রাখা হয়েছে। সার্বিকভাবে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন ও মানুষের অধিকার সুরক্ষা যেন দুটি সমান্তরাল রেখা। সামগ্রিকভাবে সুরক্ষা এসে লঙ্ঘনের রেখার বিস্তৃতিকে থামাতে পারছে না। না দেশে-না বিদেশে। সেটি করতে গেলে মানুষের নিজের চেতনার মধ্যে নৈতিকতার পূর্ণ উপলব্ধি আনতে হবে। এর জন্যে দরকার সাক্ষরতা—সচেতন শিক্ষা ও সার্বিক মানবিকতার মানসিক প্রস্তুতি।

আজকের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আগামীকাল কিন্তু সেই একই সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে একই লঙ্ঘনের শিকার হবেন। সহপাঠী-সহকর্মী ও সহযাত্রীর মানবিক অধিকার সুরক্ষায় আমরা এগিয়ে আসতে পারছি না। মানুষ পাগল হয় অনেক দুঃখ-কষ্টে। সেই পাগলকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি। কেউ কেউ নিষ্ঠুর নির্যাতনে মেতে উঠতেও দ্বিধা করে না। মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্যাতিত হতে দেখলে প্রতিবাদ না করে আত্মঘাতী অবহেলার অলস চোখে-ঔদাসীন্যের ঘেরাটোপে ঔচিত্য ভুলে গিয়ে অনেকেই সেই নির্যাতনের কৌতুক উপভোগ করি। মানুষের মর্যাদার চেতনাটিই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। স্বাধীনতা এসে আমাদের দেশপ্রেমকে কখন হরণ করে নিয়ে গেছে টের পাইনি। রাজনীতির বৃহত্তর উপলব্ধির পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক অহমিকা এসে আমাদের মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক চেতনাকে ধীরে ধীরে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়ের এই চোরাবালিতে মানবাধিকার ডুবতে থাকলে মানবাধিকার কমিশন আর কতদূর যাবে! তাই বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। আর সেই অতল বন্যায় ডুবন্ত মানুষ খড়কুটোর মত আঁকড়ে ধরছে মানবাধিকার কমিশনকে। ❑

শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ

মোলানীগছ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

চেপড়া (কলাগছ) জেলা উত্তর দিনাজপুর

এলাকার টাকা এলাকার সমবায় সমিতিতে রাখুন

☆ বর্তমানে সমিতির আমানত সংগ্রহ হয়েছে ৫৩ লক্ষ টাকা।

☆ এলাকার চাকুরিজীবী ও ছোট ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে মধ্যমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করে থাকি।

☆ কিষান ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে।

☆ অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় সুদের হার বেশি।

☆ অন্যান্য যে কোন ব্যাঙ্কের তুলনায় বেশি সেবা দিয়ে থাকি।

☆ আমানতের টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন।

হেমেন্দ্র দেবনাথ
সম্পাদক

গোপাল প্রামাণিক
সভাপতি

শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ

সোনাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(মিনি ব্যাঙ্ক)

পোঃ - সোনাপুর ✚ জেলা - উত্তর দিনাজপুর

- ☆ আমাদের আমানতের পরিমাণ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।
- ☆ কৃষিঋণ ছাড়াও এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা আছে।
- ☆ কিষান ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে।
- ☆ এলাকার উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর বেতন আমাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া হয়।
- ☆ এলাকায় ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
- ☆ অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় আমানতের উপর ১/২ শতাংশ সুদ বেশি।
- ☆ অন্যান্য যে কোন ব্যাঙ্কের তুলনায় আমরা বেশি সেবা দিয়ে থাকি।
- ☆ জনগণের আমানতের উপর ভারত সরকারের আমানত বিমার ব্যবস্থা আছে।

"সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয় করুন"

সেখ কামালুদ্দিন	দুলালচন্দ্র দেবনাথ	মহঃ ইয়াসিন
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

With
Best
Compliments From

Central Bank of India Employees' Cooperative Society Limited

Nirmal Mitra Bhawan
10, Nellie Sengupta Sarani (3rd floor)
Calcutta - 700 087
Phone : 244 6789 / 245 9632
Telegram : "CENTSAMABA"

- Share Capital
- Working Capital
- Serves more than 7,500 Members In Eastern India
- Offers Loan facility of Rs. 60,000/- (maximum)
- Runs Eight Holiday Homes at **Bakkhali, Calcutta, Digha, Puri Rajgir, Darjeeling, Santiniketan, Varanasi**
- Extends many more facilities under Social Benefit Scheme

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা

৪৫, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

জ্ঞাতব্য

যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে নিম্নোক্ত পরিষেবা প্রদানে সি এস টি সি ব্রতী :

কম্পিউটারের মাধ্যমে যাত্রারম্ভের ১৪ দিন পূর্বে অগ্রিম বুকিং ব্যবস্থা।
প্রস্তিস্থল এসপ্ল্যানেড বুকিং অফিস। এর সাথে কতিপয় রুটে রিটার্ন টিকিটের অগ্রিম ব্যবস্থা।

দূরপাল্লার সার্ভিসের ক্ষেত্রে কলিকাতা সহ বিভিন্ন শহরে টিকিট এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থা।

৩। ট্যুর ও ট্রাভেল সার্ভিসের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা।

ছাত্রছাত্রীদের সিটি সার্ভিসের জন্য কনসেশনাল মাসিক টিকিট।

দিবা-রাত্র কন্ট্রোলরুম হতে সার্ভিস সংক্রান্ত খবর আদান প্রদান।
ফোন নং - ২৩৭-১২১২/১৫, ২২৫-১৪৭০। এছাড়া জনসংযোগের সুবিধার্থে রয়েছে
ফ্যাক্স নম্বর ২৩৬-৪৪৭৭ এবং E.mail No. - mdcstc@cal 2.vsnl.net in.

শহর ও শহরতলীর বাস সার্ভিস ও দূরপাল্লার বাস সার্ভিসের তথ্যাদি সম্বলিত পুস্তিকাও
এসপ্ল্যানেড বুকিং অফিস হতে নামমাত্র ১ টাকা মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা।

৭। দূরপাল্লার যাত্রীর ক্ষেত্রে বাংলায় মুদ্রিত উচ্চমূল্যের টিকিট প্রচলন।

শহরতলীর ৭০ কিমি পর্যন্ত দূরত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন বাস রিজার্ভেশন-এর সুলভ ব্যবস্থা এবং দূরপাল্লার বাস রিজার্ভেশন-এর সুলভ ব্যবস্থা। বিশদ বিবরণ সংশ্লিষ্ট ডিপো ম্যানেজার /কন্ট্রোলরুম হতে পাওয়া যাবে।

মেট্রো রেল ও সি এস টি সি-র যৌথ উদ্যোগে রেল-কাম-রোড সমন্বিত (ইন্টিগ্রেটেড) সার্ভিস
এসপ্ল্যানেড ও হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রতি চালু করা হয়েছে।

বি. দ্র. ঃ পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য মেট্রো রেল স্টেশন হতে বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

সঠিক ও অগ্রিম টিকিট কেটে সরকারি বাসে ভ্রমণ বাঞ্ছনীয়
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা আপনার সাহায্য কামনা করে।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ

একটিয়াশাল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(মিনি ব্যাঙ্ক)

চয়নপাড়া ☆ পোঃ ঘোগোমালী ☆ জেলা ঃ জলপাইগুড়ি

☆ আমাদের মোট আমানত ৫৬ লক্ষ টাকা।

☆ কৃষি ঋণ ছাড়াও আমাদের অকৃষি ঋণের পরিমাণ ১২ লক্ষ টাকা।

☆ অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় আমানতের উপর ১/২ শতাংশ সুদ বেশি।

☆ ছোট ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা আছে।

☆ এলাকার গ্রাহকদের সুবিধার জন্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় আমরা বেশি সেবা দিয়ে থাকি।

☆ একটিয়াশাল সমবায় সমিতি এলাকার জনগণের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত।

☆ বিস্তারিত খোঁজখবরের জন্য সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

বাদল রায়	শুভেন রায়	গোপেশ রায়
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

পুরী ধামে স্বর্গদ্বারে

ত্রিতল বিলাসবহুল

মোট এগারো কামরার

হলিডে হোম

পরিচালনা ও যোগাযোগ :

কলিকাতা ট্রামের কর্মচারীদের সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ

১২, আর. এন. মুখার্জি রোড (দ্বিতল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ঃঃ দার্জিলিং ঃঃ

গেস্ট হাউস - ছুন - হোটেল ম্যাজেস্টিক, ১৬, এম. সি. রোড, দার্জিলিং। ৪টি ঘর। দৈনিক হার ১৫৫ টাকা।

ঘরের বিবরণ :

ডি: ব্রঃ - রান্না করে খাবার কোন ব্যবস্থা নাই, তবে ঐ গেস্ট হাউসে সুলভ হারে সকালের জলখাবার থেকে রাত্রির আহারের ব্যবস্থা আছে।

ঃঃ পুরী ঃঃ

স্বপ্নপুরী গেস্ট হাউস - (পুরী হোটেলের কাছে - সী বীচের উপর)। ৩টি ঘর। দোতলায়।

ঘরের বিবরণ : প্রতিটি ঘরে ৪জন করে থাকতে পারবেন। সংলগ্ন বাথরুম ও রান্নাঘর আছে।

দৈনিক হার — প্রতিটি ঘর প্রতিদিন ১৬০ টাকা হারে। রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে।

ঃঃ দিঘা ঃঃ

গৌরী কুঞ্জ — শিবালয় রোড, (রাজবাড়ি কম্পাউন্ড) ওল্ড দিঘা। ২টি ঘর।

দৈনিক হার — প্রতিটি ঘর প্রতিদিন ৭০ টাকা হারে। রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে।

হলিডে হোম বুকিং সমবায় অফিস হতে করতে হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসেস কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

সি-৪১-৪২, উইলিয়ম জোন্স সরণি, (ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস)

লালবাজার সকল কেন্দ্র (দ্বিতীয় তল), কলিকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন : ২২৫-৩৯১৮

প্রবন্ধ

লক্ষ্মীলাভের পথ বিকল্প

তরুণ সান্যাল

ছেলেটি বেশ আবেগময়, রোমান্টিক, গান বাজনা কবিতা ভালোবাসে, এমনকি ছবিও আঁকে, কবিতাও লেখে। অথচ বাবা ক্যাসপার এঙ্গেলস ছিলেন ছেলের একেবারে বিপরীত। মনটা তেমন বড় নয়, ওয়ান পাইস ফাদার মাদার ক্যালভিনিস্ট। অতি বাস্তববুদ্ধির বাপ ছেলেকে আর প্রশ্রয় দিলেন না। ব্রেমেন শহরে তাঁর আমদানি-রপ্তানির কারবার ছিল। বাড়িতে ছেলেটিকে রেখে দেওয়া হলো। একাধারে গৃহকর্তা একেবারে ধর্মত্রাস, অন্যদিকে টাকা রোজগার করার দিকে তাঁর শেন দৃষ্টি। তরুণ শিল্পমনা হংসবৎ কিশোরকে শেষে পাঠানো হলো ম্যাঞ্চেস্টারে। সেখানে পারিবারিক এক কাপড়কল ছিল। ব্রেমেনের ডকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে মেহগিনি কাঠে সোনার অলঙ্করণে খচিত বিছানায় শুয়ে তরুণটি ভাবত কী বৈপরীত্য মানুষের জীবনে। ম্যাঞ্চেস্টারেও দেখলো সে সুন্দর সুন্দর জিনিস। চমৎকার হোটেল। অপেরা হাউস। প্রচুর মদ মাংস ফলমূল দীয়তাং ভুজ্যতাং পার্টি। আর দেখে ফেললো, নোংরা আবর্জনাময়, দুর্গন্ধ নর্দমা, ভাঙাচোরা বস্তি-বাড়ি নিয়ে আরেক ম্যাঞ্চেস্টার। ঐ শ্রমিকদের নিত্যদিন ইশ্বরের কথা ভাবানো হয়। শোনানো হয়। গির্জাতে তারা নিয়মিত চাঁদাও দেয়। তরুণটি দেখলো, কি রাইনল্যান্ড কি ম্যাঞ্চেস্টার, দু-জায়গাতেই ধনী-নির্ধনের ব্যবধান একইরকম। সব বস্তিবাড়ি-কারখানা ঘুরে ঘুরে তরুণটি একটি বই লিখেছিলো। 'ব্রিটেনে শ্রমজীবীদের অবস্থা' নামে। ১৮৪৪ সালে। তখনও সে কার্ল মার্ক্সের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়ে ওঠেনি। অথচ এখন বলা হয়, ঐ বইটিই সম্ভবত প্রথম 'মার্কসপন্থী' বই। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ। লেখকের নাম ফ্রেডরিক এঙ্গেলস।

এঙ্গেলসের আরেকটি ধাক্কা পাবার অপেক্ষা ছিল। ম্যাঞ্চেস্টারের এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ-চারিতায় বললেন তিনি, এমনটি "ill built city" কোথাও দেখেননি। বন্ধুটি চুপচাপ এঙ্গেলসের ক্রুদ্ধ সওয়াল শুনলেন। শেষে বললেন "And yet there is a great deal of money made here ; good day, sir."

চারুশিল্পপ্রেমিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের চোখ এক মুহূর্তে খুলে গেল ঐ উক্তিতে। একদল অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যত গরিব থাকবে, রোগে ভুগবে, অকালে মারা যাবে, ততই আরেক দলের নিরোগ দীর্ঘ জীবন কার্যকর থাকবে। কারখানার মালিকপুত্র এঙ্গেলসের তো great deal of money-র পেছনে দৌড়বার কথা ছিল। তা হল না। আসলে এঙ্গেলসের মাথা খেয়েছিল সৃষ্টিশীল শিল্প, ইতিহাস অধ্যয়ন, সমাজ বিষয়ে নানা প্রশ্ন, মানুষ আবিষ্কার। সর্বোপরি কার্লমার্ক্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৮৪৪ সালের পর দেড়শো বছরের বেশি সময় পার হয়েছে। তখন কথাটা উঠেছিল ম্যাঞ্চেস্টার নিয়ে। এখন গোটা পৃথিবীটাই নিয়ে। এর একদিকে রয়েছে বনেদের বাড়িঘর, বাগান, হাভেলি, দৌলতখানা, আরেকদিকে পুরনো দিনের জেলেপাড়া, মালোপাড়া, বাগদিপাড়ার মতো রয়েছে গরিব-গুর্বোদের পাড়া। এই নানা গরিব পাড়ার বাসিন্দারা এটা বানাবে, ওটা বানাবে কাঁচামাল হিসাবে, বা সমাপ্ত জিনিস হিসাবে। লোহা-কয়লা তেল খনি থেকে তুলবে। আর রাজারাজড়া হওয়ার পর ঐ মুনাফা লক্ষ্মীমানুষের ঘরে যাবে। সবকিছুই এখন হিসাব নিকাশের ব্যাপার। আঙ্কেকার দিনে ওস্তাদীর আর্থা শিখে জমি-জিরেত বেচাকেনা হতো, জিনিস-পত্রের দাম মণের হিসাব হতো, তিন মাথা বুড়োর কাছে বুদ্ধি নেওয়া হত। এখন কী চকচকে বিদ্যাস্থানে ব্যবস্থাপনার শিক্ষা নিতে হয়। লোকজনকে চালনা করার জন্য আছে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, ঘরে ঘরে শিখছে কম্পিউটার। আমরা এসব পছন্দ করি বা না করি কিছু এসে যায় না। অন্ন প্রতি ঘরে তক্কা হইবেক সব, মড়াই কেরের লাল হয়ে জ্বলা ধর', 'খাটে খাটয় দ্বিগুণ পায় তবে অর্ধেক ছত্তা মাথায়।' ঘরে বসে পুছে কত, ওর বাড়িতে হাজত হজাত।' এসব এবার বাতিল কেননা চাষী অমুক খুড়ো, বা মাঝি অমুক কাকা — এখন আর সে সম্পর্ক নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক হয়ে পড়েছে মাত্র লোকসানের হিসাব মাফিক। কস্ট বেনিফিট রেশ অস্ত্রাঘাত। শুধু মানুষের সংসারই ভাঙছে না এই হিসাব-নিকাশে, ইতিমধ্যে ভেঙেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভাঙছে ভারতও। পৃথিবীময় ভাঙা-গড়ার ঝড় বয়ে চলেছে। একেবারে চোখ বুজে থাকলে আমাদের চলবে কেন? বলা হচ্ছে, এ যুগটা অর্থনীতির যুগ। সব কিছু বাজারের চাহিদা-যোগান মাফিক চলতে হবে। ভুল কথা। অর্থনীতির যুগ এটা নয়, চলেছে অনর্থের যুগ, বাণিজ্যের যুগ। কবিগুরু মুকুন্দ-রাম বলেছিলেন চারশো বছর আগে, 'পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।' এখন সেই বাণিজ্যের যুগ।

ইকনমি শব্দটি পশ্চিম থেকেই এসেছে। গ্রিকরা তাদের গৃহস্থালীকে পরিচালনার নিয়মকে বলতেন ওইকোনোমি। তা ছিল নানা তৈজস ব্যবহার করার রীতিনীতি। যুদ্ধবিগ্রহ ছিল, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ মানেই পরাস্ত দেশের শক্ত সমর্থ দেখে যুবক-যুবতীদের দাস করে নেশে নিয়ে যাওয়া। খুন, জখম, ঘরে আগুন দেওয়া এসব তো ছিলই। বিজিতদের বাড়িঘরের তৈজসের ওপরে ছিল বিজয়ীদের লোভ। এদেশে ওদেশে, এর সঙ্গে ওর যে পণ্যের বিনিময়টা ছিল না, এমন নয়। তবে ঐ কাজটাকে বলা হত বাণিজ্য। দেশে বিদেশে যারা ঐসব সওদা নিয়ে বাণিজ্য করত তারা ছিল সওদাগর। সওদাগরের কৌক ছিল মুনাফা পাওয়া। কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি হলেই লাভ হবে। নানা দেশে তারা কর্মকুশলী কারিগরদের কাছ থেকে ঐসব সওদা কিনত। কারিগরদের কর্মতৎপরতা যেমন ছিল বেশি, তেমনি উৎপাদন করার কলাকৌশলটা তারা নিজের পরিবার বা পরিজনের মধ্যেই গোপন রাখত। উৎপাদন করতে টাকায় যা খরচ-খরচা পড়ত, তার চেয়ে কিছু বেশি পেলেই সওদাগরের কাছে কারিগর পণ্যটি ছেড়ে দিত, আর যে দেশে সে পণ্যটি উৎপাদন হতো না, বা উৎপাদনের খরচ-খরচা পড়ত বেশি, কিন্তু চাহিদা ছিল, সেখানে কেনার দরের চেয়ে ঢের বেশি দরে সওদাগর বিক্রি করে দিত। আর বাণিজ্য চালাতে কথায় কথায় হাওলাত করতে হত। বিনিময়ে সুদ দিতে হত। সওদাগরের কাফেলার রক্ষী ছিল, ছিল পেশাদার সৈন্য, রক্ষিণী নারী, সিরাজি, খেলাতে ইত্যাদি। প্রয়োজনে বিষ দেবার ব্যবস্থাও। এবং সর্বোপরি অন্তরের পরলোকে মুখের মিষ্টি কথায় ঢেকে রাখা। এ সওদাগরেরা নিজ দেশের হয়ে (এমনকি পয়সার বিনিময়ে অন্য দেশের হয়েও) গোয়েন্দাগিরি করত। এখন খোদ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ মুখ্যত মার্কিন দেশের স্বার্থ দেখে। মার্কিন ভেটোতে বহু প্রস্তাব এদিক ওদিক হয়ে যায়। ইউরোপে মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মের প্রাবনের যুগে টমাস অ্যাকুইনাস বাতিল করেছিলেন সুদের তত্ত্ব। টাকা কি টাকায় ডিম পাড়ে বা বাচ্চা পাড়ে? এসব বাণিজ্য নিয়ে কথাবার্তা। কমার্স নিয়ে। পরে অবশ্য সুদ চালু হয়। কেন? ঝুঁকির দাম সুদ, তাই।

অর্থনীতি ব্যাপারটা কিন্তু ভিন্ন। এটি পোটাটাই তাত্ত্বিক। কাকে সম্পদ বলব, কাকে বলব অর্থনৈতিক কাজকর্ম, দেশের উপকরণের বিকল্প ব্যবহার আছে তাদের সবচেয়ে কম ব্যবহারে কিভাবে সবচেয়ে বেশি পণ্য উৎপাদন হবে, কিভাবে জাতীয় আয় বর্ধন হবে ও কার্যপ্রার্থী সব মানুষের কাজ জুটবে, বাণিজ্য চক্র ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে, কেমন ধরনের কর আরোপ হবে, কতটাই বা টাকা-পয়সার যোগান হবে — সর্বোপরি কোন পণ্যের বাজার দর চাহিদা-যোগানের নিরিখে ভর্তুকি ও পরোক্ষ করের নিরিখে নিরূপিত হবে — এইসব বিষয় অর্থনীতি শাস্ত্রে পড়ানো হয়। বিষয়টা সব সময়েই তাৎক্ষণিক লাভক্ষতির পরিমাপক নয়। বরং কর্মসংস্থান বাড়াতে যদি ভরতুকি দিতে হয়, ঘাটতি বাজেট করতে হয়, করের হারের হেরফের প্রয়োজন হয়, সুদের হারের বদল ঘটাতে হয়, এসব ঠিক বাজারের সওদাগরের কাজ নয়, কাজটা সরকার পরিচালকদের। তাঁদের উপদেশ দিয়ে থাকেন অর্থনীতিবিদরা। তবে কেইনস বলেছেন ব্যর্থ রাজনীতিকদের পুরনো অর্থনীতি পাঠই তাঁদের ব্যর্থতার কারণ। কিন্তু এই ধরনের কাজ, অর্থাৎ কর্মসংস্থান, দাম-স্তরের স্থায়িত্ব, বাণিজ্য চক্র ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সব সওদাগরের মনঃপূত হবার কথা নয়। যার লক্ষ্য বেশি বেশি শুভ লাভ, যেজন্য তার কুলুঙ্গিতে গণেশ মূর্তিটিকে সিঁদুরে-তেলে একেবারে জবজবে করে রেখেছে, সে এসব শুনবে কেন? তার থলিতেই তো টাকা। সে তো জানে সাংসদ বিধায়কদের 'কিতনা ভাও'। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-প্ল্যানিং কমিশনে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি পড়া ছাত্রদের খুব গণিত-টনিত নিয়ে ছক-টেবল-উর্ধ্বরেখা ইত্যাদি আঁকতে দেখা যায়। ওরা হর্ষদ মেহতাদের ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু সওদাগরির লোকজন শেয়ার বাজারে কখনও বলীবর্দ কখনও ভল্লুক সর্দারের ঝুঁকা বরদার হিসাবে কাজ করে। শেয়ারের দামের বাড়া-কমার সম্ভাবনা মনে রেখে, ঐসব কেনাবেচা নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারা ফাটকাবাজ। এমনি জলপত্রের সুদ ওঠাপড়ায়, ঐ কাগজের বাজার দরও কমে বাড়ে, সে সম্ভাবনা মনে রেখেও যারা কেনে তারাও ফাটকা খেলে। কিন্তু যারা সঞ্চিত টাকা কলকারখানা মজুত কাঁচামাল ইত্যাদিতে লাগায়, তাকেই সাচ্চা বিনিয়োগ বলে। কেইনস বলেছিলেন, ফাটকার ঘূর্ণিতে যদি বিনিয়োগ ভেসে যায় তখন দেশের সর্বনাশ। আর বিনিয়োগের স্থির স্রোতধারায় যদি এদিক সেদিক ফাটকার ঘূর্ণি দেখা যায় সে তো ভালই। বলা বাহুল্য ফাটকা ব্যাপারটা ব্যক্তিদের জন্য। লাভ-লোকসানের জন্য। নিছক তা ব্যক্তিগত। বিনিয়োগটা অর্থনীতির। এখন দুনিয়ায় হৈ হৈ করে শেয়ার ও জলপত্রের ফাটকা বা জুয়া খেলা চলছে। অর্থনীতি-শাস্ত্রপাঠ পিছিয়ে পড়ছে। পৃথিবীময় সেনসেক্স ইত্যাদির চটক এখন।

আমরা এই বিশ্বব্যবস্থার এক জটিল সংহত প্রাকভুবনে বাস করছি এখন। সে ব্যবস্থাটা কিন্তু অর্থনীতির নয়। বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার। ঐ যে যেমন কেইনস বলেছিলেন, ফাটকার ঘূর্ণিতে এখন ওলোটপালোট খাচ্ছে লগ্নি। পিছিয়ে পড়ছে সাচ্চা বিনিয়োগ। এখনকার বিশ্বব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে নয়উদারনীতিকরণ। এই তত্ত্বের প্রথম বৃদ্ধিগত গঠনরূপ দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখন অ্যাং-ব্যাং-থলাসে সব মাছই মার্কিন সুতোয় টানে উদারনীতি নিয়ে নাচামাচি করছে। মার্কিনী তত্ত্বের মূল আক্রমণ ছিল অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর। উন্নত পুঁজিবাদী দেশ, বিকাশমান দেশ বা সমাজতন্ত্রী দেশ, বলা হচ্ছে, সব দেশেই নাকি উৎপাদনের উপাদানগুলি রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক ভূমিকায় বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। উপাদানগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার ঘটছে না। তাদের ব্যবহারিক কর্মকুশলতা নেই। আর যেহেতু এসব প্রকল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, নিয়ন্ত্রিত দামের বাজিগ্যে কি প্রকল্প কি সাধারণ মানুষের কাছে এক ধরনের কর সংগ্রহের কাজ চলে। সরকার বা বড় প্রতিষ্ঠান যে দাম স্থির করবে আমরা সে দাম দিতে বাধ্য। এতো কর দেওয়া। প্রকল্পটির লোকসান হচ্ছে, সরকার কর আরোপ করল লোকসান পরিমাণ মিটিয়ে নিতে। সেও কর। সুতরাং এই করের হাত থেকে বাঁচতে বাচ্চার স্নানের বালতির জল ফেলে দেবার সঙ্গে বাচ্চাটিকেও ফেলে দেওয়া আর কি। 'সরকারি কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও'। সরকার নাকি কর্তৃত্বমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। কমাও অর্থনীতি মানে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে পরিকল্পনার লক্ষ্য মাফিক বিনিয়োগ

করো। সেই প্রকল্পগুলি এমন ঢাউস ঢাউস মাপের যে বেশ দিন লেগে যায় সেগুলি ফলপ্রসূ হতে। তাই খরচের তুলনায় লাভ কতটা হল তা খতিয়ে দেখা দায়। যারা নব্য উদারনীতির তাত্ত্বিক তাদের রাশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর। তাঁদের মতে রাষ্ট্র ঐ পরিকল্পনাকে বাহন করেই বিপুল কর্মকুশলতাহীন দৈত্যাকার প্রকল্প গড়ে তোলে। এসব প্রকল্পের মাথায় এসে বসে আমলারা। এভাবে আমলাতন্ত্রের এক জবরদস্ত লবিও তৈরি হয়। এসবের প্রতিষেধক হতে পারে তাই পায়ের আগল ভাঙা বাজার ব্যবস্থার কাজকর্ম। চাহিদা-যোগানের কাঁচিতে ঠিক মাপমতো নাকি কেটেকুটে বাজারের ন্যায্য দাম তৈরি হয়। এ- পথে, ও-পথে, কোনওটা বা ইনপুট, কোনওটা বা আউটপুট — সরকিছুর মধ্যে অন্তঃস্থ্রনা থাকে ঐ দামের সারণিতে। ঐ ধরপরম্পরাই বিকল্পনিক্ষের ভিত্তি। ভর্তুকি আর পরোক্ষ কর দামের বিকলাঙ্গ রূপটি দেখায়। ওসব তুলে নিলে অন্য দেশে তো বটেই, দেশের মধ্যেও সুঠাম বাণিজ্য দেখা দেবে। একেই উদারনীতি বলছেন তাঁরা। আর এই উদারনীতির দায় রক্ষা করতে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল যুদ্ধং দেহি ঢঙ্গ দিয়ে নেমে পড়েছে। এদের আছে স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য। স্বল্পস্থায়ী লক্ষ্যে রয়েছে, অর্থনীতি ব্যবস্থার স্থায়িত্ব। লগ্নির সেইটুকু অংশকে সাহায্য করা যাতে রাতারাতি লোকজন পথের ভিখারি না হয়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যে রয়েছে গঠনমূলক সংস্কারসমূহ। স্বল্পস্থায়ী অংশটিতে আছে চাহিদার দিকটি। বিনিয়োগের দিক। দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যে আছে পরিকাঠামোর প্রতিবন্ধকতা দূর করা। বাজারে যে বিষমতা সরকার সৃষ্টি করেছে মাইক্রোপর্যায়ে তা দূর করা। অর্থাৎ ভর্তুকি বাতিল করা, সরকারিভাবে প্রবর্তিত দাম এবং রেশনিং ও কন্ট্রোল ব্যবস্থা বন্ধ করা, নানা ধরনের আমদানি রপ্তানি কর, উৎপাদন ও বিক্রয় কর তুলে দেওয়া। কি শিক্ষা কি হাসপাতাল, কি যানবাহন, ফসলের পেছনে হরেক ভর্তুকি সব তুলে দিয়ে যোগানের দিকে প্রভাবহীন প্রান্তিক খরচকে হিসাবের মধ্যে করতে হবে। সরকারের ঐ পরিধি হঠানোর কার্যকলাপ বাতিল করতে হবে। সরকারি ব্যয়ে কিছু পরিধিও দূর হবার নয়। দেশে যতই কেনা-বেচা বাড়বে, খরচাপাতি বাড়বে, পরিবণ্টনের পকেটেও পয়সা আসবে। ধরুন না, আপনি বাজারে জিনিসপত্র কিনে, রিক্সা বা ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফিরলেন। আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা টুইয়ে রিক্সা বা ট্যাক্সি চালকের পকেটে পৌঁছল। ভারতের মতো দেশে নানা প্রকল্প গড়া হয়েছিল আত্মরক্ষাকে সামনে রেখে। ইস্পাত কারখানা, খনি থেকে খনিজ নিষ্কাশনের জন্য যন্ত্রের কারখানা, দেশের সঞ্চয় একীকরণ করার জন্য বিমা ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ — কত কি। ওসব নাকি করতে হয়েছিল দেশে পুঁজিপতিদের সামর্থ ছিল না ওসব গড়বার মতো, তাই। এমনকি বিদেশি পুঁজিরও অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। পৃথিবীতে তখন ঠান্ডা যুদ্ধের আবহাওয়া যেমন ছিল, তেমনি দ্রুত আমাদের কলকারখানা গড়বার ব্যবস্থাও সাধ্যাতিরিক্ত হলেও জরুরী করার সাধনা ছিল। আমাদের অকুশল শ্রমিক, কাঁচামাল ও প্রযুক্তির অভাব, ব্যবস্থাপনার দৈন্য মাথাভারি আমলাতন্ত্র পণ্যের দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু আমরা পেয়েছি নানা জাতের কলকারখানা, পণ্যের যোগান ইত্যাদি এবং স্বনির্ভর অর্থনীতির শিরদাঁড়া। ফিদেল কাস্ত্রো হাভানায় এই বিশ্বাস নিয়ে উত্তর-দক্ষিণ সেতুগুলির সম্মেলনে একটি নথি তুলে দেখিয়েছেন ১৯৪৫-৭৫ সালে বিকাশমান দেশগুলির যে অগ্রগতির হার ছিল এখন তা ১৯৭৫-৯৮ কালপর্বে হয়েছে অর্ধেক। পশ্চিমী দেশ থেকেই প্রকাশিত রাশি রাশি বইতে বা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখন শেখায়নি, টাকা-পয়সার খরচার অনুপাতে লাভটাই হিসাবের বিষয়। আমাদেরও লাভ-লোকসানের খতিয়ান ছিল ভিন্ন — যেমন নানা সীমান্ত যুদ্ধে বিজয়, বাংলাদেশের মুক্তি, ভারতের খাদ্যে-বস্ত্রে-সিমেন্ট-ইস্পাতে স্বয়ম্ভরতা, অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধে নিরাময়ের ভিত্তি সৃষ্টি করা ইত্যাদি। নৌকাডুবি হয়ে কেউ মারা যাচ্ছে ভেবে, সাঁতার ব্যক্তি যেমন ভাবে না, ডুবন্ত মানুষটাকে বাঁচালে তার গা-গতরের তাপশক্তি খরচ হলে কতটা লাভ হবে, মুমূর্ষু পুত্রকে চিকিৎসার জন্য অসহায় পিতা-মাতা যেমনভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে তখন তার পেছনে তো কোনও কস্ট-বেনিফিটের হিসাব নেই! যাই হোক, ঠান্ডা যুদ্ধের শেষে, বিশেষভাবে মার্কিন দেশের পণ্যসম্ভার বিক্রি বিশ্বের বাজারে হঠাৎই পড়ে গেছে, সেগুলি বিক্রির জন্য ভারতের বাজারটাও খুব প্রয়োজন। এজন্য মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দেশের কোটিপতিরা যেসব দেশি-বিদেশি অধ্যাপক-বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিন ধরে পুষছে এবার লটির কোন দিকে মাখন থাকবে তার প্রমাণ দেবার জন্য ঐ উদারনীতিকরণ, ব্যক্তিমালিকানাকরণ ও বিশ্বায়নের তত্ত্ব খাড়া করছেন তাঁরা। মেধাসত্ত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার, পরিব দেশের বিরুদ্ধে পেটেন্ট আইন, ন্যায্য রপ্তানির উপর ধনী দেশের নিয়ন্ত্রণ, এমনকি রোগ প্রতিষেধক টিকা ধনী ওষুধ কোম্পানিদের হাতে তুলে দেওয়া — এসবই ঐ বিদ্বান কর্তাভজারা মেনে নিচ্ছে। তাতে আমাদের দেশের সাহেবভক্ত এবং বিদেশে গ্রিন কার্ড অভিলাষীরা গলা মিলিয়েছে। সাংসদ থেকে সংবাদপত্রের কলমচি অনেকেই এক ঝোট এখন। ক্লিন্টন যখন সংসদে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন, দেখলাম তাঁর হাত ধোয়ার মানসিকতায় চাকর-বাকরের দেদে প্রতিযোগিতা। এতদিন ছিল দেশ ও রাষ্ট্র। এখন রাষ্ট্র বলে, জাতি বলে আর কিছু থাকছে না। থাকছে এক বিশ্ব — ওয়ান ওয়ার্ল্ড। এক বিশ্বগ্রাম। আর গ্রামের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার হাতেই লাঠিখানা বরকন্দাজের বল, তার কথাতেই ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়।

ঠিক কথা, মার্কিন দেশে পুঁজি উপচে পড়ছে। সে পুঁজি খাটতে যাচ্ছে, ব্যক্তিপুঁজির কিছু কিছু প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে যেমন, তেমনি ফাটকা বাজারেও। ভারত সরকার বহু চেষ্টা করেও হাতে পায়ে ধরেও প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ তেমন বাড়াতে পারছে না। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে জাতীয় আয় বাড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আসছে না। অর্থাৎ এদেশি কল-কারখানায় প্রত্যক্ষ বা সহযোগী হিসাবে তারা লগ্নি করছে কম। এসব লগ্নি ফলপ্রসূ হতেও সময় লাগে। তাছাড়া আছে রকমির অনিশ্চয়তা। এর চেয়েও সে ভালো মার্কিন মুদ্রা মালিকদের বিদেশে শেয়ার বাজারে টাকা লাগানো বা বিদেশি জলপত্র কেনা: ধরা যাক, কোনও শেয়ারের দাম বেশ চড়ছে এবং জলপত্রেও সুদের হার চড়ছে — বিদেশ থেকে মার্কিন গরম টাকার আয় বেড়ে গেল ফটকা বাজারে। সেই জন্য

ডলার মূলধন বিদেশি মুদ্রা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে টাকা সৃষ্টি করবে। সেই টাকা দেশি কোম্পানিগুলিতে ক্রেডিট ও বাট্টার বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের কাছে আসবে এবং ব্যাঙ্কে ক্রেডিট গড়ে তুলবে। কারখানা চালু হবে, লোকজন কাজ পাবে, কি চমৎকার এই ছবি। তারপর একদিন সেয়ারের দাম পড়তে থাকবে, সুদের হারও। ব্যস, লোকসানের ভয়ে ডলার বিদেশে উড়ান দিল। কলকারখানা-চাকরি-বাকরির তাসের ঘর এক মুহূর্তে ছত্রখান। আমাদের দেশে বিদেশি মজুত টাকার চরিত্রের বড় অংশটাই এ ধরনেরই। তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার এশিয়ান টাইগাররা যে রাতারাতি চুরা বনে গিয়েছিল ১৯৯৮-৯৯ সালে তা ঐ ডলার উড়ানের জন্য। অর্থনীতিবিদ টবিন বলছেন, ঐসব ডলার উড়ান কন্ট্রোলের উপরে ০.১ শতাংশ হারে লেনদেনের উপর কর বসুক। তাতে পরিব দেশগুলির উপরে ঐ স্ট্যাটাস চাপও কমবে, তাদের তহবিলে কিছু জমাও হবে। কিন্তু কাজে চেয়েছেন ১ শতাংশ হারে কর। তাতে এক ট্রিলিয়ন ডলার মোট তহবিল গড়ে উঠবে। উল্টোটাই বরং শুনছি, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিতে ঐরকম উড়ান টাকা জমেছে, হিসাব করছে কবে কোন দেশে ইন্টারনেট মারফত তা ঢুকবে। যারা একটু আধটু ওরকম ব্যবস্থায় পরিসেবা করছে, তাদের গলা টিপে ধরছে ঐ উড়ান ডলারপতিরা। কোথাও দেশি-বিদেশি নামে, কোথাও খ্রিস্টান-মুসলমান নামে — ফিজি, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া — এই ডিভাইড অ্যান্ড রুলের সাম্প্রতিক ভূমিপুত্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার শিকার হয়ে বাঙ্ময়। আমরা কি জানি না, হঠাৎ পারভেজের কেন কাশ্মীর প্রেম উথলিয়ে উঠল? কেন লাদেনের চেচনিয়ায় এমনকি ভারতেও বজরং দলের খ্রিস্টান বিতাড়নের জন্য এত উদ্দীপনা? জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যের 'যত্র বিশ্বভবেৎ এক নীড়ম' নয়, ফুটছে দাঁতে রক্ত নখে রক্ত মুখে মিষ্টি আস্তিনের তলায় ছুরি নিয়ে বিশ্বায়ন। তরুণ বয়সে পড়েছিলাম, নেহরু-মহলানবিশ-ইন্দিরা গান্ধির পরিকল্পনা সমর অবশ্যই একদল মানুষের আয় বাড়বে। তবে, বিদেশি মুদ্রা ব্যবহার এবং দেশে বিলাসপণ্য ভোগ নিয়ন্ত্রণ এবং হাতে সঞ্চয় গড়ে তুলবে। পরিকল্পনায় বিনিয়োগের জন্য যে বিদেশি ও স্বদেশি সঞ্চয় প্রয়োজন তা অনেকখানি মিটবে এই অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ে। শোনা যাচ্ছে, ভারতে এই ধনীর সংখ্যা নাকি এখন কিছু পঁচিশ কোটি। যাদের সঞ্চয় পড়ার জন্য পরিকল্পনারও কিছু ভূমিকা রয়েছে, যে সঞ্চয় স্বদেশে লগ্নি হওয়া কাম্য ছিল। পশ্চিম ইউরোপের একাধিক দেশ জুড়লেও না কি এমন সংখ্যক ধনী ক্রেতা পাওয়া যাবে না। অবশ্য ভারতে রয়েছে দারিদ্র্যরেখার নীচে কম করে চল্লিশ কোটির মতো মানুষ। এ পরিবর্তনের কথা কে ভাবে? সরকার দেশের সঞ্চয় ঢালাওভাবে বিদেশি পণ্য কেনার জন্যই উদারিকরণ চাইছে। বিশ্ববাজারের উদারনীতির কল্যাণে কড়ের মতো উড়ে যাচ্ছে স্বদেশি সঞ্চয়। বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশি স্থায়ী লোকদেখানো পণ্য কেনার এবং অজস্র লোকদেখানো ব্যয়ে। এইসব পণ্য কেনবার পথ বাতলে দিচ্ছে টিভির বিজ্ঞাপন। দিচ্ছে নানা এক্সক্লুসিভ সমস্য পণ্যের ক্লাব। এমনকি চিকিৎসার নামেও ঘটছে এদেশ সেদেশ ভ্রমণ। বিশ্বের অন্যতম বিলুপ্তের নামেরও ক্লাব ভ্যালু আছে। মনে পড়ছে, তিরিশের দশককে এমনি বলেছিলেন অলডুস হাক্সলি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ১৯২৯-৩০-এর চরম আর্থিক দুর্গতির সময়েও মার্কিন দেশে মেয়েদের সাপ্তাহিক প্রসাধন খরচ কমেনি। মোটামুটি ঐ কালচায়, ঐ সব কালচারে আমাদের দেশের ধনীদের ঢুকিয়ে নিয়ে নানা পণ্য ভোগে তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি শুনলাম ভারতের অর্থমন্ত্রী বলছেন, এদেশের ক্ষুদ্রশিল্প ও হস্তশিল্প বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই। বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে তাদের শুকিয়ে যেতে হবে। তাতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাসাচ্ছাদন, আশ্রয়, শিক্ষা সব বাতিল হয়ে যাবে সে কথা নির্বাচিত সরকারের প্রতিনিধিদের ভাবার কথা নয়? গরিব দেশগুলিতে এমনিতেই বিদেশি ফলের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় আড়াই ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ ঠান্ডা যুদ্ধের পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আটশো বিলিয়ন ডলার সামরিক খাতেই ব্যয় করছে। চারশো বিলিয়ন ডলার মাদক দ্রব্য ব্যবসায়ে এবং ১ বিলিয়ন খরচ হচ্ছে বাণিজ্যিক প্রচারে। (এক বিলিয়ন মানে একশো কোটি, এক ট্রিলিয়ন মানে দশ হাজার কোটি) এসব ফল তাদের দেশের জিনিসপত্র কেনা, ফল পরিশোধের জন্যই দেওয়া হয়। সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে পৃথিবী জুড়ে এক নতুন মূল্যায়নের ঝোঁক এসেছিল কিন্তু অর্থনীতি নাকি তখন আর কার্যকুশলতায় চলছিল না। যে উপার্জন ঘটছিল তার থেকে খরচপাতি খুব কমতো নয়ই, অনেক সময় নাকি বেশিই হচ্ছিল। তা যদি হয় তবে সে সব উৎপাদনের কেন্দ্র বন্ধ করেই দেওয়া উচিত। অথচ ভারতে যে ফসল উৎপাদন বেড়েছে, আমরা খনির্ভর হয়েছি খাদ্যে, এর পেছনে কিন্তু কস্ট-বেনিফিটের হিসাব নেই। ধনী চাষিরা মজুর ভাড়া করে উৎপাদন করে। মধ্য ও ছোট চাষি বাড়ির বৌ-ঝিদের সহায়তায় জমি যতটা উৎপাদন দিতে পারে ততটা উৎপাদন বৃদ্ধি করে থাকে। অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী, ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের সূত্র মেনে চললে, প্রান্তিক উৎপাদন যেখানে মজুরির সমান হবে, সেখানেই আবাদ বন্ধ করা হবে। ধরা যাক, নবম ব্যক্তিটি উৎপাদন করছে দশ কিলোগ্রাম, দশম জন আট কিলোগ্রাম, একাদশতম জন ছয় কিলোগ্রাম। মজুরি যদি হয় আট কিলোগ্রাম ফসলের মূল্যের সমান, দশ জন মজুর কাজে নিযুক্ত হবে। কিন্তু যেখানে পারিবারিক শ্রম কাজে লাগানো হচ্ছে, দ্বাদশ লোকটি উৎপাদন করে হয়তো চার কিলোগ্রাম, ত্রয়োদশ জন উৎপাদন করে শূন্য কিলোগ্রাম, পরিবারটি ত্রয়োদশতম ব্যক্তিটিকেও কাজে লাগাচ্ছে। পুঁথিগত অর্থনীতি পাঠের দাম নেই পরিবারটির কাছে। এভাবেই এদেশের তাঁতের কাজ, জাল বোনার কাজ, মাছ ধরার কাজ চলে আসছে। অজস্র অজস্র জীবিকা। প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি হিসাব করলে, এদেশে দারিদ্র্য হিসাবের মধ্যেও আসবে না। সবটাই পয়সা দিয়ে হয় না। পয়সার চেয়েও ভিন্ন কিছু আছে। একটি খারাপ উদাহরণ দিচ্ছি।

এক বিবাহেচ্ছু তরুণ বিবাহ করে দেখল, তার স্ত্রীর রান্না, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার রাখা এমনকি দাম্পত্য প্রেম এবং ইত্যাদি কাজের জন্য তার খরচ হচ্ছে চার হাজার টাকা। কিন্তু রান্নার ও কাজের লোক এবং অন্যবিধ সুখের জন্য বাজারের দরের হিসাবে খরচ সাড়ে তিন হাজার টাকা। কস্ট-বেনিফিটের হার্ড হেডেড মানুষজনের কাছে বিবাহিত হওয়ার তুলনায় পয়সা দিয়ে রান্নার লোক থেকে নর্ম সহচরী

রাখারই সুপারিশ করা হবে। কিন্তু আমরা জানি, অর্থনীতিই সব কিছু নয়। বাকি অনাবিষ্কৃতও আছে। বাকি অন্য কিছুটাই হিউম্যান। কস্ট-বেনিফিট হিসাবটা ডিসমাল সায়েন্সের। ম্যানরের দর্শনের। এমনি কথা উঠেছে ভর্তুকি নিয়েও।

আগেকার দিনে ঢের যৌথ পরিবার ছিল। সদস্যরা সবাই সমান কর্মক্ষম ছিল না। কিন্তু বেশি উপার্জনকারী ব্যক্তিটির আয় থেকে কম উৎপাদনক্ষম ব্যক্তিটির ভর্তুকি হয়ে যেত। আর এমনি একটা সমাজ ছিল বলে, স্কুল-কলেজ-পুরস্কার-জলপানির মূল করপাস এসব অনেকেই নিজ ব্যয়ে সৃষ্টি করত, ছাত্র-ছাত্রী পড়বার ব্যবস্থা করত, নিজ আত্মীয় পরিজনকে দেখাশোনাটা কর্তব্যের মধ্যে রাখত।

এসব কিছুর বিনাশ হয়েছে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। আগে মূল উৎপাদনের উপায় ছিল কৃষি ও পশুপালন। প্রকৃতি মানুষের ক্ষুৎপিপাসা দূর করার উপকরণ এমনিই হিসাবের মধ্যে রেখেছিল মোটা ভাত-কাপড়ের নিরিখে। অর্ধোলঙ্গ দেশে অতিজন-সমস্যাটি সেদেশের কৃষি থেকে উদ্ভূত নয়। পশ্চিমী দেশে শিল্প বিপ্লবের সমস্যা থেকে উদ্ভূত। শিল্প বিপ্লবের সমমানসম্পন্ন অফুরন্ত পণ্যভোগের দৃষ্টান্ত। এজন্য প্রকৃতির গুপ্ত ছিদ্র করে যেমন খনিজ লুঠ করেছে, তেমনি কৃষি উৎপাদনের সরল পন্থাকেও বিপর্যস্ত করেছে। বলেছে, প্রকৌশল শ্রমের চাপ লাঘব করবে। আসলে হয়েছে তা মুনাফা বৃদ্ধির হাতিয়ার, ভিন্ন দেশের জীবনকে পর্যুদস্ত করার বাহন এবং মাটি সমুদ্র ও মহাকাশ বিষাক্ত করার উপকরণ। এই শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রি শ্রম বিভাজনের তাৎপর্যে ব্যক্তিকে বিখণ্ডিত করেছে। এই বিখণ্ডিত, উৎপাদন বিষয়ে অর্থজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে ভোগের অজস্র উপায় তুলে দিয়েছে, অর্থনীতির হিসাব অনুযায়ী ক্রয়শক্তি দিয়েছে টাকায়, টিভি-রেডিও-খবরের কাগজ কচি সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিমানুষ সমাজচ্যুত হয়ে এক ভোগী এককে পরিণত হয়েছে। শিল্পপণ্য ভোগ করার অতি ইচ্ছা, কি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন কি মার্কিন দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মুগ্ধ করেছে। এক পাপচক্র তৈরি হয়েছে। ভোগ করলে নাকি উৎপাদন হবে। উৎপাদন চালু থাকলে কর্মসংস্থান থাকবে, টাকায় আয় পাবে। টাকায় আয় পেলে ভোগ করতে পারবে। ঐ ভোগ বাড়াবার নামই ধনী হওয়া। যে দেশ যত ধনী সে দেশ তত এই পাপচক্রে বন্দী। সমাজতন্ত্রে টেকনোলজিতে ভোগ বৃদ্ধির উপায় হিসাবে, কস্ট-বেনিফিটের প্রজাতি ছিল না। ফলে স্বধর্ম ত্যাগ এবং বিপরীত স্বভাব উপস্থাপনের দাক্ষিণ্যে সোভিয়েতে সমাজ শেষ হয়ে গেছে। ভারতের সমাজও নরতে বসেছে। চিনও যেতে বসেছে। সম্পদ বৃদ্ধিই সমাজতন্ত্র নয়। মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ রচনা নয়।

সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে রাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে দুই বিশিষ্ট মার্কসবাদী লেনিন ও গ্রামশির ভিন্ন মত ছিল। লেনিন চেয়েছিলেন রাষ্ট্রশক্তি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের দাপটে বাঘে-গরুতে জল খাইয়ে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র অব্যাহত রাখা। লক্ষ্য ছিল দ্রুত শিল্পায়ন, শিল্পপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠা। তবে মনে হয়, ভোগ বাসনা বিষয়ে তিনিও অনেকখানি সংযমী ছিলেন। নইলে বাথরুমের সব জলকলের দুখগুলি সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে চাইতেন না। সোনা তাঁর বিচারেও মানবিক শ্রমের তুলনায় অর্থহীনই ছিল। ১৯২০-২১ সালে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতে তাঁর একটি নিবন্ধে সমাজতন্ত্রের শিকড়ে যাবার কথা ছিল। লেখাটির নাম 'অন কো-অপারেশন।' লেখাটির কথা থাক। রুশ দেশে বিপ্লবের সময় যেমন ছিল প্রশাসনিক একক সোভিয়েত, তেমনি দেশ জুড়ে ছিল হাজার হাজার ভোক্তপণ্য যোগানদার সমবায়। ছিল জল সমবায়। এমনকি কোথাও খামার সমবায়। সমাজতন্ত্র কথাটা একেবারে নতুন কিছু ছিল না। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা গ্রামশি মনে করতেন, কমিউনিস্ট আন্দোলন আদতে শ্রমিক শ্রেণীকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করে তোলার আন্দোলন। অবশ্য সংস্কৃতি বলতে তিনি উৎপাদন কলাকৌশল, শ্রমিক সংস্থা, শ্রমিক কাউন্সিলের কাজকর্ম, এমনকি দর্শন, সাহিত্য এবং চারুশিল্প বিষয়ে সব কিছুই বোঝাতেন। এবং যে শ্রমিক তার সাংস্কৃতিক সামর্থ গড়ে তুলতে পারে, সেই পারে তার পরিবেশের উপরে আধিপত্য বা হেজিমনি বিস্তার করতে। এ শ্রমিক প্রকৌশলকে ভোগ্যপণ্যের সৃষ্টি-উপায় বলে মনে করে না, লাভ-ক্ষতির হিসাব করে না সে। পুঁজির আক্রমণ, ঐ লাভ-ক্ষতির নিরিখে মানুষকে বিচার করার ঐ পুঁজিবাদী কুৎসিত উদাহরণ বাতিল করার জন্য গ্রামশি চেয়েছিলেন, শ্রমিকের আধিপত্য রচনার উপায় হিসাবে সমবায়। এ সমবায় একটি বিকল্প অর্থ সামাজিক ব্যবস্থা নির্মাণ করে। শ্রম বিভাজনকে বাতিল করে উৎপাদন ও বিপণন চলে সমবায়ে। সমবায় দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে যৌথ জীবন যাপনের নিরিখ। এমনকি যোগাযোগ, শিক্ষণ এবং চারুশিল্প অনুষ্ঠানেও সমবায়ের ভূমিকা থাকে বিপুল। বস্তুত গ্রামশির চিন্তা অনুসরণ করে বলা যায়, সমবায় যেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক বিকল্প ব্যবস্থা। অ্যানার্কিস্ট-সিন্ডিক্যালিস্ট সোরেল শুধু ট্রেড ইউনিয়ন সিন্ডিকেটদের সাধারণ ধর্মঘটকে সমাজতন্ত্র গড়বার উপায় ভেবেছিলেন। লেনিন, বোলশেভিকদের নায়কত্বায় সোভিয়েত শাসনের শ্রমিক শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সমাজতন্ত্র। লেনিন প্রয়োজন ভেবেছিলেন, ভূমির জাতীয়করণ, জমি থেকে উদ্বৃত্ত বিনিময়ের পথে শিল্পায়ন এবং কৃষি ও শিল্পের দু-পায়ের উপরে খাড়া এক সমাজতন্ত্র। কৃষিতেও চেয়েছিলেন সমবায়। বিপণনেও। গ্রামশির কাছে ছিল যুগের স্বভাবধর্ম। বাকি তার আপন স্বার্থে বেঁচে-বর্তে অবস্থানের দাক্ষিণ্যে সাংস্কৃতিক পূর্ণতার প্রয়োজনে সমাজতন্ত্র গড়বে। সেখানে সমবায় কাজ করবে একককের মতো। এই যে নয়া উদারনীতি, ব্যক্তি-মালিকানা ও বিকরণের চাপে শ্রেণীগুলি কঠিনতর হয়ে পড়ছে, সমবায় তার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়তে পারে। গেরিলা আক্রমণের কায়দায়। ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে গেরিলা বাহিনী দিয়ে পরাস্ত করার এই পঁচিশতম বছরে এমন প্রতিজ্ঞা তো আমরা নিতেই পারি। এজন্য তো জরুরি সমবায় আন্দোলনকে নতুন সমাজ গড়ার ভিত্তি হিসাবে দেখা। তবে দেখছি, কি আবাসন সমবায়, কি বিপণন সমবায়, সবখানেই সমবায়কে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তির সম্পদ পাবার পুঁজিবাদী আদর্শ চরিতার্থ করা। যেমন বিপ্লবী আন্দোলন পরিণত হয়েছে যেনতেনভাবে ভোট বাগাবার কাজে হাতিয়ার। সমবায় হয়ে পড়েছে তেমনি এক বিক্ষোভ প্রক্রিয়ার সরকারের হাতে বন্দিনী কর্তাভজা ক্রীতদাসী। অন্ত বিস্তারের মানব দ্বেষী অভিক্রমণের বিরুদ্ধে তারই হাতে আছে শক্তিমন্ত্র। সত্যি সত্যি মানুষের সমাজ গড়ার মন্ত্রশক্তি। ❑

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ :—

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

ওল্ড কোর্ট কম্পাউন্ড , পোঃ ও জেলা - বর্ধমান

"বর্ধমান জেলার গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিগত ছয় দশক হতে চাষিভাইদের সেবায় নিয়োজিত প্রাচীনতম দীর্ঘমেয়াদি সমবায় প্রতিষ্ঠান"

নিম্নপ্রকল্পগুলি সফলের জন্য স্বল্প সুদে, স্বল্প সময়ে ও সহজ শর্তে চাহিদানুযায়ী ঋণের একমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান :—

কৃষিজ প্রকল্প :

পাম্পসেট, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, অগভীর নলকূপ, গরু ও গরুর গাড়ি, মৎস্য চাষ ইত্যাদি।

অকৃষি প্রকল্প :

উৎপাদনভিত্তিক গ্রামীণ কৃষিজ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষিজ পরিবহন, গ্রামীণ পরিবহন ইত্যাদি।

গৃহ নির্মাণ প্রকল্প :

আবাসন, ব্যবসাকেন্দ্র প্রভৃতি

অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি সুদে, সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি আমানত ও মাসিক সঞ্চয়ী আমানত প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্পগুলিতে সঞ্চয়ী মনোভাব দেখিয়ে সঞ্চয় করে আপনার ও ব্যাঙ্কের আর্থিক বুনিয়াদ মজবুত করুন। বিশদ বিবরণের জন্য এলাকার সুপারভাইজার, হেড অফিস, শাখা অফিসগুলির সহিত সরাসরি যোগাযোগ করুন।

শাখা অফিস :

সেহারাবাজার, বর্ধমান

সিটি সেন্টার, ১ নং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং (দ্বিতল) দুর্গাপুর, বর্ধমান

উপ অফিস — গুসকরা থানা মার্কেটিং অফিসের নীচের তলায়।

সুকুমার সিনহা
মুখ্য কার্যনির্বাহী

গঙ্গাধর পাল
সভাপতি

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

— *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এগ্রি. প্রোডাকশন এন্ড মার্কেটিং সোসাইটি লি.

ব্যবসা ঃ- মিশ্রসার, কীটনাশক ঔষধ, বীজ, বস্ত্র, স্টেশনারী, সাবমার্সিবল পাম্প, পাইপ, কোল্ড স্টোরেজ ইত্যাদি

হেড অফিস ঃ জি. টি রোড, মেমারি, বর্ধমান, ফোন : ২০৬

শাখা অফিস ঃ ফ্যান্সি মার্কেট (৩য় তল), জি. টি. রোড, বর্ধমান, ফোন : ৪৫৪২

হিমঘর ঃ পোঃ কেয়া, মেমারি, বর্ধমান, ফোন : ৪১১

With Best Compliments From

I P TRADING CO.

Dealers of :

I T Drill Bits, Miranda Tool Bits, Grinding Machine, Grinding Wheel & Electrodes

71/2, Sree Ram Dhang Road, Salkia
Howrah - 711 106
Phone : 654 6894, Mobile 9830055166

চটশিল্পে প্রতিনিয়ত স্থায়ী শ্রমিক সংকোচন নীতির কু-প্রভাবে
সোসাইটির অস্তিত্ব রক্ষায় ও চটশিল্পের শ্রমিকদের উপর ক্রমাগত
মালিক পক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে
আমরা সংগ্রামরত

বালি জুট মিল্‌স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৫নং শ্রীচরণ সরণি, বালি, হাওড়া
পিন কোড : ৭১১ ২০১
(বালি রেল স্টেশনের পূর্বদিকে)

শিশির চ্যাটার্জি
সভাপতি

শ্যামল্লয় বণিক
সম্পাদক

"সমবায় ব্যবসার চেয়ে সমবায় উৎপাদন বাঞ্ছনীয় পণ্য করার জন্য শ্রমিকদের কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে। প্রথমোক্তটা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শুধু উপরিভাগটা স্পর্শ করে, শেষোক্তটা তার বুনিয়াদ বিদীর্ণ করে দেয়।"

— কার্ল মার্কস

"সমবায়ের উপর নির্ভর না করলে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারব না। সমবায় সংস্থাসমূহের এক ব্যাপক সংগঠন ছাড়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব।"

—লেনিন

বালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

হেড অফিস : ৩৯৬, জি টি রোড, বালি শাখা : ঘোষপাড়া বাজার, বালি

ফোন : ৬৫৪ ২১০৮ (হেড অফিস), ৬৭১ ০১৪৪ (শাখা)

আলিস সান্যাল	দেবাশিস মৈত্র	সুধীরকুমার ব্যানার্জি
সভাপতি	সম্পাদক	মুখ্য নির্বাহী

With Best Compliments From

MST ENTERPRISES

Mfg. Of :

Cast Iron Boiler Spares for Thermal Power Station
& Stocker Coal Feed Suppliers

Cast Iron Double Flanged Pipes & Fittings (Specials)
as per IS 7181 & IS 1538 with ISI Mark

All Types of Graded Caslings as per Customers Specification and Drawings.

35C, Girish Chandra Bose Road, Calcutta - 700 014
Phone : (O) 651 8169, (R) 245 6504 / 654 3348

With Best Compliments From :

THE SANTRAGACHI CO-OPERATIVE BANK LTD.

(Estd – 1931)

(A Full Licensed Bank by Reserve Bank of India in the Service of Common People)

Regd. No. 1/1931 Howrah

R B I Licence No UBD/WB 666/P dated 22 11 86

REGD. OFFICE : KONA ROAD, SASTITALA (RAMRAJATALA)
HOWRAH - 711 104, PHONE : 667-2170

BRANCH AT BUXARAH (OPPOSITE BUXARAH HIGH SCHOOL)

SALIENT FEATURES :

- Loans, overdrafts and all types of advances made on reasonable terms and conditions.
- Loans against pledging of Gold Ornaments, N.S.C K.V.P L.I.C Policies etc
- Safe deposits locker facility
- Holiday Home at Puri, Digha (Old and New)
- Participation in clearing of sub-member of Calcutta Bankers' Clearing House
- Morning and evening transaction facilities.

CUSTOMERS' SATISFACTION IS OUR MOTTO

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM .

BHOWANIPUR COOPERATIVE FEE CAR PARKING SOCIETY LIMITED

21/4, DHIRENDRA NATH GHOSH ROAD
CALCUTTA - 700 025

ফোন নং - ০৩২২৪-৮৬৩৩৪

পল্লীশ্রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

চৈতন্যপুর :: মেদিনীপুর :: হলদিয়া

চৈতন্যপুর মোড় হইতে বালুঘাটাগামী রাস্তার পার্শ্বে

- রুচিসম্মত তাঁত, মিল ছাপা শাড়ি ও ধুতি, প্যান্ট পিস, লুঙ্গি ও মার্কিন থান। এছাড়াও রেডিমেড পোষাক ও বেবিফুড পাইবার অতি বিশ্বস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান।
- বিভিন্ন প্রকার আমানত প্রকল্প চালু আছে।
- স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী' গঠিত হয়েছে। নাম — **মাতঙ্গিনী স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী**

সুবোধকুমার দাস	তুষারকান্তি কর	বিশ্বনাথ দাস
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

United Bank of India Employees' Co-op. Credit Society Ltd.

4, Narendra Chandra Dutta Sarani, Calcutta - 700 001

Phone : 220 0841, Fax : 221 2914

NOW OFFERS

Loan to Members	**Max. Amt.**	**Rate of Intt.**
Long Term Loan	Rs. 60,000.00	10% p.a.
Utility Loan	Rs. 2,000.00	—
Fixed Deposit		
For 6 months		9% p.a.
For 1 Year and above		11% p.a.
Savings Deposit		7% p.a.

AND RUNS

Holiday Homes for its members and 'their families and outsiders at : –
Puri ◆ Rajgir ◆ Calcutta ◆ Digha ◆ Deoghor ◆ Ghatsila ◆ Gangtok ◆ Mussouri ◆ Peiling ◆ Darjeeling ◆ Hardwar ◆ Chennai ◆ New Delhi.
◆◆ Bakkhali Holiday Home will be opened soon ◆◆

Sri Bijay Kr. Sen
Chairman

Sri Samir Kr. Nandi
Managing Director

বিবেকানন্দ সমবায় বেত ও বাঁশ কারুশিল্প সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং : ১৪/১৯৮৩-৮৪, দঃ ২৪ পরগণা

(রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত)

স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর, কলিকাতা - ৩২

বেত ও বাঁশের বিভিন্ন ডিজাইনের ফার্নিচার, পূজা প্যান্ডেল, ইনটেরিয়র ডেকোরেশন, রকমারী স্টুল, মোড়া, আয়না, র‍্যাক, শেলফ, প্ল্যানটার হোল্ডার, লাঠি এবং ডিজাইন অনুযায়ী যে কোনও দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট মান বজায় রেখে যত্ন সহকারে তৈরী করা হয়।

"দরিদ্র ও পদদলিতদের আমরণ সহানুভূতি ও সহায়তা করতে হবে — এই-ই আমাদের মূলমন্ত্র।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

হলিডে হোম

দিঘা

পুরী

ও

দার্জিলিং

যোগাযোগ করুন

সি এম ডি এ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

উন্নয়ন ভবন ❖ ১ম তল ❖ বিধাননগর

কলিকাতা - ৭০০ ০৯১ ❖ দূরভাষ : ৩২১-৭৯৮৪

পুরীর সমুদ্রতীরে আমাদের

"হলিডে হোম"

আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

ট্রান্সপোর্টেশন ডাইরেক্টরেট (ফুড) এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ (৭ম তল)

১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলিকাতা - ৮৭

ফোন : ২৪৬-০৬৬২

পুরীতে সপরিবারে থাকার জন্য

দে'জ মেডিক্যাল হলিডে হোম

সমুদ্রের ধারে ❀ বিছানা বাসন সবই আছে ❀ খরচ বেশি নয়

যোগাযোগের ঠিকানা

দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

২০এ, লিন্ডসে স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৮৭

হলিডে হোম

সৈকতাবাস (পুরী)

স্বর্গদ্বার — অনন্তসায়ণ মন্দির সংলগ্ন চার শয্যাবিশিষ্ট সকলরকম সুবিধাসহ অত্যাধুনিক ২টি ঘর।

হোটেল মায়া প্যালেস (দার্জিলিং)

ম্যাল সংলগ্ন

চার শয্যাবিশিষ্ট সকল রকম সুবিধা সহ ২টি ঘর।

যোগাযোগ

ফুড ডাইরেক্টরেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

১১ এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা - ৮৭

দূরভাষ : ২৪৬-৮২১০

With Best Compliments From :

BENOY BHUSHAN RAHA
Chairman

BHANUPRAKASH DEY
Secretary

TUFANGANJ L. S. COOP. MARKETING SOCIETY LTD.

P. O. - TUFANGANJ,
DIST COOCHBEHAR

কর্মজীবনের গতানুগতিকতা থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে কল্লোলিত সমুদ্রতটের সন্নিকটে আমাদের সু-স্বাচ্ছন্দ্য **পুরীর হলিডে হোমে** *আপনার সপরিবার অবসর বিনোদন কামনা করি।*

যোগাযোগ করুন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রাজবাটি, বর্ধমান (৭১৩১০৪)

কলিকাতা মহিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

১৭, কর্নেল বিশ্বাস রোড, কলিকাতা - ১৯

পূর্বভারতে একমাত্র মহিলা পরিচালিত ব্যাঙ্ক। সমস্ত রকম আমানতের উপর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চাইতে ১/২ শতাংশ ইন্টারেস্ট বেশি। এন এস সি, কে ভি পি, আই বি পি, এল আই সি, এম আই পি মরগেজ করে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়।

ছোট গল্প

স্পন্ডেলাইটিস

দিব্যেশ লাহিড়ী

স্টেশনে নেমেই হোঁচট খেল অবিনাশ।

এ কোন স্টেশন! ভুল করে অন্য কোথাও নামেনি তো? ধুর — তাই কখনও হয় নাকি! ওই তো লোহার খুঁটিটা, সিমেন্টের পাকা বেঞ্চ, দরজার পাশে ওজন-যন্ত্র সবই হুবহু আগের মতই আছে — তাহলে? কিন্তু এত বড় একটা সদর শহরের জমজমাট স্টেশনে লোক নামল কটা? আর যে ক'জন নামল তারা মুহূর্তমধ্যেই বা উধাও হল কোথায়? লোডশেডিং-এর ফলে গোটা চত্বরটা জুড়েই কেমন যেন একটা ভৌতিক পরিবেশ। গা ছম-ছম করা নিস্তব্ধতা। ঘুরে — স্টেশনের কাছে টিমটিম করে একটা বড় চিমনির বাতি জ্বলছে। সে চিমনিতে প্রচুর কালি। ঘোলাটে আলোয় স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। ট্রেনটি ছেড়ে যেতেই চারপাশটা যেন আরও থমথমে—কোথায় যেন একটা কুকুর কান্নার মত ডাকছে। একটা পেঁচার কর্কশ ধমকও বোধহয় ভেসে এল। ওভার ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি চটি ঘষটে ঘষটে এদিকে আসছে। গা শির শির করা সে শব্দে মনে হচ্ছে লোকটা বোধহয় খুব কষ্ট করে হাঁটছে। পায়ে চোট আছে। লোকটা এবারে সিঁড়ি দিয়ে নামছে আর ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। স্টেশন অফিসে টেলিফোন বাজছে। অনেকক্ষণ বাজার পর কেন তুলে কে যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে বলল, — খবর পেলে? অ্যাঁ! কত চেষ্টা করেও পাচ্ছ না? কি আর করবে বল চুপ করে বসে থাক — বুঝলে? আরে না না, পাঠিও না। সব শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে।

সুটকেসটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে অবিনাশ একটু দাঁড়াল। লোকটা কেনে কোন্ খবর জানতে চাইছিল? কি পাঠাতে বারণ করল? সব শেষ হয়ে গেছে — এ কথার মানে কি? কি শেষ হয়ে গেছে? কেন শেষ হয়ে গেছে? — তা জেনে তোমার লাভ? লাভ-লোকসানের কথা নয়, আসলে এই অন্ধকারে ফাঁকা ঘরের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ ভুতুড়ে গলায় বলে ওঠে — সব শেষ হয়ে গেছে। তাহলে কি তোমার একটুও কৌতূহল হবে না? একবারও কি ইচ্ছে করবে না ওই শেষ হয়ে যাওয়া বস্তুটি কি তা জানবার?

ঝুঁকে ভারী সুটকেসটা তুলে খাড়া হতেই অবিনাশ চমকাল। সামনে দাঁড়িয়ে কালো কোট গায়ে একজন। — আপনার টিকিট।

বুকের মধ্যে কাঁপন ধরল, গলায় ক্যালার হওয়া রুগির মত অস্পষ্ট ফিসফিসে স্বর। কালো কোট না পরলে বোঝাই যেত না যে টিকিট চাইছে। টিকিটটা দিতে গিয়েই নজরে পড়ল, লোকটার গলায় একটা চওড়া সাদা বেল্ট।

ইতিমধ্যে সেই চটি ঘষটানো লোকটাও অনেকটা কাছে চলে এসেছে। গেটের সামনে আসতেই ম্লান আলোয় অবিনাশ দেখতে পেল তার চাউনি কেমন ফ্যাকাসে। ভাবলেশহীন। লোকটি কি অসুস্থ, না নেশাখোর? আর কি আশ্চর্য দেখ, তার গলাতেও জড়ানো একটা চওড়া সাদা গলাবন্ধ!

বাইরে এসে কোন টাউন-বাস বা রিক্সা দেখতে না পেয়ে প্রথমে অবাক তারপরে বিরক্ত ও চিন্তিত হল। একে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি, তার ওপরে ঘরের দরজায় এসে এই বিপত্তি — আর সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি? একি সেই শহর, না মৃত শহর? না কি শহরে হরতাল চলছে কিংবা কারফিউ জারি হয়েছে! তিন তিনটি বছর বাদে এ কি রকম অভ্যর্থনা! বাড়ি ফেরার খুশিমাখা উত্তেজনাটা স্টেশনে পা দেবার পর থেকেই কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে। এমন হওয়ার তো কথা ছিল না। গোটা পরিবেশটাই যেন ষষ্ঠেন্দ্রিয়কে সতর্ক করে দিয়ে বলছে — সাবধান, সাবধান।

ভারী সুটকেস ও ব্যাগটাকে রাস্তায় নামিয়ে রেখে অবিনাশ ভাবল। এখন কি করে বাড়ি পৌঁছনো যায়? ভারী মাল নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু উপায় কি? যেতে যখন হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কি?

এই সময়ে একটা শব্দ কানে ভেসে আসতেই টন টন হয়ে সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল আস্তে আস্তে একটা রিক্সা আসছে। ওটা রিক্সাই তো না অন্য কিছু! কিন্তু সত্যি সত্যিই কি আসছে, না দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে? ঘুরে গাছের নীচে ওটাকে একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত দেখাচ্ছে। চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। অস্পষ্ট বাড়ি ঘর দোকান রাস্তা কেমন নিরুম, নির্জন, আলোহীন। এ যেন ঠিক মাঝরাতের কোন ঘুমন্ত শহর। মনেই হচ্ছে না যে ঘড়ির কাঁটা সবে সাড়ে সাতটায়। এ নির্জনতার কারণ কি? বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল কপালে। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ভয়ঙ্কর খবর হওয়ার মত কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা দুর্যোগ কি ঘটেছে এ শহরে? ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনা, উত্তর কাশীর ভূমিকম্প, কালাহান্ডির দুর্ভিক্ষ, শ্রীনগরের বিস্ফোরণের মত — না সবাই পালিয়েছে এক অজানা আতঙ্কে! ওই লোকটি যেনে একটু আগে বলল, সব শেষ হয়ে গেছে। তার মানে কি সবাই শেষ হয়ে গেছে! কেউ বেঁচে নেই? যদি তাই হয়, তাহলে —

গা-টা শির শির করে উঠল। দীর্ঘদিন পরে বাড়ি ফেরার আনন্দটা মুহূর্ত মধ্যে উঠে গিয়ে যেন একটা ভয়ের কুলকুলে ব্যথা শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে নামতে লাগল।

গাছতলায় সেই জন্তুটা এবারে যেন গা-ঝাড়া দিল। রিক্সাটা আসছে। কিন্তু অত আস্তে আস্তে কেন? মাঝে মাঝে কি থেমে যাচ্ছে! সামান্য এটুকু আসতে কি এত সময় লাগে! নিশ্চয়ই ভাড়া না যাওয়ার মতলব। কিন্তু ডাকার আগেই অবাক করে রিক্সাটা ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল। এরকম ঘটনা অন্তত এ শহরে আগে কখনও দেখা যেত না। এখন হয়তো দিন বদলেছে, চরিত্র বদলেছে। তাই না ডাকতেই এসে গেছে। কিছুটা সন্দেহ ঝেড়ে মরলেও একটু নিশ্চিন্ত ও খুশি হল অবিনাশ। যথাসম্ভব মোলায়েম করে জিজ্ঞেস করল, — ভাড়া যাবে নাকি ভাই?

রিক্সাওয়ালাটা বিড় বিড় করে কি যে বলল ঠিক বোঝা গেল না। এদিক ওদিক বার কয়েক তাকাল। ঘাড়ের ওপর রাখা গামছাটা দিয়ে মুখ মুছল। গলাটাকে আরও নরম করল অবিনাশ, — খুব মুষ্কিলে পড়েছি। অনেকদূর থেকে আসছি।

লোকটা পা পা করে এক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। তারপরে যেন আপাদমস্তক জরিপ করে মাথাটা সামান্য নাড়ল।

কি বলতে চাইছে লোকটা? ও কি যাবে, না যাবে না? যদি নাই যাবে তবে এখানে এসে দাঁড়াল কেন? ওকে তো একবারও ডাকা হয়নি! প্রায় পা ঘেঁষে দাঁড়ানোয় ওর প্রতিটি নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাতে আরও অস্বস্তি বাড়ছে।

অবিনাশ শেষ চেষ্টা করল। —তুমি না এলে ভাই খুব বিপদে পড়ে যেতাম। মুখটাকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে লোকটা চাপা গলায় বলল, — এ সময়ে কেউ আসে না। উঠুন।

বুক করে বসতে না বসতেই রিক্সা ছুটল সাঁই সাঁই। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি! একটু আগেই লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল রিক্সা টানতে তার ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে। আর এখন ভীত কুকুরের মত ছুটছে! তা ছুটুক, যত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় ততই ভাল।

রাস্তায় একটিও লোক নেই। বাড়িঘর দেখে মনে হচ্ছে সব যেন পরিত্যক্ত। সত্যিই এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! রাত আটটা বাজতে না বাজতেই সব খাঁ খাঁ! কারণটা কি! এরকম তো হওয়ার কথা নয়। যেনেও লোকটা ওরকম কথা বলল কেন! চুপ করে বসে থাকলেই কি সমস্যা মিটে যাবে?

কোন প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে পেল না অবিনাশ। একটা অজানা আশঙ্কা কেন মাথার মধ্যে কাঁপতে লাগল। এ নির্জনতা নিস্তব্ধতা কেন? কোন দৈত্যের মরণকাঠির ছোঁয়ায় সবাই ঘুমিয়ে! এ ঘুম কি কোনদিন আর ভাঙবে না? দূর — তাই কখনও হয় নাকি!

দুটো বাড়ির ফাঁকে এক ফালি চাঁদ হঠাৎ নজরে পড়তেই দুশ্চিন্তার বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল? সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝিরঝিরে হাওয়ার মত একটা মিষ্টি সুর মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ঠোঁটের ওপর জিভ বোলাল অবিনাশ। চৈতালি এখন কি করছে? নির্দিষ্ট তারিখের আগে দেখতে পেয়ে কি খুব অবাক হবে? অস্ফুটে বলে উঠবে কি, ওমা তুমি! আমি ভাবলাম —। বাইশের চৈতালি পঁচিশে কেমন? আগের মতই চোখে মুখে কথা, না শান্ত? আচ্ছা মনে কর, গিয়ে দেখলে চৈতালি আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে। কিন্তু তোমাকে দেখে যেন চিনতেই পারছে না, কিংবা কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে — তখন তুমি কি করবে? কি আর করব — চিৎকার করে দিনেমার নায়কের মত গান ধরব আজি এসেছি, এসেছি বধূ হে। হেসে ফেলল অবিনাশ। পরমুহূর্তেই আঁৎকে উঠল। রিক্সাটা এত জোরে যাচ্ছে কেন? আর কোথায়ই বা যাচ্ছে? মাঠের পাশের রাস্তাটা ধরলে দূরত্ব অনেক কমে যেত। এ রাস্তায় যাওয়ার মানেই বেশ কিছুটা দেরি। লোকটা কি রাস্তা চেনে না! আর এত জোরে রিক্সা চালানোর শক্তি ও পাচ্ছে কোথা থেকে! একটু আগে যে ধুঁকছিল সে এখন তীব্র বেগে কি করে ছুটছে। — এই, শুনছো?

রিক্সাওয়ালাটা কোন উত্তর দিল না।

মনে মনে চটল অবিনাশ। — তুমি ঘোড়া পথে যাচ্ছ। কথাটা কেন ওর কানেই গেল না। — কি ব্যাপার বল তো?

— বলছি, একটু পরে। এই জায়গাটা আগে পার হয়ে নিই। হাঁপাতে হাঁপাতে খাসখেসে গলায় এতক্ষণে জবাব দিল লোকটা।

অবিনাশ আর কিছু বলল না। বিরক্ত হল। কিছুক্ষণ পরে প্রাইমারি স্কুলটার কাছে আসতেই লক্ষ্য করল লোকটার দম ফুরিয়ে গেছে। আর টানতে পারছে না। হা করে নিশ্বাস নিচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে এখুনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে। রিক্সাটা থামিয়ে চোখ-মুখের ঘাম মুছল সে। বিড় বিড় করে কি সব বলল। দু'বার থুথু ফেলল। তারপরে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে প্যাডেলে চাপ দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলল, — আপনে হয়তো আমার উপর রাগ করছেন।

— না না, তা করবো কেন। মানে তোমার অযথা ঝামেলা হবে ভেবে আমি ওই রাস্তায় যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল অবিনাশ।

— আপনের কপাল ভাল। আমারও। ওই জায়গাটা — থুবড়েন ছিল। — এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বলল, খুব খারাপ। ওই মাঠে প্রায় প্রতিদিন খুন হয়। মেয়েছেলের উপর অত্যাচার হয়। গতকালও তিনজন নিরীহ প্যাসেঞ্জার ওখানে খুন হয়েছে।

— সে কি! খামোখা খুন! তা কি করে সম্ভব?

— বিশ্বাস করেন, প্রতিদিন সকালেই ওখানে দু-তিনটে লাশ পাওয়া যায়। এই তো গত মঙ্গলবার বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের ছেলের কাটা মুন্ডু পড়েছিল।

— কারা এসব করে? আর কেনই বা করে?

— কেন তা জানি না, তবে শুনি অপছন্দ হলেই নাকি শেষ করে দেয়।

— কে শেষ করে দেয়?

— আপনে সত্যি জানেন না? লোকটার প্রশ্নে অবিশ্বাস।

অবিনাশ মাথা নাড়ল, — আমি বাইরে থাকি। অনেকদিন পরে ফিরছি।

— তাই বলেন। — এতক্ষণে যেন বিশ্বাস হল। গলাটাকে যথাসম্ভব খাটো করে দেহটা ঘুরিয়ে বলল, — ফুটো বালতির দলের লোকেরাই এসব করে।

— ফুটো বালতি। সে কে? নামটা তো —

— হ্যাঁ বাবু। ফুটো বালতি। ওর বাবা নাকি আগে ফুটো বালতি সারাতো, তাই সবাই ওকে ওই নামে চেনে। ইস্কুলে একটু-আধটু পড়াশোনাও করেছে। এখন তো রাজা। ওর দাপটে সবাই অস্থির। শুনছি এবার নাকি ভোটে দাঁড়াবে। টাউনের বাবুরাও নাকি তাই চাচ্ছে।

— পুলিশ ওদের ধরে না?

— পুলিশ! শোনেন তাহলে। গলার স্বরে মনে হল লোকটা এতক্ষণে সহজ হয়েছে। — এস পি সাহেব এক দিদিমণির ঘরে রাত কাটিয়ে সকালে উঠে উর্দি পরতে গিয়ে দেখে তার পিস্তল নাই। খোঁজ খোঁজ তোল-পোল ব্যাপার। নাহ্ — কোথাও নাই। সাহেব শেষে দুটিয়ে পড়ল ফুটো বালতির পাশে। বাপ আমার — চাকরিটা বাঁচা! পিস্তল পাওয়া গেল।

— বল কি! অবিনাশের বিশ্বাস হল না।

— হ্যাঁ বাবু, পুলিশরাই তো ফুটো বালতিকে মাথায় করে রেখেছে। ওকে ধরলে মোটা মাসোহারা পাবে কি করে? তাছাড়া পার্টির চাঙড়া নেতারাও ওর কাছে ঘুরঘুর করে। সুতরাং ওকে হাজতে পুরবে কে? গোটা এলাকায় ফুটো বালতির মস্তানরা ছড়ায়ে আছে। সব ভদ্দরলোকের ছেলে। ওদের হাতে কত বোমা-পিস্তল জানেন? সিনেমা হাউসের টিকিট ব্ল্যাকই শুধু না, উকিল-ডাক্তার থেকে শুরু করে বেশ্যার রোজগারেও ওর ভাগ আছে। বড় বড় ঠিকেদারি সব ওর।

অবিনাশ অবাক! — এসব সত্যি!

— বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন আপনে। আমাকে কত দিতে হয় জানেন? রোজ পাঁচ টাকা। তারপরে মালিকের জমা। — কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর লোকটা আবার মুখ খুলল, — মেলা টাকা করেছে। গোটা জেলার মালিক হওয়া কি সোজা কথা! ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী এসেছিল এখানে, সঙ্গে রাজেশ খান্না আর সারিকা। দুপুর থিকে কাতারে কাতারে লোক। প্রধানমন্ত্রীর গলায় সব থিকে বড় মালা কে দিয়েছিল জানেন? ওই ফুটো বালতি।

— লোকেরা কোন প্রতিবাদ করে না?

— কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে! ওর জমানায় সবাই তো ফুর্তিতেই দিন কাটাচ্ছে। ফুর্তি না থাকলে সিনেমার এত ভিড় হয়। একশো টাকার টিকিট কেটে মাঝরাতে বুলু-ঝুমি দেখতে ছোটে! কাকে ধাবড়াতে হবে, কাকে খতম করতে হবে, কাকে মিনিসিপালটির চেয়ারম্যান করতে হবে, কার গড্ডাপাত করতে হবে স-ব তো ওই ঠিক করে দেয়। মরছি শুধু আমরাই। আমাদের পয়সাও নাই — ফুর্তিও নাই। দিনের বেলা তো যেমন-তেমন কাটে। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই রাস্তায় কেউ ওরে বাবায় না। কি খাব আমরা বলতে পারেন?

কি উত্তর দেবে অবিনাশ? স্টেশনের ওই লোকটার মত কি বলবে — কি আর করবে বল? চুপ করে বসে থাক। এই রিক্সাওয়ালাটার কথা কতটা সত্যি সেটা আগে জানা দরকার। এমনও তো হতে পারে যে, বেশি ভাড়া আদায়ের জন্যে ও একটা মনগড়া ভয়ের গল্প ফেঁদে বসেছে! কিংবা অল্প-স্বল্প নেশা করেছে বলে যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে!

বাঁকটা ঘুরতেই চৌরাস্তার মোড়ের আলো দেখা গেল। ভট ভট শব্দে জেনারেটর চলছে। টেপে 'কহো না প্যার হ্যায়' বাজছে। কিন্তু কোথাও কোন মানুষ নেই। কোন দোকান খোলা নেই। ধারে কাছে একটা কুকুরও নেই।

রিক্সাটা একদম দাঁড়িয়ে গেল।

আর দাঁড়ানো মাত্রই কোথা থেকে দুটো আটো-সাঁটো পোশাকের যুবক সামনে এসে খাড়া হল। দু'জনেরই কান কপাল চুলে ঢাকা। গলায় রুপোর চেন। গালে অল্প দাড়ি। একজনের হাতে একটা প্লাস্টিকের মাঝারি সাইজের বালতি, আর একজনের হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ।

— কই রে ভ্যা, চটপট হুড়কা দেখি।

রিক্সাওয়ালা অবিনাশকে বলল, — পাঁচটা টাকা দেন বাবু।

— কেন? অবিনাশ ভুরু কোঁচকালো।

— অরে ধ্যাবড়া , এ যে কেন বলছে!

ধ্যাবড়া একটু কাছে এল। — এটা তোলা। শহরের উন্নতির জন্যে এটা নেয়া হয়। যে এ টাউনে ঢুকবে তাকেই দিতে হবে। আপনি বোধহয় বাইরের লোক!

অবিনাশ গম্ভীর হল, — এখানেই আমার বাড়ি।

— তাহলে সিস্টেম জানেন না কেন? নির্ঘাত অনেকদিন বাইরে ছিলেন। ঠিক কি না কানু?

মাথাটা একটু কাত করল অবিনাশ।

— বাড়িতে আপনার ওয়াইফ আছে নিশ্চয়ই। তার কাছে রাত কাটাবেন তো?

— চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল অবিনাশ। কিন্তু রিক্সাওয়ালার ভীত চোখের দিকে চোখ পড়তেই ঘাবড়ে গেল, মানে — ব্যাপারটা ঠিক—

— ব্যাপারটা সোজা, লে কানেলা। কানু — চাটটা বের করে দেখা তো।

বালতির মধ্যে থেকে একটা মোটা কাগজ বের করে দিল কানু।

— এই দেখুন। বিয়ের পার্টি পাঁচশ টাকা, মন্ত্রীর পার্টি আড়াইশ' টাকা, ব্যবসাদার দশ টাকা, চাকুরে দু'টাকা, ঠিকেদার এক টাকা, দালাল এক টাকা, ডাকাত এক টাকা, গুন্ডা পঞ্চাশ পয়সা, চোর-ছোচ্চর চারশ-বিশ ও নেতা প্রত্যেকে পঁচিশ পয়সা, বউয়ের কাছে যাওয়া পাঁচ টাকা, রাখনির কাছে যাওয়া দেড় টাকা, ভিখিরি পাঁচ সিকে, মাতাল তিরিশ পয়সা, গরির জন্যে ফ্রি ফ্রি দল বদলানো দেশপ্রেমী পনেরো পয়সা — আরো আছে।

অবিনাশ সুর বদলাল, — বাহ্, চমৎকার।

— তাহলে মালটা ছাড়ুন কানু। কানু সেই বালতিটা তুলে ধরল।

— আপনি স্যার সমঝদার জেন্টলম্যান।

— এসব ঝিমু তো ভালোর জন্যেই। অবিনাশ ধ্যাবড়ার চোখে চোখ রাখল। —কাল সকালে টাকাটা দিলে কি খুব অসুবিধা হবে ভাই! এই রিক্সার ভাড়াই আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে যা ছিল তা রাস্তাতেই —

ধ্যাবড়া থমকাল, — সত্যি নেই!

অবিনাশ একটু হেসে মাথা নাড়ল। — থাকলে দেব না কেন ভাই?

— ঠিক আছে। তাই হবে। — হাত নেড়ে রিক্সাওয়ালাকে যেতে ইশারা করল।

দাঁতে দাঁত ঘষল অবিনাশ। এসব অত্যাচার লোকে মুখ বুঁজে সহ্য করছে কিভাবে? কেউ কি তলিয়ে ভাবছে না? প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতারা কি অন্ধ, না বখরার লোভে যেমন চলি তেমন চলি! মানুষের চরিত্রে ক্রীতদাস-সত্তা কি আবার ফিরে আসছে? যদি তাই হয় তাহলে তোমার ছেলে বাঁচবে কি করে? কি শিখবে তোমার কাছে? কি জবাব দেবে তাকে? বলতে পারবে কি যে, সব শেষ হয়ে গেছে!

চিন্তায় বাধা পড়ল। একটা জিপ আসছে। কার জিপ কে জানে।

যাই হোক না কেন এতক্ষণে যেন জীবনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। শহরের ঘুম কি একটু একটু ভাঙছে? সামনা-সামনি হতেই জিপটা দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ জিপ। একজন এস-আই দেহটা কোনরকমে বের করে বলল, — সব ঠিক আছে তো?

রিক্সাওয়ালা দেহটা একটু কাত করল।

অবিনাশ দেখল এস-আই-এর ঘাড়ে একটা মোটা সাদা বেল্ট জড়ানো। বাড়ির গলির সামনে এসে রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিতে গিয়ে সত্যি সত্যিই চমকে উঠল অবিনাশ! ভয়ও পেল একটু। ষষ্ঠেন্দ্রিয় সজাগ হল — সাবধান, সাবধান। মুখ মেরজুর জন্যে কাঁধ থেকে গামছাটা নামাতেই স্পষ্ট দেখতে পেল, রিক্সাওয়ালার গলাতেও একটা চওড়া সাদা বেল্ট।

বাড়িতে ঢুকতেই চৈতালি বলল, — আমি জানতাম তুমি আজ আসবে।

— কি করে জানলে?

— তোমাকে জানি বলে। চৈতালি হাসল।

— বাবা কোথায়?

— শুয়ে পড়েছেন। শরীরটা ভাল নয়।

— অখিল কোথায়? ও কোন্ পোস্টে কিসে চাকরি পেয়েছে?

— ওর ফিরতে রাত হবে। চাকরি পেয়েছে একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে — অ্যাকাউন্টেন্ট। কালই বলছিল দাদা কবে আসবে।

— আচ্ছা, রাস্তায় একটাও লোক দেখলাম না কেন বল তো?

— ওমা, সন্ধ্যার পর রাস্তায় লোক থাকবে কেন। কেউ তো বেরোয় না। খুব সহজভাবে বলল চৈতালি। — ছেলেরা মোবাইলি খুনটুন করে তো, তাই।

—তাই!! অবিনাশের চোখের সামনে ব্যাকড়া আর কচুর চেহারা দুটো ভেসে উঠল। ওই বালতির মধ্যে কি ছোরা পিস্তল ছিল? রিক্সাওয়ালার ভীত সন্ত্রস্ত চাউনিটাও কেন দেখতে পেল। লোকটা তাহলে মিথ্যে বলেনি কিন্তু। অকারণেই ওর প্রতি সন্দেহের মেঘ জমেছিল। কিন্তু ঘাড়ে জড়ানো সাদা সার্জিক্যাল কলারের রহস্যটা কি? ওটা কি ফ্যাশান, না প্রয়োজন? না অন্য কিছুর চিহ্ন?

খাওয়া-দাওয়া সেরে খাটে আরাম করে বসে অবিনাশ একটা সিগারেট ধরাল। এতদিন পরে বাড়ি ফেরার আনন্দে ও উত্তেজনায় কোথায় যেন একটা ঘাটতি রয়েছে। সত্যিই কি তাই? সত্যি না হলে এরকম মনে হবে কেন? স্টেশন থেকে বাড়ি — সারা রাস্তাটাই যেন একটা দুঃস্বপ্ন। এস আই-টা তখন জিজ্ঞাসা করছিল — সব ঠিক আছে তো? কোন্ জিনিসটা ঠিক থাকার কথা বলছিল? রিক্সাওয়ালাটাই বা দেহ কাত করে কি ঠিক আছে জানাল?

চৈতালি ঘরে ঢুকে বলল, — একটা সুখবর তোমাকে দিতে পারি।

অবিনাশ স্থির দৃষ্টিতে চৈতালিকে দেখল। আগের চাইতেও অনেক বেশি সুন্দরী হয়েছে। একটু মোটা এবং ফর্সা। সারা অঙ্গে একটা সুখী তেলতেলে ভাব, — বল, কি সুখবর? ব্লাউজের কাপড় লাগছে বেশি, এই তো?

— যাহ্, তুমি না —। লজ্জা পেল চৈতালি।

— তাহলে?

— বাবার পেনশন শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

— তাই নাকি! কি করে?

— তিন হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে।

অবিনাশ কাত হয়ে গেল। — বাবা শেষে ঘুষ দিলেন! আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলে তো আপনা আপনিই হয়ে যেত।

— বাবার তো অনেকই হয়েছে, জানাশোনা ছিল, তাই। সেন জেঠুকে ছ'হাজার দিয়ে বের করতে হয়েছে। ওটুকু খরচ না করলে কি চলে? সবাই তো এভাবেই কাজ হাসিল করছে। অখিলের কথাই ধর না। ও যদি —

— বাদ দাও। কি হবে ওসব শুনে? অবিনাশ হাই তুলল।

পরদিন সকালে বাবার মুখোমুখি হতেই অবিনাশ হতভম্ব হয়ে গেল! তাঁর গলাতেও একটা বন্ধনী।

অখিলের গলাতেও একটা।

একটা অজানা ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ সাংক্রামক ব্যাধি এল কোথা থেকে? কাল রাতে চৈতালি বলছিল ওর শিরদাঁড়াতেও নাকি আজকাল প্রায়ই একটু একটু ব্যথা হয়। ওকেও কি শেষ পর্যন্ত-। আর ভাবতে পারল না অবিনাশ। দারসারা কয়েকটা কথাবার্তা কোনরকমে বলেই একেবারে সোজা এসে দাঁড়াল সদর রাস্তায়।

আর সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখতে পেল সেই ভয়ঙ্কর আশ্চর্য দৃশ্য!

প্রায় প্রতিটি বয়স্ক মানুষের ঘাড়েই সার্জিক্যাল কলার!!

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী কেউ বাদ নেই! কারো গলায় বেল্ট, কারো কোমরে, কারো বা বুক-পিঠ জুড়ে ধাতু বেল্টনি, কেউ বা লোহার খাঁচার মধ্যে টলতে টলতে হাঁটছে। শুধু বাচ্চারাই বাদ।

অবিনাশ ভয় পেল। এ কি হল! এত বড় একটা শহরের সবাই কি বিকলাঙ্গ! সবারই কি মেরুদণ্ডের অসুখ! চতুর্দিকে শুধু সার্জিক্যাল কলার, ট্রাকশান আর বেল্টের ছড়াছড়ি! এরকম হল কি করে? বিষাক্ত মদ খেয়ে অন্ধ হওয়ার মত ভেজাল তেলে কি সবার এরকম অবস্থা হয়েছে, না আর্সেনিক-দুষ্ট জলের মত আর্থিক বাতাস সবার মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিয়েছে! একটা শহর পঙ্গু। পাশের শহরের সবাই কি এই রকম? এরা কি আর কোনদিন সুস্থ হবে না, অন্তত কি আশ্চর্য দেখ! কারো মুখে কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার এতটুকু ছাপ নেই! দিব্যি সবাই হাসছে, গল্প করছে, গান গাইছে, আড্ডা মারছে, ছুটছে। এ আমি কোথায় এলাম! আমার মেরুদণ্ডও কি সংক্রমিত হবে? আর এদের রোগটা কি সত্যি সত্যিই শরীরের মেরুদণ্ডের, না মনের মেরুদণ্ডের?

— আরে অবিনাশ যে, কবে এলে?

অবিনাশ ঘাড় ঘোরাল। স্কুটারের আরোহীকে চিনতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হল। — কাণ্টুদা না?

— হ্যাঁ, তোমাকে দেখেই তো থামলাম। চিনতে পারছো না?

— পারছি। আপনি বেশ মোটা আর ফর্সা হয়েছেন। আপনার সেই ভাঙা সাইকেলটা কোথায়? ওটাতেই আপনাকে মানাতো বেশি।

— বয়েস আর রোগ দুই-ই পাল্লা দিচ্ছে। আর সাইকেল চালাতে পারি না। তাছাড়া কাজের চাপ দিনকে দিন বাড়ছে। আচ্ছা চলি, আছ তো কয়েকদিন? একদিন এস আমার ফ্ল্যাটে।

স্কুটারটা চালু করতেই অবিনাশ এতক্ষণে লক্ষ্য করল। কাণ্টুদার গলাতেও সার্জিক্যাল কলার। এই সেই কাণ্টুদা। প্রমিকদের লড়াকু নেতা। কলেজে পড়বার সময় ওঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় সারা শরীরে

নিহরণ জাগত। তাঁর আপ, তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন, তাঁর নির্লোভ চরিত্র হয়ে উঠেছিল একটি প্রচণ্ড প্রবাদ। কিন্তু আজ? কথা বলবার সময় তাঁর গৌফিন পোশাক থেকে দামি সুগন্ধ নাকে আসছিল। বোধহয় রিলিঠি সেন্ট। কিন্তু কাপ্টেন অত হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন কোথায়? ফুটো বালতির কাছে কি?

সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কোন দিক থেকেই কোন হিসেব মিলছে না। মায়াজুক কি এমন ঘটল যে এই ক'বছরে সব বদলে গেল! বিবেকানন্দ, নেতাজি, ত্রৈলোক্যনাথ, যাদুগোপাল, বাঘা যতীন কি এদেশে জন্মেছিলেন? মেরুদণ্ডের এত অসুখ কেন? শেষ পর্যন্ত কি মানুষ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী হয়ে যাবে? আর ভাবতে পারল না। এখন মনে হচ্ছে ভুল করে এ শহরে এসে পড়েছে। এখানে একজনও পরিচিত কেউ নেই। যারা আছে তারা সবাই অন্য গ্রহের বাসিন্দা।

একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি ও বিষণ্ণতা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল অবিনাশ। চৈতালি জিজ্ঞেস করল, — বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে না?

— না। অবিনাশ পায়চারি করতে লাগল।

অখিলের খোঁজে দু'জন লোক এল। তাদের গলার আওয়াজ পাওয়া মাত্রই স্যুট কেস খরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল অবিনাশ।

চৈতালি অবাক হল, — ঘরে ঢুকলে!

— আচ্ছা, যে দু'জন এসেছে তাদেরও কি মেরুদণ্ডের অসুখ!

— তার মানে!

— মানে গলার ওদের সার্জিক্যাল কলার দেখলে?

— খেয়াল করিনি। আছে বোধ হয়। চৈতালি হাসল।

— হুঁ। গম্ভীর হল অবিনাশ। স্টেশনের সেই না-দেখা লোকটি কি এই জন্যেই বলেছিল, সব শেষ হয়ে গেছে! কে জানে। আচ্ছা, মনে কর, তোমারও যদি এরকম কিছু একটা হয় তুমি তাহলে কি করবে? মেরুদণ্ডে তাপ্পি মেরে বাঁচবে, না বিনা তাপ্পিতেই এসপার-ওসপার লড়ে বাঁচবে?

চৈতালি বলল, — শোন, অখিল বেরিয়ে গেল। তুমি একটু বাগানে গিয়ে দাঁড়াও। দু'জন মজুর বেড়াটা সারাচ্ছে। সামনে না থাকলে কাজে নির্ঘাত ফাঁকি দেবে।

একটা কাজ পেয়ে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হল অবিনাশ।

বাগানে এসে দেখল দু'জন কালো মুস্কো টগবগে মজুর কাজ করছে। দিব্যি হাসি-খুশি ফুর্তিবাজ। খালি গা। ঘাম ঝরছে। পরনে সামান্য কাপড়। অবাক হয়ে দেখার মত যেটা সেটা হচ্ছে, গলায় তাদের কিছু জড়ানো নেই, বুকেও নেই। কোমরেও নেই!

অনেকক্ষণ পরে যেন অবিনাশের ফুসফুসে এক ঝলক তাজা হাওয়া ঢুকল। — তোমরা হাসছ কেন?

— কাঁদতে কাঁদতে কি কাজ করা যায় বাবু?

— তা ঠিক, কিন্তু জোর করে হাসছো না তো?

— দু-নম্বর কারবার আমাদের নাই বুঝলেন বাবু? মোষের মত খাটি, খাই, ঘুমাই। ফাঁকি দিয়ে রোজগারের ধান্ধায় কারো পারে ধরি না। কাঁদার মত দুঃখ কোথায়! আমাদের অবশ্যি দুপুরজনও ভরায়। — হো হো করে হাসতে লাগল মজুর দু'জন।

অবিনাশও সে হাসিতে যোগ দিল। — নাও। সিগারেট খাও।

— রাখেন ওখানে, কাজ শেষে খাব।

ওদের কাজ দেখা ভুলে গেল অবিনাশ। হঠাৎই যেন এক ঝালি মেঘ ভাঙা রোদ্দুর তার মুখে এসে পড়ল। খুশি হয়ে ঘরে ফিরে এল। সারাটা দিন সে কারো সঙ্গে গল্প করল না, কথা বলল না, শুধু পায়চারি করল। চৈতালি দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে দেখেও দেখল না। চৈতালি তাতে অবাক ও চিন্তিত হল।

রাতে বাবার মুখোমুখি হল অবিনাশ। — বাবা তুমি কতদিন বাঁচবে?

— কেন রে, এখনই স্বর্গে পাঠাতে চাস নাকি!

— মোটেই না। আর আমি পাঠাবার কে! ধর তুমি আর দশ বছর, পনেরো বছর কিংবা বড় জোর বিশ বছর বাঁচবে।

— কি বলতে চাইছিস বল তো। বাঁচলে তোদের অসুবিধা হবে?

— তুমি রেগে যাচ্ছো। আমি যা বলতে চাইছি তা খুব স্পষ্ট। মানুষ যদি বাঁচার মত না বাঁচে তাহলে আর লাভ কি!

— তার মানে!

— তার মানে এভাবে মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে বেঁচে কি সুখ পাবে?

বাবা অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন, — রোগ হলে আমি কি করব?

— ছোটবেলায় তুমিই আমাদের শিখিয়েছো, রোগকে ভয় করলে রোগ পেয়ে বসে। তুমিই তো বলতে মডভানু হয়ে মরার চাইতে দাঁড়িয়ে মরা অনেক ভাল। তোমার কাছেই তো আমরা বসন্ত বিশ্বাস, আসফাকউল্লা, উধম সিং, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যর নাম প্রথম শুনি।

বাবা শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু একটু পরেই মনে হল তাঁর চোখ দুটো চকচক করে জ্বলছে।

— আমি তোমার ঘাড়ের ওই কলারটা খুলে দিচ্ছি।

— এই কি করছিস! যন্ত্রণা যে বাড়বে।

— না, কমবে। অবিনাশ কলারটা খুলে দিল, — দেখ তো, কষ্ট হচ্ছে কি না?

বাবা এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরালেন, — কই, কিছু বুঝতে পারছি না তো!

— তাহলে! আর সাধ করে কষ্ট পেও না। তোমার কিছু হয়নি। একটু সাহস করে ঘাড় মেরুদণ্ড সোজা করো, দেখবে সব অসুখ পালিয়ে গেছে। অখিল, শোন এদিকে, ঘড়ের ওপর এ গন্ধমাদন কেন চাপিয়ে রেখেছিস? ফেলে দে, একুণি ফেলে দে। একটা ইয়ংম্যানের এত ভয় কেন!

অখিল কলারটা খুলে ফেলল।

— খুব অসুবিধা হচ্ছে? যন্ত্রণা বাড়ছে?

— কই, না তো!

হো হো করে হেসে উঠল অবিনাশ। — জুজুর ভয় বড্ডোরই সাজে। আমাদের কি তা মানায়? না উচিত সেটা! সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাহস তোর নেই?

— আলবাত আছে।

— শুধু নিজে দাঁড়ালে হবে না, সবাইকে নিয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেককে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা ওল থেকে আমাদের অনেক কাজ পারবি তো?

অখিল হাত মুঠো করে ঘাড় হেলিয়ে সশব্দে হাসল।

ওর ঘাড় কাত করা দেখে অবিনাশ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে চৈতালি ঘরে ঢুকে অবাক হল! এবং একটু পরে নিজের পিঠের ব্যথা ভুলে সেও হাসিতে যোগ দিল। ❑

With Best Compliments From :

THE NABAPALLI CO-OPERATIVE BANK LTD.

P.O. - Nabapalli, Barasat
North 24 Parganas

ওয়াটার উইং সিভিল ডিফেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপ. ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৮১/২/২, ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা ৭০০ ০১২
রেজি : নং - ১১ / তারিখ - ১৯৯২

পুরীর সমুদ্র সৈকতে
মনোরম পরিবেশে
হলিডে হোমের
পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন

Enjoy your Holiday at
Our Holiday Home
at
PURI

For Contact -

Secretary

The Post and Telegraph Accounts Co-operative Credit Society Ltd.

YOGAYOG BHAWAN
P-36, C. R. Avenue, Calcutta - 700 012
Phone : 236-6351 (Ext. 41)

সমবায় হল —

- **স্বাবলম্বন**
- **স্বনির্ভরতা**
- **অধিক নিরাপত্তা**

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ স্টাফ কো-অপ. ক্রেডিট সোসাইটি লি.

পোঃ ও জেলা - বাঁকুড়া

CALCUTTA RESERVE BANK EMPLOYEES' CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD.

13, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA - 700 001

CATERING TO THE NEEDS OF THE RESERVE BANK
EMPLOYEES FOR SEVEN DECADES

■ NOW OFFERS ■

LOANS	MAX. AMT	RATE OF INTT.
☛ Long Term Loan	Rs. 55,000/-	6% p.a.
☛ Short Term Loan	Rs. 5,000/-	6% p.a.
☛ Festival Loan	Rs. 5,000/-	9% p.a.
☛ Consumer Loan	Rs. 25,000/-	10% p.a.
☛ Emergency Loan (Instant payment)	Rs. 25,000/-	9% p.a.
☛ Long Term Loan (For housing & related works)	Rs. 75,000/-	10% p.a.

■ ACCEPTS ■

☛ Fixed Deposits (Minimum Deposit Rs. 10,000/-)	
☛ Interest on F. D. From 1 year to 2 years	8.75% p.a.
☛ Above 2 years upto 3 years	9.25% p.a.
☛ Above 3 years (Interest payable quarterly)	10% p.a.

☛ Recurring Deposit Accounts with Rs. 100/- or more in multiple of Rs. 100/- for 1 year @ 8.5%

☛ Savings Deposit Accounts with facilities for collection of Drafts, Cheques, Interest/Dividend Warrants etc.

■ AND RUNS ■

☛ Holiday Homes for its members and their families at -

DARJEELING ❖ DIGHA ❖ PURI ❖ RAJGIR ❖ SIMULTALA
HALUDPUKUR ❖ GANGTOK

ভাবনা কী!
ছুটি কাটাতে চলে আসুন
আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ফ্লাটে হোম
পুরী
এবং
দীঘাতে

C.W.C. Empl. Co-op. Credit Society Ltd.

15-N, Nellie Sengupta Sarani, Cal - 87
Phone : 216-4648

"দিশা"-য়
মনোরম পরিবেশে ফ্লাটে হোয়ে নিশ্চিন্ত
অবকাশ যাপনের জন্য যোগাযোগ করুন —

ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট কর্মচারী
সমবায় ঋণদান সমিতি লি.

৬৪/৯৯, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা - ৩৭
দূরভাষ : ৫৫৬-৫৬২১-২৭
সম্প্রসারণ সংখ্যা - ২১৯

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সমবায় ভান্ডার লিঃ
রেজি. নং ৫১৪৩
রাজবাটী, বর্ধমান - ৭১৩১০৪

একমাত্র সমবায়-ই
বিকল্প অর্থনীতির
পথ দেখাতে পারে।
তাই দিকে দিকে
সমবায় গড়ে তুলুন।

সনৎ ভট্টাচার্য
সম্পাদক

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক ক্রেতা সমবায় আন্দোলন জোরদার করুন

বর্ধমান হোলসেল কনজিউমার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

রেজি. ও হেড অফিস :
৭৬, জি টি রোড (মনিমার্ট) বর্ধমান

শাখা অফিস :
লেনিন সরণি, কাটোয়া, বর্ধমান
হাটুদেওয়ান, রাজেন্দ্রতাপপুর, বর্ধমান

স্বয়ং সেবা বিক্রয়কেন্দ্র :
ক্রেসবী (মনিমার্ট) বর্ধমান ও ক্রেসবী (কাছারি রোড, কাটোয়া)

সঠিক ওজন ● সঠিক মান ● সঠিক দাম

এক ছাদের নীচে আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি
প্যাকিং অবস্থায় পাওয়া যায় —
সকলের সেবা হয়ে উঠুক আমাদের নিত্যদিনের শপথ
সমবায়ী অভিনন্দন গ্রহণ করুন

শ্রী অলোক চ্যাটার্জি
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

শ্রী দীপক পাল
সভাপতি

মানুষের জন্য সমবায়
আমরা সমবায়ের জন্য

কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্ক লি.

কাঁথি, মেদিনীপুর
ফোন : ৫৫-১৮৪ (০৩২২০)

মহঃ ইনসিউদ্দীন
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

চৈতন্যচরণ নায়ক
সভাপতি

By .
Curtesy of :

Central Excise & Customs Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

CUSTOMS HOUSE
Calcutta - 700 001

জামাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

পোঃ - জামাড় ☆ জেলা : বর্ধমান
রেজিঃ নং - ৩২ তাং - ০০/৩/৭৩

কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে আমাদের এই সমিতি সর্বদা নিয়োজিত।

নানারকম ভোগ্যপণ্য বিক্রয় করে থাকে। তাছাড়া ১/২ শতাংশ উচ্চ সুদে আমানত গ্রহণ করে থাকে। তাই এলাকার টাকা এলাকায় রেখে এলাকার উন্নতি সাধনের জন্য উক্ত সমবায় সমিতিতে টাকা রাখুন।

শেখ সবর আলী
সভাপতি

উত্তম কোঙার
সম্পাদক

কৃষ্ণচন্দ্র দাশ
ম্যানেজার

সুবর্ণ জয়ন্তীতে
(১৯৫০-২০০০)

জয় ইঞ্জিনিয়ারিং এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

রায়নগর, বাঁশদ্রোণী
কলিকাতা - ৭০০ ০৭০

দীর্ঘনগর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

ধারা পাড়া ঃ গুলকরা ঃ বর্ধমান

সমিতি স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ ব্যতীত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের ট্রাক্টর, স্যালো টিউবওয়েল, গৃহ নির্মাণ, মোটর সাইকেল ও রিক্সাভ্যান, গেটগ্রিল, আলমারি বাবদ ঋণ দাদন করেছে এবং বর্তমানেও দাদন করছে।

সমিতির এলাকায় ৩৪টি সাবমারসিবল-এর মাধ্যমে চাষিভাইদের চাষের জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছে এবং বিভিন্নরকম আমানত চালু করেছে যার টাকার পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকার উপর। সর্বোপরি সমিতি ২২টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী চালু করেছে এবং ১,৫০,০০০.০০ (দেড় লক্ষ) টাকা ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া ২,৬১,০০০.০০ (দুই লক্ষ একষট্টি হাজার) টাকা ঋণ দাদন করে 'কিষান ক্রেডিট কার্ড (KCC) চালু করেছে এবং এ বৎসর আরও কিছু 'কিষান ক্রেডিট কার্ড' (KCC) চালু করা হবে।

সমিতির সভ্য সংখ্যা ঃ ১৭৭৩

জয়ন্ত কুমার বক্সর	**কানাইলাল ঘোষ**	**সৃষ্টিধর দাস**
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

গোটরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ঃ গোটরা ✦ পোঃ ঘেটুগাছি ✦ নদীয়া

৩১.৩.২০০০ পর্যন্ত সমিতির অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান

অংশগত মূলধন	১,৪৬,৪২০.০০
কৃষি ঋণ দাদন	১২,২০,৬৬৫.০০
সঞ্চয় প্রকল্পে জমা	৭৪,৯৪,৯১৫.০০
কৃষি ঋণ আদায়	৯০ শতাংশ
সমিতির নিজস্ব উৎপাদিত বীজধান বিক্রয়	১৫,১০,৯০৮.০০

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানীদের সক্রিয় সহযোগিতায় সমিতির নিজস্ব খামারে উৎকৃষ্ট মানের বীজধান উৎপাদন করে বাজারে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারছে। সমিতির নিজস্ব স্ট্রাগু-এ এই বীজধান ক্রয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

ফোন নং - অফিস - ২৭-৫৬৩ — ব্রাঞ্চ অফিস - ২৭-৩০৫

এস টি ডি নং - ০৩৪৭৩/৯১৭৩ — ৯১৭৩

শ্রী শ্রীবাস দাস	**শ্রী জয়দেব ব্যানার্জি**
ম্যানেজার	*সভাপতি*

প্রবন্ধ

বিকেন্দ্রীকরণ

নিমাই গোস্বামী

এক

প্রেক্ষাপট

বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা আমাদের দেশে নতুন নয়। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অতীতে কেন্দ্রীয় শাসন তার কর্তৃত্ব সুদূর গ্রামাঞ্চলে বজায় রাখতে পারত। গ্রামব্যবস্থার অধীন, পরস্পরবিচ্ছিন্ন, ভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতিসত্তা বিশিষ্ট দেশে এই রকম এক ব্যবস্থা ছাড়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে শাসন কায়েম রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে এখানে চলে আসছে। মুঘল ও ব্রিটিশ যুগে এই ব্যবস্থা কখনও কখনও শিথিল হয়ে পড়লেও এই ঠাঁট একেবারে ভেঙে যায়নি। লর্ড রিপন এই ব্যবস্থাকে আবার চাঙা করতে চেয়েছিলেন। তাই ১৮৮২ সালে লোক্যাল বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়া করা হয় এবং ১৯০৯ সালে রয়্যাল কমিশনের 'বিকেন্দ্রীকরণ' সংক্রান্ত রিপোর্টেও এই কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়। ফলত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডও গ্রাম পঞ্চায়েতের আবির্ভাব ঘটে। আমাদের সংবিধানেও এই ধারণাকেই তুলে ধরা হয় ৪০ নং অনুচ্ছেদে। তাতে পঞ্চায়েতকে এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে তাদের স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার কাজে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও একই কথা বলেছেন, "কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা গ্রামের জনগণকে দেওয়া উচিত ...। আসুন, আমরা পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিই।"

কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। অশোক মেহতা কমিটি বলেছেন : পঞ্চায়েতরাজের ইতিহাস হল এক উত্থান-পতনের ইতিহাস। এটি তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেছে : উত্থানের পর্যায় (১৯৫৯-৬৪) ; জড়ত্ব প্রাপ্তির পর্যায় (১৯৬৫-৬৯) এবং অবলুপ্তির পর্যায় (১৯৬৯-৭৭)।' ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে অর্থাৎ নেহরুপরবর্তী সময়কালে রাজনৈতিক ক্ষমতা খুব বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল। পঞ্চায়েত তো দূরের কথা, রাজ্যগুলিকেও সামান্য ক্ষমতা দিতে তখন অনীহা ছিল। এমনকি যে-সব রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ছিল, সেগুলোও কেন্দ্রীয় সরকারের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতের পুতুল বা তাঁবেদার মন্ত্রীসভা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাদের কথায় কথায় দিল্লি ছুটতে হত হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে। তাই গোটা ইন্দিরার সময়কাল জুড়ে গান্ধি-নেহরুর স্বপ্নের পঞ্চায়েতিরাজকে হিমঘরে থাকতে হয়েছে। কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্রমে ক্রমে দেখা যাচ্ছিল যে দুর্বলতর শ্রেণীগুলি আরো বেশি বেশি করে জায়গা করে নিচ্ছে। গ্রামীণ বড়লোকেরা তাদের স্বাভাবিক কর্তৃত্বকে নির্বাচনের মারফত প্রমাণ করতে পারছে না। রাজস্থানের পঞ্চায়েতরাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এম ভি মাথুর লক্ষ করেছেন যে, যদিও দুর্বলতর শ্রেণীগুলি এখনো তাদের সংখ্যার অনুপাতে উচ্চপদগুলিকে দখল করতে পারেনি, কিন্তু তারা একটি দর কষাকষি করার অবস্থায় উন্নীত হতে পেরেছে।' উত্তরপ্রদেশের একটি ব্লকের গ্রামপঞ্চায়েত প্রেসিডেন্টদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে সুরজ সিং শর্মা বলেছেন যে, আগেকার প্রাক্তন জমিদার মুখিয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে এবং তাদের বদলে সক্রিয় শহরে দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন তরুণের দল গ্রামীণ নেতৃত্বে অবতীর্ণ হচ্ছে।' এইভাবে পঞ্চায়েতিরাজের নামে গ্রামীণ নেতৃত্বের রদবদল ঘটলেও যদি একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে চলে যায়, তাহলে শাসকশ্রেণীর পক্ষে সমূহ বিপদ। তাই অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করার ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ ১৯৭৯ সালের মে মাসে দিল্লি বৈঠকে তাঁদের দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। তাই এই কমিটির সুপারিশকে নস্যাৎ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা যে বিলের খসড়া করা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক দলগুলিকে পঞ্চায়েতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।'

পরবর্তীকালে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আটকানো যায়নি। তার কারণ আর্থ-সামাজিক বিকাশের অনিবার্যতা। কৃষিতে যে গতিশীলতা শুরু হল 'সবুজবিপ্লব'-এর হাত ধরে, তাতে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি সমৃদ্ধ হল। ফলত তৈরি হল নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণী এবং স্তর। এইসব শ্রেণী ও স্তরগুলির উদ্ভবযোগ্য অঙ্গ এল পিছিয়ে পড়া জাতির কৃষকদের মধ্য থেকে, যাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকাতে পারি। ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে জমিদারদের শতকরা ১.৫ ভাগের হাতে ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ জমি ; ৮০১ জন বড় জমিদারের হাতে ছিল সমস্ত কৃষি জমির একের চার অংশ থেকে একের তিন অংশ। জমির এই অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে আর একটি ধারা কাজ করতে শুরু করল। প্রজারা ভূমিস্বামী-অধিকার কিনতে শুরু করল। টাকার বিনিময়ে জমির

হস্তান্তর শুরু হল। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণের জমিদার ও মুসলিম সম্প্রদায় হল জমির মূল বিক্রেতা এবং পিছিয়ে পড়া জাতের কৃষকেরা হল মূল ক্রেতা। পশ্চিমবাংলায় মূল বিক্রেতা ছিল অনুপস্থিত জমিদাররা যারা ইতিমধ্যে সহজবাক্যে তাদের বাসস্থান সরিয়ে নিয়ে গেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়া জাতের কৃষকদের চাষের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিল। ফলত বাজারমুখী এক বাণিজ্যিক কৃষির প্রবর্তন হল এবং তার শক্তি কৃষি অর্থনীতিতে বাড়তে লাগল। উত্তরপ্রদেশের কৃষি অর্থনীতির এই উত্তরণের পর্যায়ে পুঁজিবাদ অনেকখানি জায়গা করে নিল। স্বভাবত পুঁজিবাদের বাহক এই পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কাঠামোর সমস্ত স্তরে তাদের অংশীদারিত্বের দাবিদার হয়ে উঠল।"

বিহারের কৃষিতে দু'ধরনের পুঁজিবাদী জমিদারের সৃষ্টি হয়েছে, তারমধ্যে এক ধরনের জমিদার এসেছে পিছিয়ে পড়া জাতপাত থেকে। তারা জমি ক্রয় এবং লিজ গ্রহণের মধ্য দিয়ে (অনুপস্থিত জমিদারদের কাছ থেকে) নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। পাটনা বিভাগে কৃষিতে যে আপেক্ষিকভাবে দ্রুত পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়েছে তার কারণ জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ, সেলভাঙ্গের ফলে মুসলিম জমিদারদের জমি হস্তান্তর এবং সিলিং আইনের ফলে জমি হস্তান্তর। এইসব জমি মূলত এসেছে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির মধ্যে। পরিবহন এবং যোগাযোগের সুবিধা নিয়ে তারা হয়ে উঠেছে সবজি উৎপাদক। বড় বড় ডেয়ারি তৈরি করে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে তারা কিছু পয়সা জমিয়েছে। সামান্য কিছু লোক হিনধর বানিয়েছে, শহরে দোকান খুলেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে ঢুকে পড়েছে। সুতরাং তারা চাইছে যারো রাজনৈতিক ক্ষমতা, আমলাতন্ত্রে তাদের ভাগ।'

রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোকে অর্থনৈতিক গতিশীলতার সঙ্গে সমরোপযোগী করতে হলে চাই কাঠামোর অনুভূমিক ও উল্লম্ব বিস্তৃতি। এর প্রয়োজন এই কারণে যে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি মূল কাজ হল বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার নির্বাচিত বিতরণ। এই ধরনের বিতরণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলে,-অর্থনৈতিক গতিশীলতার অসম ব্যাপ্তি, আপেক্ষিকভাবে কম হয় ; অর্থনৈতিক জীবনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের সংঘাত ও দ্বন্দ্বগুলির শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয়ে যায়। অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উপরি-কাঠামোর পরিবর্তন না আনতে পারলে ঘোটা ব্যবস্থার মধ্যেই দেখা দেয় নানা মারাত্মক উপসর্গ। তাই সর্বস্তরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রসারিত করতে হয়। এই পটভূমিতে সাংবিধানের ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধন কার্যকরী করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে এক বছরের মধ্যে সবকটি রাজ্যকে আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই সংশোধন অনুযায়ী কতিপয় বিষয় আবশ্যিক (যেমন ত্রিস্তরীয় কাঠামো)। অন্য অনেক বিষয়ে রাজ্যগুলিকে তাদের নিজেদের আইন তৈরি করে নিতে হবে (যেমন সঠিক কি কি ক্ষমতা ন্যস্ত করা হবে ইত্যাদি)।

দুই

উন্নয়নের প্রশ্ন

উন্নয়ন মানে শুধু জাতীয় আয় বা উৎপাদনের বৃদ্ধি নয়। উন্নয়ন মানে সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। যে মান নির্ভর করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা আয়ু এবং আরও অনেক কিছুর উপরে। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর একটি পথ হল আয় বা উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধি হলেই সব মানুষের কাছে তার সুফল পৌঁছে যাবে এমন কোন কথা নেই। এমন হতেই পারে, বাড়তি উৎপাদনে জনসংখ্যার একটা বড় অংশের কোন অধিকার নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদন ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক উৎপাদন প্রক্রিয়ার চরিত্র ছাড়াও নির্ভর করে সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা প্রতিষ্ঠানের উপরে। এর জন্য প্রয়োজন 'এনটাইটেলমেন্ট' অর্থাৎ উৎপাদনের উপর মানুষের অধিকার। এই অধিকারের ভিত্তিতে অর্জিত হয় 'কেপেবিলিটি' বা সক্ষমতা। এই সক্ষমতা হ'ল সবচিক থেকে মর্যাদাজনক সামাজিক জীবনযাপনের সক্ষমতা। উন্নয়ন প্রক্রিয়া তাই শেষ পর্যন্ত মানুষের সক্ষমতা প্রসারের প্রক্রিয়া। অমর্ত্য সেন বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কতটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন, তার বিচার করতে হবে তিনি প্রকৃত যে স্বাধীনতার অধিকারী তার ভিত্তিতে এবং উন্নয়নের অর্থ ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া। মার্কসের কথায় বলা হয়, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে "ব্যক্তির উপরে পরিস্থিতি ও সুযোগের আধিপত্যের জায়গায় সুযোগ ও পরিস্থিতির উপরে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে।" ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মারফত মানুষ তার পছন্দকে বেছে নেওয়ার কিছুটা সুযোগ পায়, তার ওপর আর্থ-সামাজিক অবস্থার চাপিয়ে দেওয়া বাধাগুলিকে সে অতিক্রম করতে পারে। ফলত সে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার অর্জন করতে পারে, ফসলের ন্যায্য ভাগ ও মজুরির দাবিদার হতে পারে ; লিঙ্গ-বৈষম্য থেকে রেহাই পেতে পারে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে একেবারে নীচের স্তরে থাকা মানুষের জীবন যাপনের মানের উন্নয়ন ঘটতে পারে।

আমরা নীচে একটা সারণি ব্যবহার করছি যাতে গড় মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ধনী রাজ্যগুলির পাশাপাশি মাঝারি আয়ের রাজ্যগুলির বার্ষিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারের সাথে সাথে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার মধ্যে থাকা মানুষের শতকরা হিসাবটিও তুলে ধরছি।

রাজ্যের নাম	বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৯১-৯২ থেকে '৯৭-৯৮	শতকরা দারিদ্র্যে বাস করা জনসংখ্যা '৯৩-৯৪	শতকরা শিক্ষিতের হার '৯৭
মহারাষ্ট্র	৮.০১	৩৩.৮৬	৭৪
গুজরাট	৯.৫৭	২৪.২১	৬৮
কেরালা	৫.৮১	২৫.৪৩	৯০
পশ্চিমবঙ্গ	৬.৯১	৩৫.৬৬	৭২
কর্ণাটক	৫.২৯	৩৩.১৬	৫৮
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬.২২	৩৫.০০	৭০

আগের পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রথম দুটি রাজ্যকে সামগ্রিক উৎপাদনের মাপকাঠিতে ধনী রাজ্য বলা যেতে পারে। কারণ এই রাজ্য দুটির গড় মাথাপিছু আয় ও বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্যদের থেকে উপরে। কিন্তু এই রাজ্যগুলির শতকরা দারিদ্র্যে বাস করা জনসংখ্যা এবং শতকরা শিক্ষিতের হারের দিক থেকে সারণির শেষ চারটি রাজ্যের সঙ্গে সমতুল্য বা পশ্চাদপদী। এর একটি কারণ সারণির প্রথম দুটি রাজ্যে জনগণের সক্ষমতা বিস্তৃতির কাজটা অর্থাৎ তৃণমূল স্তরে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কর্মসূচি স্থানীয় এলিটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ব্যাপক মানুষকে তা স্পর্শ করতে পারেনি।

ভিন

অন্যান্য ক্ষেত্রে

সরাসরি উন্নয়নের কথা বাদ দিলে সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিকেন্দ্রীকরণের সুফল লক্ষ করা যায়। এখানে আমরা এরকম তিনটি ক্ষেত্র বেছে নিচ্ছি : (ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, (খ) অরণ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, (গ) অপারেশন বর্গা।

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ঃ

জেমস মেনর দেখিয়েছেন, পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সতর্কতা জানানোর ক্ষেত্রে এবং সেগুলি পালন করানোর ব্যাপারে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করে থাকে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সালে কর্ণাটকে এব্যাপারে পঞ্চায়েতিরাজ ভাল কাজ করেছে।[৮] ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে জলপাইগুড়ি জেলায় যে বন্যা হয়েছিল, এপ্রসঙ্গে তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বন্যা বিধ্বংসী আকারে দেখা গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার মহকুমার আসাম সীমান্ত এলাকায়। আলিপুর-দুয়ার, কালচিনি, মাদারিহাট ও ফালাকাটা ব্লকগুলিতে এই বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল বেশ বড় রকমের। প্রায় ২০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল, ১ লক্ষ গবাদি পশু জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল, অনেক সেতু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল, ৮০,০০০ বাড়ি ধ্বংস হয়েছিল এবং ৯৫,০০০ বাড়ির কম-বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। প্রায় ৮ লক্ষ লোক জলবন্দী হয়ে পড়েছিল। এরকম এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়েও ফালাকাটা, মাদারিহাট ব্লকের প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সঙ্কট মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছিল। তারা আপৎকালীন জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ১৮ জুলাই বন্যা শুরু হয়েছিল। তারা ১৯ জুলাই বিভিন্ন গ্রামে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মানুষকে সতর্ক করেছিল এবং নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে তারা কাজে লাগিয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও তারা সহযোগিতা লাভ করেছিল। ৬৪টি রিলিফ কেন্দ্র থেকে তারা ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল। এইভাবে জেলা থেকে ত্রাণসামগ্রী আসার আগেই তারা স্থানীয়ভাবে সমস্যার প্রাথমিক মোকাবিলা করেছিল। বন্যার অব্যবহিত পরে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে তাদের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। যার ফলে মানুষকে দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক দুর্দশার শিকার হতে হয়নি। খুব তড়াতাড়ি গোটা এলাকায় স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরে এসেছে। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে ফালাকাটা ও মাদারিহাটের মানুষ ত্রাণের ব্যাপারে পঞ্চায়েতের ভূমিকায় খুশি। লোকেরা একথাও জানিয়েছে যে গ্রামের পরিবর্তে লোকেরা এখন গ্রামের জল-মন্দের ব্যাপারে অনেক বেশি অধিকার লাভ করেছে। এপ্রসঙ্গে ৩১ জুলাই ১৯৯৩ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট উদ্ধৃতিযোগ্য এবং পঞ্চায়েতকে হেয় করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।[৯] ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় পঞ্চায়েত যে দায়িত্ব পালন করেছে তা অবশ্যই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে সম্মান থাকবে।

(খ) অরণ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ

আমাদের দেশে অরণ্য সংরক্ষণ ও পরি-চালনার ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসী /জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উদ্যোগের গুরুত্ব অধিক। তাই ১৯৯০ সাল থেকে ভারত সরকার যে যৌথ অরণ্য পরিচালনার (জে এফ এম) নীতি গ্রহণ করেছে তার মূলকথা হ'ল তৃণমূলস্তরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ। এই কর্মসূচির মূলকথা হ'ল : (১) বর্তমান অরণ্যের সংরক্ষণ এবং ক্ষয়ে যাওয়া অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার, (২) বনদপ্তর সাথে অরণ্যের পরিচালনা এবং জলের উৎসগুলিকে রক্ষা করা, (৩) অরণ্যের উপর নির্ভরশীল মানুষের রুজি রোজগারের উপায় বের করা, (৪) সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অরণ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এবং অরণ্য-ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের স্বাভাবিক অধিকারের স্বীকৃতি। ১৯৭১-৭২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের আরাবাড়িতে এধরনের একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। এখানকার ডি এফ ও অজিতকুমার ব্যানার্জি বুঝতে পেরেছিলেন যে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা কেন্দ্রের সাফল্য সম্ভব নয়। ফলত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে এখানকার কর্মসূচির সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। ফল হিসাবে ১৯৮৭-৮৮ সালে ৯৭ হেক্টর এলাকায় শাল ও ইউক্যালিপটাস গাছের বাগান তৈরি করা গেছে। অরণ্যবাড়ির পরীক্ষামূলক সাফল্য অন্যত্র অনুসরণ করে সুফল পাওয়া গেছে। ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৮৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার অরণ্যভূমি ছিল যা গোটা রাজ্যের ৯.৪০ ভাগ। ১৯৯১ সালে এই অরণ্যভূমির পরিমাণ কমে গিয়ে ৯.০৫ ভাগে পৌঁছেছিল। কিন্তু ১৯৯৩ সালে অরণ্য এলাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৯.২২ ভাগে এবং ১৯৯৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৩.৪ ভাগে। ১৯৯৫ সালে এই পরিমাণ হয়েছে ১৪.৯৭ ভাগ।[১০]

(গ) অপারেশন বর্গা

ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের মূল কারণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরতার বদলে স্থানীয় গ্রামসভাসমূহ বা পঞ্চায়েতরাজ, কৃষক সংগঠন-গুলির উদ্যোগে এক্ষেত্রে সরকার সাফল্যলাভ করেছে। এই রাজ্যের কৃষকদের শতকরা ২০ ভাগ হ'ল ভাগচাষি। আগে ভাগচাষিদের কোনো লিখিত বা আইনসম্মত অধিকার ছিল না। এরা ছিল ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন ও মহাজনদের শোষণে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কিছু লোকদেখানো নিয়ম-কানুন হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তা বর্গা-দারদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি। 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচি গরিব কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করেছে। তৎকালীন ভূমিসংস্কার কমিশনার দেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এরাজ্যে ভূমিসংস্কার প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভাগ-চাষিদের নাম নথিভুক্ত করাটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়, কিন্তু এই কর্মসূচির অভিনবত্ব হ'ল ভাগচাষিদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামীণ কৃষক সংগঠনগুলির এবং গ্রামীণ স্বয়ংশাসিত সংগঠন-গুলির সহিত সমন্বয় নিয়ে ভাগচাষিদের নাম

নথিভুক্ত করার জন্য বিশাল অভিযান চালানো। ভাগচাষিদের নাম নথিভুক্ত করার আমলাতান্ত্রিক ধাঁচের পদ্ধতি তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।[৭] ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে এই অপারেশন বর্গার কাজ শুরু করে ১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ৮ লক্ষের বেশি বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত করা গিয়েছিল। একাজ করা সম্ভব হত না যদি প্রশাসন, পঞ্চায়েত ও কৃষক সংগঠনগুলি একযোগে কাজ না করত। গ্রামীণ সান্ধ্য বৈঠকগুলির মধ্য দিয়ে বর্গাদার ও গরিব লোকেরা বুঝতে পেরেছিল যে এতদিন তাদের অধিকারের লেখাপোড়ায় ঘুষে বেড়াতে হত, আজ সেইসব অধিকারের লোকেরাই এসেছে গ্রামের গরিব পল্লীতে। এই কর্মসূচির ফলে গ্রামের গরিব লোকেরা আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছে। এধরনের পরিবর্তন স্থানীয় স্তরে গণ-উদ্যোগ তৈরি করা ছাড়া সম্ভব নয়।

চার

কেরালা ঃ পরিকল্পনা প্রণয়নে ও রূপায়ণে

১৯৯৬ সালে এই রাজ্যে নবম পরিকল্পনার জন্য গণপ্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল। শেষ হ'ল ২০০০ সালের ২৫ মে পাঁচ দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে এত বড় সাহসী পরীক্ষার উদাহরণ বিরল। ১৯৯৬ সালেই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পরিকল্পনা বরাদ্দের ৩০/৪০ শতাংশ স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য সরিয়ে রাখা হবে। তাই প্রথম বছর স্থানীয় সংস্থাগুলি পেয়েছিল ৭৪৯ কোটি টাকা, দ্বিতীয় বছরে ৯৫০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০২০ কোটি টাকা। রাজ্য বাজেটের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে পঞ্চায়েতরাজ/নগরপালিকা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কত টাকা বরাদ্দ আছে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীভূত করার ব্যাপারে সরকার কতখানি গুরুত্ব দেয় তা এর থেকে স্পষ্ট হয়।

এই ঐতিহাসিক গণপ্রচারাভিযানের প্রথম পর্যায়ে কাজ ছিল মানুষের স্থানীয় প্রয়োজন-গুলিকে চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় উন্নয়নের ঘাটতির জায়গাগুলি নির্দেশিত করা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ছিল প্রত্যেক গ্রাম-পঞ্চায়েতের উন্নয়নের রিপোর্ট প্রস্তুত করা। এই রিপোর্টে থাকবে স্থানীয় ইতিহাস, সম্পদের কর্ম, সমস্যার বিশ্লেষণ এবং উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তৃতীয় পর্যায়ে প্রকল্পগুলি প্রস্তুত করা হবে। চতুর্থ পর্যায়ে গ্রামপঞ্চায়েতের পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এই পরিকল্পনায় দু'ধরনের প্রস্তাব থাকবে — যেগুলি বাৎসরিক পরিকল্পনার জন্য এবং যেগুলি পোটা নবম পরিকল্পনার সময়কালের জন্য। একই প্রক্রিয়া চালু থাকবে ব্লক এবং জেলাস্তরে পরিকল্পনা রচনার জন্য।

এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে (গ্রাম এবং শহর উভয়ই) ১৪,১৪৭টি সভা হয়েছে। ৩০ লক্ষ লোক এই সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫০ জন থেকে কয়েক শত লোক যোগ দিয়েছে। তারা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইসব আলোচনা চলেছে। অংশগ্রহণকারীরা ১২টি গ্রুপে ভাগ হয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছে। বিষয়গুলি হ'ল : (১) কৃষি ও সেচ, (২) মৎস্যচাষ ও পশুপালন, (৩) শিক্ষা, (৪) যানবাহন, শক্তি ও বাজার (৫) শিল্প, (৬) গৃহ ও সমাজ-কল্যাণ, (৭) গণস্বাস্থ্য এবং পানীয় জল, (৮) সংস্কৃতি, (৯) নারীকল্যাণ, (১০) সমবায়, (১১) তফসিলি জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন এবং (১২) সম্পদ সংগ্রহ। পরে প্রতিটি গ্রুপের দু'জনকে নিয়ে উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা সভা বা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা আছে এমন লোককে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো হয়েছে। এইসব দক্ষ লোকের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন সময় দিতে পারে এমন অভিজ্ঞ লোককে নিয়ে টি টি সি (ভলান্টারি টেকনিক্যাল কর্প) গঠন করা হয়েছে। এইসব ব্যক্তির মধ্যে অনেক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী আছে, আবার নিজ নিজ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিও আছে। কেরালা রাজ্যের প্ল্যানিং বোর্ড অন্যান্য রাজ্যের মত টুটো জগন্নাথ নয়। যদিও এর গঠন প্রায় অন্যান্য রাজ্যের মতই। বহু প্রতিষ্ঠান, যেমন সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ, সেন্টার ফর আর্থ সায়েন্স এবং সবথেকে উল্লেখযোগ্য কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (কে এম এস পি) এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে।

ফলত উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে পরিকল্পনা রূপায়ণে। প্রথম দু'বছরে ১৮,৪১৪টি বাড়ি নির্মিত হয়েছে ২,৪০,৩০৭টি শৌচাগার এবং ৭,১৪৭ কিমি রাস্তা তৈরি হয়েছে। ৫০,১৬২টি কূপ খনন করা হয়েছে, ১৭,৪৮১ পাবলিক ট্যাপ বসানো হয়েছে এবং ১৬,৫৬৩টি পুকুর পরিষ্কার ও মেরামত করা হয়েছে। Richard Franke এবং Barbara H. Chasin (অধ্যাপক মন্টকেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটি, নিউ জার্সি) এই সাফল্যকে চমকপ্রদ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পাঁচ বছর এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে রাজ্যের শতকরা দশটি পরিবারের নতুন আবাস নির্মিত হবে এবং প্রায় শতকরা ১৪.৫ ভাগ গ্রামীণ পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার থাকবে।[৮]

পাঁচ

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা

১৯৭৮ সাল থেকে একটানা একটি সরকারের অধীনে পরিচালিত একটি রাজ্যের পঞ্চায়েতরাজের অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে রয়েছে, যার থেকে আমরা অবশ্যই ইতিবাচক ও নেতিবাচক শিক্ষা নিতেই পারি। এই রাজ্যের সরকারে আসীন রয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলি, বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে তারা আদর্শগত-ভাবে দায়বদ্ধ। বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা স্থানীয় এলিটদের ক্ষমতা দেওয়া নয়, যতটা সম্ভব জনগণকে ক্ষমতা দেওয়া। তাই ১৯৯২ সালে সরকার দু'জন অভিজ্ঞ প্রশাসককে নিয়োগ করে পঞ্চায়েতরাজের মূল্যায়ন করেছে। এঁরা হলেন শ্রীনির্মল মুখার্জি, যাঁর পাঞ্জাব রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে ; অপরজন শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের সংস্পর্শে কাজ করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে 'অপারেশন বর্গা'র মত কর্মসূচি রূপায়ণে যাঁর বড় ধরনের অবদান আছে।

বিভিন্নস্তরে প্রত্যক্ষ মত বিনিময়ের মাধ্যমে এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁরা যে মূল্যায়ন করেছেন, তা অনুধাবন করার মত। ইতিবাচক দিকগুলির কথা এখানে বলছি না, কারণ এগুলি অনেকেরই জানা। আমরা নেতিবাচক দিকগুলির কথা বলব, যেগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি। তাঁদের মতে, প্রথম দশ বছরে পঞ্চায়েতরাজ তৃণমূলস্তরে মানুষের মধ্যে যে উদ্যোগ ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী-কালে তা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। সত্যি কথা বলতে, প্রথম যে প্রাণচাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তা তিন বছরের বেশি

টেকেনি। সরকারে ন্যস্ত জমি বন্টনের গতি শ্লথ হয়ে গেছে। বছরে এই বন্টনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার একরের মত। বর্গাদার নথিভুক্ত করার কাজ মন্থর হয়ে গেছে। এমনকি ফসল ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বর্গাদারেরা অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়ছে। তারা ৭৫ ভাগ ফসলের বদলে ৫০ ভাগ ফসল পাচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ফসল ভাগাভাগির ক্ষেত্রে এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চায়েত নেতৃত্ব এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করছে না।[৭]

অন্যদিকে পঞ্চায়েতরাজ স্বাধীন স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে বিকশিত হওয়ার বদলে সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলত গ্রামতান্ত্রিকতার রোগ তাকে গ্রাস করছে। পঞ্চায়েতরাজ/নগরপালিকা সংস্থাগুলি সরকার ও নির্বাচকমণ্ডলীর মাঝখানে অবস্থিত দরকষাকষি করার শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিশ বছরের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েতরাজ/নগরপালিকা পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে কোন পেশাদারি মনোভাব ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

গত দু'দশক ধরে কৃষির উন্নতির সুযোগ নিয়ে গ্রামবাংলায় যে ধনী / মধ্য কৃষকস্তরের অভ্যুদয় হয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য পঞ্চায়েতরাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। গ্রামীণ জীবনের একেবারে প্রান্তিক মানুষরা পঞ্চায়েতরাজে তাদের উৎসাহ হারাচ্ছে। তাই গ্রামসভায় লোক জড়ো করা যাচ্ছে না। পঞ্চায়েতরাজ চিন্তার ও কর্মে স্থবিরতার শিকার হচ্ছে।

পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে কেরালার মডেল এই রাজ্যে অনুসরণ করা জরুরি কিনা সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার দরকার আছে। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবেশ চেতনা, পরিকল্পনা রচনা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া দরকার। পার্টি, কৃষকসভা ও পঞ্চায়েতরাজের কাজের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বিভাজনের স্পষ্টতা থাকা দরকার। গোটা গ্রামীণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরকারি অনুদান পাইয়ে দেওয়ার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে উঠলে তার রাজনৈতিক ফলশ্রুতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

৬

আমলাতন্ত্র, কায়েমি স্বার্থ, গণতন্ত্র

মার্কস আমলাতন্ত্র সম্পর্কে হেগেলের ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, আমলাতন্ত্র কোন নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন শ্রেণী নয়। এই গোষ্ঠী নিজেরাই একটি স্বতন্ত্র স্বার্থ তৈরি করে যা সমাজ থেকে পৃথক। রাষ্ট্রের মধ্যে আমলাতন্ত্র হ'ল একটি বদ্ধ সমাজ যা রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে আত্মসাৎ করে নেয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল : আনুষ্ঠানিকতা, হায়রারকি, রহস্যময়তা। শেষপর্যন্ত আমলাতন্ত্র পর্যবসিত হয় নিষ্ক্রিয় আনুগত্যে, কর্তৃত্বের প্রতি অন্ধবিশ্বাসে এবং নিয়মতান্ত্রিক যান্ত্রিকতায়।[৮] দীর্ঘদিন পরেও আমলাতন্ত্র সাহেবি ঢং থেকে একটুও পাল্টায়নি। গণপ্রতিনিধিদের আমলাতন্ত্র গ্রাস করে নেয়। জনগণকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের অবস্থান এক বিদ্বেষপূর্ণ নিরপেক্ষতা।

১৯৯৪ সালের কেরালার পঞ্চায়েতরাজ বিলের সমালোচনা করতে গিয়ে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ বলেছিলেন, এই পদক্ষেপ "জনগণকে ক্ষমতা দেওয়ার বদলে সমস্ত স্তরের আমলাতন্ত্রকে আরো ক্ষমতা প্রদান করবে।"[৯] তিনি আরো বলেছিলেন, "নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিকেন্দ্রীকরণের শত্রু হ'ল তারা যারা কেন্দ্রীকতার সুযোগগুলি লাভ করে তারা প্রতিটি কৌশল কাজে লাগাবে যাতে কাউন্সিলের হাতে খুব সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হয়।"[১০]

অর্থনৈতিক অসাম্যের ওপর গড়ে ওঠা একটি সমাজে সবসময় নতুন নতুন ক্ষমতার দালালরা গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে নতুন নতুন কায়েমি স্বার্থ যারা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে। বিগতকালের অভিজ্ঞতা একথাই বলে। একসময় এইভাবে বর্ণহিন্দু ও অল্প কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েতিরাজের সাফল্যকে বানচাল করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং বর্তমানে ৭৩/৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যে চেষ্টা শুরু হয়েছে তা আমলাতন্ত্র ও কায়েমি স্বার্থ বানচাল করে দেবে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা যায় না।

গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে গেলে অংশগ্রহণমূলক স্বাধীনতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই সমাজে প্রকাশ্য বিতর্ক ও আলোচনার সুযোগ এবং মত বিনিময়ের পরিবেশ থাকতে হবে। সাধারণ মানুষকে তথ্যের অধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন অমর্ত্য সেন। বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া অর্থবহ এবং কার্যকর করার জন্য সমাজের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত তথ্যপ্রবাহ সুনিশ্চিত করা প্রাথমিক।[১১] সম্প্রতি পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে ভূমিসংস্কার, মৌলিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা, ন্যূনতম আয় ও সবার জন্য কর্মসংস্থান ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এইসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে গেলে সমস্ত স্তরে রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দরকার। শুধুমাত্র বাজারের নৈরাজ্য ও বেপরোয়াভাবের মোকাবিলা করাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ নয়।

তথ্যসূত্র :

১। 'Panchayat Raj & Decentralisation of Political Power' : Jagannath Pathy. Social Scientist, April 80. p. 37

২। পঞ্চায়েত - নব পর্যায় ও নব উদ্যোগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩। Panchayat Raj in Rajasthan A case study in Jaipur. M.V. Mathur, New Delhi Impex. 1966. p. 259

৪। 'Pattern of Emerging Rural Leadership' A case study of village Panchayat President in a Block in UP Suraj Singh Sharma, Journal of Social & Economic Studies, Vol. VI. No. 2. Sept. '78. pp. 165-179.

৫। The Statesman. Feb. 8. 1980.

৬। Unequal Partners Power Relations. Devolution & Development in U.P. By G.K. Lieten Ravi Srivastava, Sec 2.1 Land, Labour & Agriculture.

৭। Mobility & Conflict Social Roots of Caste violence in Bihar, Pradip Kr. Bose in Social Stratification, ed by Dipankar Gupta, Delhi, Oxford University Press.

৮। Economic Performance of States in Post Reforms Period by MONTEK SAHLUWALLA, EPW, May 6-12, 2000.

৯। Manor, James (1993) Panchayat Raj and Early Warning of Disasters' EPW, Vol. XXV III pp. 1019-20.

১০। Panchayats is Dealing with Natural Disasters' 1993 Floods in Jalpaiguri. By G.K. Lieten, Prabhat Datta, EPW April 15, 1995.

১১। JFM in South-West Bengal, A study in Participatory Development. By Binay Kumar Pattnaik, Suman Dutta, EPW Dec. 13-19, 1997.

১২। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পৃঃ ৩

১৩। A Peoples' Movement R. Krishna Kumar, Frontline, June 23, 2000

১৪। New Horizons for West Bengal Panchayats A Report for the Govt. of W.B. by Nirmal Mukherjee & D. Bandyopadhya, Govt. of W.B. Publication.

১৫। Karl Marx & His Life & Thought, David McLellan, p. 69

১৬। Power to the People, Frontline, May 6, 1994.

১৭। For Full powers & Responsibilities, Deshabhimani, 1 March, 1991.

১৮। পশ্চিমবঙ্গ, ৮-১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৯, অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা।

সমুদ্রতটে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে
নিউ দিঘায় আমাদের হলিডে হোমের সুবন্দোবস্ত আছে।

দি পোস্টাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি অফ ক্যালকাটা লিমিটেড

কলিকাতা জিপিও বিল্ডিং, ফোন : ২১০-৫৩৩৭, ২১০-৫৬০১, এক্স - ২৬

কেশবপুর-জালপাই রাধাকৃষ্ণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং - ১৫৭ তাং ২৬-৩-২৩

কেশবপুর-জালপাই, হলদিয়া ⊛ মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমিতির অন্যতম অংশীদার

আমানত : সেভিংস, স্থায়ী

ব্যবসা : ● স্বল্প সুদে কৃষিঋণ, মধ্যমেয়াদি ঋণ ও মৎস্য চাষে ঋণ দান, ● ন্যায্যমূল্যে রেশন, কেরোসিন তেল বিক্রয়
● রাসায়নিক সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ, কাপড় সুলভ মূল্যে বিক্রয়

সমস্ত রকম আমানতের উপর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় ½% সুদ বেশি।

মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সংগ্রামে নিরলস সৈনিক

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

পশ্চিমবাংলার মহিলা সমবায়ের একমাত্র শীর্ষ শিল্প সমবায়

আমাদের তিনটি বিক্রয় কেন্দ্র :

সমবায়িকা মানিকতলা সিভিক সেন্টার (বিধান শিশু উদ্যানের পাশে)

হেমন্তভবন, ১২ নং বি বা দী বাগ, কলিকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন : ২১০-৪০৬৩ ● সল্টলেক, এ ই মার্কেট, শপ নং - ৭১

এখানে পাবেন :

মহিলাদের উৎপাদিত বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাক ও খাবার ডিমিস। এছাড়া বালুচরি/বাঁধনি শাড়ি, ব্লাউজ পিস, কাঁথা স্টিচ শাড়ি, গুজরাতি চুড়িদার, বাগ, পাঞ্জাবি, চুড়িদার, বাগ, পাঞ্জাবি, চুড়িদার, বেডিং রুমাল, পাপোশ, জ্যাম, জেলি, আচার, সস, গুঁড়োমশলা, বড়ি, মধু, মোরব্বা ও চনাচুর ইত্যাদি।

With
Best
Compliments From

METROPOLITAN ENGINEERS' CO-OP. SOCIETY LTD.
Regn. No. 12N-71

Chakdaha
Nadia

পন্ডিতপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ৫৭৮

ফোন নং : ০৩৪৭২, ৫২০৭৩, ৬৩২২১, ৫৫৪০২

মুখ্য কার্যালয় : গ্রাম ও পোস্ট-পন্ডিতপুর
জেলা : নদীয়া
শাখা অফিস : শ্রীকৃষ্ণপুর
জেলা : নদীয়া

৩০.৬.২০০০-এর পরিসংখ্যান

আমানত	সার বিক্রয়
বন্ধকি ঋণ	কীটনাশক
কৃষিঋণ	অন্যান্য

নদীয়া জেলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ইসেখালী থানা কো-অপঃ এগ্রিল মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

পোঃ বগুলা, জেলা : নদীয়া, ফোন : ৭২২০৭

ন্যায্য মূল্যে, সঠিক ওজনে, উন্নতমানের সার ও যাবতীয় স্টেশনারী দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়।

শ্রী শশাঙ্কশেখর বিশ্বাস (জনপ্রতিনিধি)	সভাপতি
শ্রী বিমানরঞ্জন চন্দ	সহঃ সভাপতি
শ্রী অসীম বিশ্বাস	সম্পাদক
শ্রী বিমলকুমার বিশ্বাস	কার্যকরী সমিতির সদস্য
শ্রী জয়দেব ঘোষ	কার্যকরী সমিতির সদস্য
শ্রী সুধিরকুমার মণ্ডল	কার্যকরী সমিতির সদস্য
শ্রী প্রফুল্ল কুমার মন্ডল	কার্যকরী সমিতির সদস্য
শ্রী গোপাল সরকার	সরকারি প্রতিনিধি
শ্রী দীপক দাস	সরকারি প্রতিনিধি
শ্রী হরেন্দ্রকুমার রায়	সরকারি প্রতিনিধি
শ্রী অমিয়কুমার রায়	পঞ্চায়েত প্রতিনিধি

কৃষ্ণনগর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬২ আর এন ঠাকুর রোড

কৃষ্ণনগর - নদীয়া

দূরভাষ : ৫২২৬১ ও ৫৩২৮২

"সমবায় আন্দোলনের অতন্দ্র প্রহরী"

প্রদীপকুমার সমাদ্দার
চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার

সফিউদ্দিন বিশ্বাস
চেয়ারম্যান

প্রবন্ধ

ভাষার ব্যবহার ঃ কিছু কথা

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই ১লা বৈশাখ ১৪০৭থেকে রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলাভাষায় কাজকর্ম সম্পাদনের অঙ্গীকার সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। এমন ঘোষণা নতুন নয়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই জনমানস থেকে এমন দাবি বারবার সোচ্চার হয়েছে এবং সমকালীন সরকার যথারীতি দাবি মেনে আনুষ্ঠানিক চেতাবনি প্রকাশও করেছে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়নি। কেউ কেউ মনে করে রাজনৈতিক সদিচ্ছা আন্তরিক হলেই এতদিনে এই জরুরি কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যেত। কথাটা হয়তো পুরো ঠিক নয়, কিন্তু এত সরলও নয়। ভারতবর্ষ বহুভাষাভাষী ও বহুজাতিক মানুষের যুক্তরাষ্ট্র। মোঘল ও ইংরেজ আমল থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাধ্যবাধকতার সঙ্গে প্রশাসনিক কাজকর্মের ভাষার প্রশ্নটি যুক্ত হয়ে গেছে। শ্রেণী শাসনের চরিত্র অনুসারে কাজের ভাষাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় যোগসূত্রের ভাষা ও আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে ভারসাম্য কখনও রক্ষিত হয়নি, রক্ষা করার কথা গুরুত্ব সহকারে ভাবাও হয়নি। এমনকী স্বাধীন ভারতবর্ষেও।

সুদীর্ঘকালব্যাপী সরকারি আধাসরকারি প্রশাসনিক কাজে বিদেশিভাষা ব্যবহৃত হতে থাকায় ভারতীয় ভাষাসমূহের আশানুরূপ বিকাশ তো ঘটেইনি বরং উচ্চশিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে কার্যত উপেক্ষিতই হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু হিন্দিবলয়ে অবস্থিত ছিল গান্ধিজি, নেহরু প্রমুখের সুবাদে, সেহেতু হিন্দুস্থানিকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রের ওপর বর্তে যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে অন্যান্য ভাষাকে কার্যত বঞ্চিত করে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, রাজভাষা, যোগাযোগের ভাষা হল বটে, কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও একশো কোটি জনসংখ্যার এই দেশে ইংরেজির বিকল্প হতে পারল কি? পরাধীন ভারতে ইংরেজি, স্বাধীন ভারতে হিন্দি বাস্তবত সর্বজনের ভাষা হয়ে উঠতে পারেনি। এক ভাষা, এক জাতি, এক রাষ্ট্র এই স্লোগান হিন্দিবলয় থেকে রাজনৈতিক পর্যায়ে উঠেছে বারবার কিন্তু জনসমর্থন পায়নি। আজ তার সঙ্গে 'এক ধর্ম' কথাটিও যুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে ধর্মীয় ভাবাবেগের বাতাবরণে আঞ্চলিক ভাষা ও জাতিসত্তার প্রশ্নটির গুরুত্ব চাপা দেওয়ার জন্য। ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত জাতি সত্তাগত বিষয়টি। কোন মানুষ বা মানবগোষ্ঠীই মাতৃভাষা পরিবর্তনে বা তার গুরুত্ব হ্রাসে সম্মত থাকে না। সমাজতত্ত্ববিদদের বিশ্বাস জাতীয়তা গঠনের পথে দ্বিভাষিকতা অন্যতম প্রতিবন্ধক। ১৯৫০, ১৯৫৬ এবং তার পরেও ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন করতে হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাষাভিত্তিক সমস্যা কি মিটেছে? মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু প্রশাসনের ভাষা এখনও ইংরেজি, ফলে সেখানকার মানুষের জাতিসত্তাগত ভাবাবেগ বিধানসভা ও মন্ত্রীসভার অধিকার নিয়ে নিরসন করা যায়নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সুনির্দিষ্ট ভাষানীতি নেই বা সে দিকে চর্চার কোন লক্ষণও নেই। সংবিধান স্বীকৃত ১৮টি ভাষার মধ্যে সংস্কৃত, সিন্ধি ও কাশ্মীরি কোনও রাজ্যেরই সরকারি ভাষা নয়। কিন্তু বাকি ভাষাগুলির উৎকর্ষ বিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সমদৃষ্টি বা পৃষ্ঠপোষকতার কোন পরিকল্পনা বা কর্মসূচি আজও গৃহীত হয়নি। বিপুল সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের ভাষাগুলির ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে না? পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে, সেখানেই কি ভাবাবেগ থেমে যাবে? বিভিন্ন উপভাষাগুলির স্বাধীন সত্তার দাবি মাথা তুলতে শুরু করেছে ইতস্তত। এমতাবস্থায় ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের সুবিবেচনা ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মাথায় কে প্রবেশ করাবে জানি না। এমনিতেই রাজধানী দিল্লিতে হওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষের এক বড় অংশ চেতনে অবচেতনে কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দিভাষীদের সরকার বলে মনে করে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে সুষম নীতির অনুপস্থিতি, অর্থনীতি ও সাধারণ প্রশাসন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আধিপত্যবাদ, আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষা এই বিশ্বাসের মূল আরও দৃঢ় করে তুলছে; কেন্দ্রীয় নীতির ব্যর্থতায় শুধু আঞ্চলিক ভাষাগুলি দুর্বলতর হয়েছে তাই নয়, হিন্দিভাষাও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়নি, কেননা জোর করে মান-মর্যাদা আদায় করা যায় না, বিশেষ করে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে। ফলে উপনিবেশিক অবশেষ হিসেবে ইংরেজির স্থান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যেখানে ছিল আজ তা অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ইংরেজির প্রজন্মায় হিন্দিসহ ভারতীয় ভাষাগুলির মানুষের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে হীনমন্যতা ইংরেজ আমল থেকে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজের ভাষা নিয়ে বাঙালির অহঙ্কারও গত কয়েক দশকে

তলানিতে এসে ঠেকিয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত এখন আর বাংলামাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা নিরাপদ মনে করতে পারছে না। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইংরেজি এখন আর সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ভাষা নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা। ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনার সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। অধুনা ভুবনায়নের সূত্রে ইংরেজি ভাষা-মৌলবাদ বা আধিপত্যবাদের শিকার বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষ। এ সত্য স্বীকার করে নিলেও স্বাধীনরাষ্ট্রে আমাদের অপরিণত চেতনা, অদূরদর্শিতা ও অনুদারতা কতখানি দায়ী তাও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার বিষয় কি আজও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গুরুত্ব পাবে না।

রাজ্যস্তরে সরকারি বা বেসরকারি স্তরে যে চিন্তাভাবনা স্বাধীনতার পর থেকে কিছু কম হয়নি এমন নয়। সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা মাঝেমধ্যেই সক্রিয় হয়েছেন। সচেষ্ট যাঁরা হয়েছেন তাঁদের ভাবনা বা আবেগের কেন্দ্রে সবসময়ই থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনি বাংলা ভাষাকে অসীম মর্যাদায় বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিক এবং সে-কালে রাজনীতিগতভাবে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ ব্রজেন্দ্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে লিখিত এক খোলা চিঠিতে গভীর আর্তির সঙ্গে বলেন, "মহাকবি তাঁহার সমগ্রজীবন যে ভাষায় অমর সাহিত্য রচনা করিয়া তাহাকে মহিমময়ী করিয়া গেলেন — তিনি কি আজও সমগ্র প্রদেশ বিস্তারী রাষ্ট্রীয় প্রাসাদসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ইংরাজি ভাষার সম্মুখে আবেদনপ্রার্থিনীর মত দাঁড়াইয়া থাকিবেন? ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পর হইতেই শুনিয়া আসিতেছি বাংলাভাষা প্রাদেশিক সরকারিভাষার মর্যাদা পাইবে। তাহার পর আজ বারো বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিল— ইতিমধ্যে বিধানসভায় ও পরিষদে বাংলা ভাষাকে ইংরেজির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতেও কি তাহা কর্মে পরিণত হইবে না? জানি অসুবিধা অনেক আছে- টাইপরাইটার নাই, শর্টহ্যান্ড নাই। পদস্থ কর্মচারীদের বহুজন ইংরাজিতেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। ভাষা সমস্যা যাহা ইংরেজি শিক্ষিত ও ইংরেজি অশিক্ষিত বিপুল জনসাধারণের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে-অবজ্ঞাকারী ও অবজ্ঞাত শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে-যাহা শাসক শ্রেণী এবং শাসিতদের মধ্যে অনৈক্যের অন্যতম কারণ, ভাষা সংস্কৃতির দিক দিয়া অতি গুরুতর বিষয়-তাহার সমস্যার সমাধান হইল না। আজ আমাদের বাঙালির বিশেষ করিয়া ইংরেজি অনভিজ্ঞ বাঙালির দাবি প্রত্যাশা এই যে, জন্মী বঙ্গভাষার সিংহাসনে অভিষেক এই লগ্নে সম্পন্ন করুন। সমগ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়কর্মে বাংলা ভাষা তাঁহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হউন।" বলাবাহুল্য রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে কেন রবীন্দ্র জন্মের একশো পঁচিশ বর্ষেও এই একই বেদনাময় আবেদন দেশবাসীর পক্ষে ব্রজেন্দ্র অন্নদাশঙ্কর রায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সরকার সমীপে পেশ করেছিলেন। সরকার তখন বেশ খানিকটা নড়েচড়ে বসলেন। যথাসম্ভব বাংলা ভাষায় রাজ্যের সর্বত্র, ইসলামপুর ও আসানসোলে উর্দু ভাষায় এবং দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে নেপালি ভাষায় প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার বিজ্ঞপ্তি জারি হল। মহাকরণ থেকে নিচুস্তরে বেশ কিছুদিন বাংলায় নথিপত্র লেখালেখি চলেওছিল, আজও অনেকটা অব্যাহত আছে। ইজরবিশেষ পরিবর্তন হয় বটে কিন্তু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। তৎকালীন তথ্য-সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নবগঠিত বাংলা আকাদেমির কাছে আবেদন রেখেছিলেন পুরনো পরিভাষা গ্রন্থকে কালোপযোগী ও সাধারণের ব্যবহারে বোধগম্য রূপে পরিমার্জনা করে প্রকাশ করতে। এক বছরের চেষ্টায় বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের সহায়তায় বাংলা আকাদেমি প্রশাসনের উপযোগী একটি পরিমার্জিত পরিভাষা সঙ্কলন প্রকাশ করেছে। বর্তমানে এই গ্রন্থটিই সরকার থেকে দপ্তরে দপ্তরে বিতরণ করা হচ্ছে, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্য। পরিভাষা তৈরি ও সঙ্কলন প্রকাশ কখনও একক্কালীন ঘটনা হতে পারে না, প্রয়োজন অনুসারে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। প্রশাসন ও বাংলা আকাদেমির মধ্যে একাজে নিরন্তর সমন্বয় জরুরি। যদিও পরিভাষাই একমাত্র বাধা বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা ভুল করেন। যাঁর মাতৃভাষা বাংলা তিনি নিজের কথা যদি বাংলায় প্রকাশ করতে স্বচ্ছন্দতা অর্জন করতে সমর্থ হন তাহলে তাঁর অসুবিধা হওয়ার কোনও কারণ নেই। ইংরেজি বাঁধা গৎ বা ইংরেজি বয়ান বাংলায় ঘুরিয়ে আনতে চাই বলেই বিপত্তি হয়। ইংরেজ যদি এদেশ শাসন না করত, আর দেশিরাই শাসনে থাকত তাহলে তো এরাজ্যে বাংলাতেই কাজ হত। এখন তো দেশ স্বাধীন, বাংলাভাষাও খুব উন্নত। আসলে আমরা দুশো বছরে কাজেকর্মে নকলনবিশী করতে শিখেছি কিন্তু নিজের মাতৃভাষাটা যে যত্ন করে শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা বুঝতে পারিনি আজও। তাই বাংলা বাক্য গঠনে বা বানানে ভুল হলে লজ্জিত হই না, নির্দ্বিধায় বলে বসি বাংলা আমার আসে না। নিজের কাজটা যদি সারতে হয়, আর কী করতে হবে যদি স্পষ্ট হয় নিজের কাছে, তাহলে সরাসরি বাংলায় কেন প্রকাশ করতে পারব না। আমরা তো ইংরেজি লেখা বা বলার সময় প্রায়শঃক্ষেত্রেই অনুবাদ করেই যাই। কিছু ইংরেজি শব্দ যা নিরক্ষর মানুষের কাছেও পরিচিত তার পরিভাষা না করে সরাসরি গ্রহণ করে বাংলালিপিতে লিখলেই হয়। এতে ভাষার সম্পদ ও গতি দুইই বৃদ্ধি পায়।

প্রশাসনে বাংলার যদি সত্যিই চলন করতে হয় তাহলে এখনই অনেকগুলি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। সরকারের যেসব বিভাগ সরাসরি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেখানকার নিদর্শ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির ইংরেজি বয়ানগুলির মানা বাংলা বয়ান তৈরি করতে হবে, একাজে বাংলা আকাদেমি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। টাইপরাইটার, কম্পিউটার ইত্যাদির সমস্যা নিয়েও সরকার ভাবছেন। ধীরে ধীরে এ-সব ক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধান হবে আশা করা যায়। অবাঙালি আধিকারিকদের এ রাজ্যে বাংলা শেখাটা আবশ্যিক, কিন্তু সেটা আনুষ্ঠানিক না হয়ে কাজের শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। আর শুধু অবাঙালি কেন বাঙালি আধিকারিকদেরও বোধকরি বাংলায় কাজ করাতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের দরকার হবে। যাহোক ছোটা বেশি জরুরি তাহল সমগ্র প্রশাসনযন্ত্রকে এই ব্রতে উদ্বুদ্ধ করা। সর্বনিম্ন করণিক থেকে মুখ্যসচিব পর্যন্ত সকলেই যদি অনুভব করেন যে এটা শুধু মন্ত্রীপরিষদের রাজনৈতিক গরজ নয় নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার প্রতি দায়, তাহলে কাজটার অগ্রগতি হবে অন্যথায় আবার থিতিয়ে যাবে। ❑

ছুটির আনন্দ উপভোগ করুন ঃ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ -এর

হলিডে হোমে

হলিডে হোম	ঠিকানা	যোগাযোগ	চার্জ (প্রতিদিন) টাকা	সার্ভিসচার্জ	ঘরসংখ্যা	প্রতিঘরে
পুরী (রান্নার সুবিধাসহ)	**ওড়িশা** ভারত সেবাশ্রমের বিপরীতে **স্বর্গদ্বার**	শঙ্কিকর চৌধুরী ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস **কলিকাতা : ৭০০ ০০১** ফোন : ২২০-৬৮৬৭/২৭০১	৮০	১০	১০	৪ জন
দিঘা (রান্নার সুবিধা সহ)	**হোটেল জোকেন্দ্র** সৈকতাবাস/ সার্কিট হাউসের কাছে	**অরিন দাস** ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা : ৭০০ ০০১ ফোন : ২২০-৬৮৬৭/২৭০১				৩ জন
রাজগীর (রান্নার সুবিধাসহ)	**বাঙালী পাড়া** পুলিশ চৌকির কাছে	বিশ্বনাথ দাস ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা : ৭০০ ০০১ ফোন : ২২০-৬৮৬৭/২৭০১				
দার্জিলিং	**হোটেল গ্রেট** ম্যালের কাছে	বিশ্বনাথ দাস ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা : ৭০০ ০০১ ফোন : ২২০-৬৮৬৭/২৭০১				৪ জন
গ্যাংটক	**পালাং হোটেল**	বিশ্বনাথ দাস ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা : ৭০০ ০০১ ফোন : ২২০-৬৮৬৭/২৭০১				৪ জন
হরিদ্বার (এয়ার কুলার ও টি ভি সমেত)	**হোটেল মন্দার** মনসা মন্দিরের বিপরীতে রোপওয়ে বুকিং অফিস	সুজিত রায়, গৌতম চ্যাটার্জি ধর্মতলা শাখা ৫, চৌরঙ্গি প্লেস, কলি - ১৩ ফোন : ২২৮-৯০৮২/৫০৫৭				৩+১ জন
দিল্লি (এয়ার কুলার, টি ভি ও টেলিফোন সমেত)	**হোটেল ন্যাশনাল** রামনগর, নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে	সুজিত রায়, গৌতম চ্যাটার্জি ধর্মতলা শাখা ৫, চৌরঙ্গি প্লেস, কলি - ১৩ ফোন : ২২৮-৯০৮২/৫০৫৭				৩ জন
চেন্নাই (রান্নাঘর এবং টিভির সুবিধা সহ)	১৩, ভারা সিটি ভিনায়াগর কোলেল স্ট্রিট, টাইলাপেট, চেন্নাই - ৬০০ ০৮৬	সুজিত রায়, গৌতম চ্যাটার্জি ধর্মতলা শাখা ৫, চৌরঙ্গি প্লেস, কলি - ১৩ ফোন : ২২৮-৯০৮২, ৫০৫৭				৪ জন

সমবায়ী বন্ধুদের জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা

শ্রীরামপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি : নং ২৩ এইচ জি, তারিখ - ২১-২-৮৯

৮, কে স্ট্রিট
শ্রীরামপুর, হুগলি

৩৫ বছর ধরে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত —

শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ

বীরভূম হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

শান্তিনিকেতন রোড, বোলপুর

বোলপুর সমবায়িকা, বোলপুর সপ্তরশ্মি মেন ও সিউড়িতে
স্বয়ং সেবা কেন্দ্র এবং সমস্তরকমের সরকারি স্টেশনারি সাপ্লায়ার।

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

মনসিজ মুখার্জি
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

সুধীর ভট্টাচার্য
প্রশাসক

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

AMRITNAGAR SUB-AREA EMPLOYEES'
COOPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

P.O. : RANIGANJ
DIST. : BURDWAN

With Best Compliments From :

Phone : 220-8564
221-1710

THE BANK EMPLOYEES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

(Registration No 5 Calcutta of 1947)
REGD. OFFICE 23A. NETAJI SUBHAS ROAD
(3RD & 4TH FLOOR), CALCUTTA - 700 001

We Accept Following Term Deposit

30 to 45 days
46 days to below 1 year
1 year to below 2 year
2 years & below 3 years

Make Your Money Double
In Co-opt. Yojna Scheme

Savings Deposit

- GROW MORE WITH SAFETY AND SECURITY
- WE VALUE YOUR DEPOSITS AND ASSURE YOU
  OUR BEST SERVICES :- COMPUTERISED SERVICE
- A BANK WITH MORE THAN 50 YEARS OF EXPERIENCE.....
  R.B.I. APPROVED LICENSED BANKER

Enjoy Your Holidays in our Holiday Homes
At
PURI, GANGTOK, VARANASI,
DARJEELING & PELLING

কবিতা

মানুষের মন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উচ্চারিত হতে চায় না কিছু কিছু কথা
তক্ষুণি - তক্ষুণি।
তারা গিরিগর্ভে জমা হয়।
জমা হতে-হতে তারা একদিন হঠাৎ
মধ্যরাতে
আগ্নেয়গিরির থেকে তপ্ত লাভাস্রোত
যে-ভাবে বেরিয়ে আসে
সেইভাবে বেরিয়ে
পর্বতের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে গ্রামগঞ্জ আর
খেতখামার
গৃহস্থের উঠান, ঘরবাড়ি, গোলাঘর
ধ্বংস করে দেয়।

এইভাবেই কথাগুলি জমতে থাকে মানুষের মনে।
মানুষের মন
আগ্নেয়গিরির চেয়ে কিছু কম ভয়ংকর নয়।
আমি জানি, তোমরা জানো না।

গাছ ও মানুষ

কৃষ্ণ ধর

অবশেষে পিতামহ বৃক্ষ বললেন, এই নাও
আমি আমার ডালপালা ওটিয়ে নিচ্ছি
তুমি এবার ইমারত গড়তে পারবে
যথেচ্ছ পরিমিতে,
আমি অনেক যুগ ছিলাম তোমার প্রতিবেশী
জানতে চাইলে খুঁজে দেখতে পারো
আমার শেকড় বাকড় কতদূর পৌঁছেছে
তুমি একমুঠো মাটি হাতে তুলে নিয়ে দেখো
আমার শরীরের গন্ধ ওতে মিশে আছে

ওই যে দেখছো ঔটিপতঙ্গ ওদের জিয়োল ওরা
আমার শরীর ওদের কীভাবে আড়াল করেছে
তুমি ওদের চাও না, ওদের জেনারেশন
আর তোমার কাছে আসবে না
তুমি ওদের ঘুরে হেঁকে দিচ্ছো

এরপর কী করবে তুমি
আমার নামে বানাবে অভিধান শব্দের ঝিলিক :
মাটির ভিতর থেকে তুমি তুলে আনবে আমার শেকড়
এবারও তুমি চাও স্বপ্নের পথিবী এসে

ভালো কাপটাবে ছাদের কার্নিশে?

কালেরে সারি সারি বৃক্ষের শব শুয়ে থাকে
নিথরপাথর, কেউ ফিরেও দেখে না।

সম্পর্করেখা

প্রত্যুষসুন ঘোষ

ক্লান্তি এসে নেমেছিল ঘুমের অতলে,
ডুবে যেতে যেতে শেষ সমতলে স্থির হ'ল দেহ।
ঘুমের রঙ এখন ঘন নীল। ধরেরি অভিজ্ঞতা, ঈষৎ হলুদ অপমান
ধূসর সবুজ ও কালচে দুঃখ নানা রঙের মাছ হয়ে সাঁতরে
উপরে উঠছে, কেনাবুনি নেমে আসছে নীচে।
নাভির পথরেখা ধরে ছুটতে ছুটতে তুমি, কিউবি ঝুড়ে কোলাজ,
ঘন বোনের ঘাস দিয়ে জল-কর্মীনিকা, খাড়া নাক, কালো চুল
বলো নামে — আলোবিম্বে তৈরি তোমার মুখ নিজেই আলোর উৎস,
একবার স্পষ্ট একবার আড়াল। দূর থেকে কী বলে হাত নাড়লে
বোঝাই গেল না। আমি দাঁড়াতে বলে তুমি চলতে থাকো,
এভাবেই ভালমন্দ দৌড়ের বাজি ধরে পিছু নেওয়া।

মেঘের মাবাপ ছিঁড়ে জেগে ওঠে নীল উপত্যকা,
পরিচিত বহুরা সমস্বরে ডাকে — মণ্ডপে বাজছে উৎসব।
ছইবও পাহাড়ে উড়ছে নীল ধোঁয়া মেঘ — সেদিকে
হেটেই চোখের আয়নায় তুমি আমারই অপেক্ষায়।
দূর আর আকাশ মন থেকে হালকা নীলে বদলে যাচ্ছে —
ঘনিষ্ঠ বোকাপড়া এবার স্থিতু হয়ে আসবে।
এপাশে বাকি জীবন, ওপারে অনন্ত ঈশ্বরীর মতো তুমি,
নাভি বরাবর দূর থেকে আরো দূরে জাল টানছে সম্পর্করেখা।

রীতি

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পলাশ মাদুরের অন্তরাল ছায়ার ভিতর
কেউ কেউ বেড়ে ওঠে
তারই রাতে সুগন্ধ ছড়ায় শাদা ফুল

প্রচার প্রদীপ্ত আলো থেকে
কেউ কেউ দূর সরে থাকে

হয়তো অপেক্ষা তার আজীবন
এমন কি মৃত্যুরও পরে
তার চোখ অপেক্ষা জানালা হয়ে
শূন্য আকাশের দিকে চোখ রাখে

কিছুই সেভাবে শূন্য নয়
ভাবে তার অক্ষরের রাতফুলগুলি
একদিন

কথা ছিল — পুনর্বার

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাকে তো দিতে পারি —পুরানো টেবিল, বিবর্ণ পত্রিকা,
ঘুণধরা মশালের লাঠি, ভাঙা পাথরের স্তূপ এবং ভঙ্গুর
বলিরেখা জমাট শরীর
কিন্তু স্বাধীনতা
তা কি করে দেব

ছুঁলে মাত্র ভেঙে যাবে — এমনি কোমল হাত কবিতার
কার-ও কার-ও ছিল
সে-অমল সরলতা জলস্রোতে গেল যে ভাসান
কথা ছিল পুনর্বার
হাতে হাত ধরে দাঁড়াবার
কথা ছিল

নিথর নিস্পন্দ চোখে - মহাদিন আজো জেগে আছে
শব্দহীন মানব মিছিলে
ঢেউ-ওঠে ঢেউ-পড়ে
ঢেউয়ের মালায়
বিন্দু বিন্দু আলো ফুটে ওঠে ।।

আঁধার নয়ন

বীরেন সাহা

মাটিতে আকাশ নামায় কারা
হিংস্র ধূম্রনার
কুটিল চোখের তর্জনে কেঁপে ওঠে ক্ষমা,
নদীজলে মেশে যন্ত্রণার লালাস্রোত
কুরুক্ষেত্র — পাণিপথে — দূরে দূরান্তরে,
যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কবে
নাকি শেষ হয়ে যাবে কোনোদিন? —
স্পষ্ট নয় তার রেখাছবি

তবু ভূলোকের আলো
অদ্ভুত আঁধার — আতঙ্কের হিম —
কান্দাহার কারগিল জাফনার উপকূলে
আরণ্য পর্বতে —
মানুষের হৃদয় পিষে শবের মিছিল সাজানো
কাশ্মীর মান্দাই কোকরাঝাড়ে
তৈমুরলঙ্গের তরবারি ভিজে যায় শোণিত ধারায়
বলসায় তিমির হিংসার হুঙ্কারে,
কতকাল জুড়ে এই তিমির উল্লাস — ভীষণ আর্তনাদ,
দিকহারা কান্নার ধ্বনি
শ্বাপদের হুঙ্কারে কতকাল চুপ হয়ে আছে,
হিংসার মন্ত্র শুষে নেয় পরাজিত পৃথিবীর শোক,

তবুও নতুন পৃথিবী ভোরের আলোয়
জেগে ওঠে টানটান,
মায়াবী আস্থায় প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয় —

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে একদিন,
শরশয্যায় মুমূর্ষু মানুষ রইবে বসে মানুষের অপেক্ষায় —
কণ্ঠে যারা নেবে শত শত শতাব্দী গরল
বোধির আরজি জুড়ে উজ্জ্বল হবে
চির নিষ্পাপ মানুষের মুখ,
অমৃত — বিস্তারে দৃষ্টি ফিরে পাবে অন্ধ মানুষ
একদিন কেটে যাবে নিবিড় আঁধার।

একলা খেলা

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বকুল গন্ধে বৃষ্টি নামে সন্ধ্যা বেলায়
কাজল চোখে শ্রাবণ ভাসে একলা খেলায়
বৃষ্টি তবু কি এক কথা দু'চোখ জুড়ে
যতই ভিজছি ততই দূরে যাচ্ছে পুড়ে!

ভিজছি যতই ভিতর বাহির জ্বলছে ক্রমে
জানি কিছুই হবে না পাওয়া স্বপ্ন ভ্রমে
বৃষ্টি তোমার চোখের তারায় উদাস বেলা
সজল মেঘে কদমশাখায় মায়ার খেলা

হাওয়ার প্রেমে যাদুকরী বৃষ্টিশিখা
স্মৃতির ঘরে হঠাৎ আলোর অগ্নিটিকা
ঝিরিঝিরি কুরুবুরু কথায় ছলে —
কোন্ সে কথা, কি সে কথা হাওয়ায় বলে?

বকুল গন্ধে বৃষ্টি নামে সন্ধ্যাবেলায়
কাজল চোখে শ্রাবণ ভাসে একলা খেলায়
একলা খেলায় উদাসী মেঘ আকাশ জুড়ে
দরজা খোলা, খেলবে এসো হৃদয়পুরে!

জাতক

কনানী দাস

এ সুপ্ত দিনের কথা কৃতজ্ঞতায় লিখি। ঝিনীত মুকুলে আজ চার দিশা ম ম। সজনে ফুলের কুমকো সিক্ততার পালে পেয়েছি আনন্দাশ্রুর আলোকালো অঙ্কুর। চিত্রল উজ্জে-শিশুর কৌমার্যে ঝল ফুটিয়ে যায় রংমশাল প্রহর। এ এক বসন্ত প্রহর ঘরে লেবু ফুলের পীতাভ গন্ধে উন্মন হয় চেতনা। জাতকের সুকর্ণ মন্ডকে ঝুরঝুর জাগে পরশের স্মৃতি, সন্তত পরিবৃত্তি!

মানুষ সব দেখছে

দীপেন রায়

রহস্য খসিয়ে, নিঃশব্দ রাত্রির নীচে অন্ধকার-ও বিবস্ত্র, বড়ো একা —
ক্লান্তির অসহায়তায়, অগুনতি লাশের মধ্যে একটা শব বড়ই করুণ —
সে শুধু স্বপ্নের যাদু চেয়েছিল প্রকৃতস্থ মনকে ঘিরে,
তার দুই চোখ অসাড় কিনুনি নিয়ে দেখে নেয় সমরের খুশি.:
মায়ের দুধের লাশ ছেনে তোলে কবন্ধ দু'হাত!

মৃত্যু কি এতই সুলভ, যে কেউ যখন খুশি যেখানে-সেখানে
প্রকৃতি নির্মম ঘোরে ছিটে-মাটি উস্কোয়ে তাড়া দিয়ে যাবে!
আকাশের অসংখ্যময়তা নেই — আমাদের স্মৃতিহীন মেঘ,
বিরল পাখির মতো বুদ্ধিজীবী-মরশী হয়েছে চলকায়,
এখানে-ওখানে তেমনি নানা রঙে টিয়ারা সন্ত্রাসে!

ভরহীন ভাসমান, নিথর বিবেক শুধু গন্ধে ভাসে,
হাতের কবলায় তার জল খেতে আসে না হরিণ।
কে কোথায়, কেমন আছে সে খবরে কার মাসে যায়!
মনুষ্যত্ব এতই সুলভ — সকলি কি অগ্রহতে নাস!

"ভাগ"

উত্রি দে

চৌধুরিদের বাড়িটা অনেক পুরানো
অলাতে কানাতে শ্যাওলার শ্লেপ
পলেস্তরা খসা ভাঙাচোরা গেট, একপাশে
জঙ্গালের উাই, এজমালি উঠোন
তারের বেড়াজাল — নানা রং নানা মাপ
হাওয়ায় দোলে
ফোড়নের কাঁচ রোজকার
আর কটা দিন, এর পরেই তো বহুতল
চৌধুরিদের মলি, দীপু, টিয়া, শ্যামাদের
চোখ স্বপ্নিল ; কার ফ্ল্যাট্ কোন্‌দিকে
পুব দক্ষিণ উত্তর না পশ্চিম — না না
এটা নয়, উই ওটা চাই — বিতর্কের ঝড় বয়
পাচ ভাই, গিন্নিরা "কিলো কেনটা পছন্দ হয়?"
'ইস্ এটা যত তাড়াতাড়ি ভাঙে'
তবুও সন্তর্পণে দেওয়ালের গা বেয়ে
পাকলকে পুঁই, মাচাখানটাতে তুলসী মঞ্চ
"নারায়ণ নারায়ণ" — ঘড়ঘড়ি কাঁক হয়
সতৃষ্ণ ঘোলাটে নয়ন, কিছু কথা
কানে আসে, কিছু বাতাসে বেড়ায়
আতঙ্কে কাঁপে বুক
ভাগের মা কি গঙ্গা পায়?

কুয়াশা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

এতদিন পরে তবু কুয়াশায় কেন যে ঢেকেছে চারিদিক
পাশাপাশি সবাই রয়েছি তবু কেউ কাউকে চিনিতেও পারি না!
কিছুক্ষণ আগে ছিল দৃষ্ট রোদ আমরাণ শীতের সকাল
পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকা পরস্পরের ওমে সুখবৃত্তে থাকা
অথচ হঠাৎ কেন ঘোর অন্ধকার, আমরা আছি কিংবা নেই
কিছুই বুঝি না ; তবু হাতে হাত ঠেকে গেলে শিউরে ওঠা ভয়ে
মনে এই অন্ধকারে চলতে হবে চিরদিন কিছুই না দেখে কিংবা শুনে
নিরন্তর দমবন্ধ এভাবেই পথচলা এভাবেই মনুষ্য প্রকৃতি অলো মুছে
বেঁচনায় সন্দেহের অন্ধকারে হিংসা-দ্বন্দ্ব-প্রাণন প্রবাহে তবু ছোটা!

নতুন আকাশ

গৌতম হাজরা

চোখ বন্ধ করলেই আজ যাকে দেখি
সে আগুন
চোখ খুললেই আজ যাকে দেখি
সে নদী
একটা নদী : যা সংজ্ঞাবিহীন মনুষ্যকে ঘেরায়
আর আগুন : যা অবচেতন মনকে জ্বালায় পোড়ায়
তবু মুখোমুখি বসা, বসি।

জীবনের পথ সে তো নিজস্ব অভ্যাস
কেউ নিস্তব্ধ চূড়ায় বসে এক একটা শাল
পালক ওড়ায়
কেউ ঘোরে পুড়ে ঘামে ভিজে অযনমে হেঁটে যায়
তবু বুকের স্পন্দনে রক্তের এ এক অন্য অনুভূতি
তখন আগুন ও নদীর মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মানুষ
ভাঙে, গড়ে, সৃষ্টি করে নতুন আকাশ!

তাকে খবর পাঠানো দরকার

অসিতবরণ নাথ

একটানা বৃষ্টি-সন্ধ্যার বিষণ্ণতা ঘিরে
ছেয়ে আছে জানালার পরিপার্শ্ব
বড্ড বেশি অন্ধকার, নিশুতি ও গর্জন মুহুর্মুহু
তাই আরো জাঁকিয়েছে ঐশ্বর্য ঘনঘোর
একেই কি বলে কবির ভাষা?
বন্ধ লাগে, বুঝিবা ভয়ও হয়
এই পরিবেশ —, বাইরে অসমাপ্ত কাজের পাহাড়
অলক্ত জরাক্রান্ত নুব্জ হয়ে বাইরে বেরোনো যাবে কি —
আমার যে তাকে খবর পাঠানো দরকার,

মুখে জলে ভাসছে ঘর ও বাড়ি
চারদিকেই বন্যাত্রাসের মত হাহাকার,
ভেঙে গেছে দুর্যোগ, বৈদ্যুতিক বল
মাঝখার হাওয়ে নাই নাই উত্তরের হাওয়া
— কে যেন চিৎকার করে বলে
'বর্ষার পরই তো হবে মনে
আকাশ হাসে — বলেছে কবি সুনন্দ'
কিন্তু একটি তাকে যদি না ডাকি
বড্ড দেরি হয়ে যাবে না

তাকে খবর পাঠানো দরকার

যাই

অমিতাভ দাস

ঠিকানাবিহীন পথে ঘুরে ঘুরে বেসুরো বাজিয়ে
ছিঁড়েছি বীণার তার
সব হারানোর স্মৃতি ঘিরে আসা অশ্রু সামিয়ে সামিয়ে
এবার আমার ফেরা বড়ো দরকার
যাই —

নাও গো আমার শেষ অভিনন্দন
যেখানে আমার চিরজীবনের পাট্টা রেখেছি ঠাঁই
অচেনা দুপেছি
এখানে পুড়েছি
সঙ্গীবিহীন — স্বপ্নবিহীন — একা
ছন্দপতন জীবনযাপন
অন্তরপটে স্মৃতির সঙ্গে দেখা
বিনাশে
আমি তো রাখিনি তোমাদের কাছে দেনা
যাই —

উত্তেজনাটা ভ্রমণে আমার ছিল
ওধতে হবেই অতদিন — বেশ-তিন
ভ্রমণে হারানো সুজন-সখা নাই
যাই —

পিঞ্জরে পাখি উপোসে বিকল এই আছে এই নাই
অপরাধবোধে বুক ফেটে পড়ে
ভাঙচুর ঝড়ে তোলপাড় করে
যাই —

তিনি

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার ঠিক চোখে পড়ছে না
তিনি কোনদিকে দাঁড়িয়ে
ঐ দিকে তাকাই — ঘাড়ে ব্যথা
এ দিকে দেখি — চাঁদে টিকটিকি
সামনে চোখ মেলি — শূন্যতা
পিছন দিকে দেখতে গেলে সরে বসতে হয়
ওপর-নীচ ডেকিচ দেখি
হামা-হামা অন্ধকারে
হয়তো পিঠের দিকেই আছেন
সেইদিকে আকড়সা সারাক্ষণ জাল বুনছে
সেই জালে বন্দী হয়ে আছি
দেখিনি
তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে —

'দুরাবস্থা'

কিরণশঙ্কর মৈত্র

পৃথিবীর বড়ই 'দুরাবস্থা' এখন,
'আকার দেখেই বোঝা যায়' : পরমাণু-প্রহার,
এইড্স-নারী, জন-বিস্ফোর, প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস ;
লোহার দেয়ালে ধরেছে ঘুণ,
প্রাচীন পাঁচিলের ভিতরে বিষ-চাঁদ নামে
মারণ ষড়যন্ত্রে,
সাদা সুষমা মন্ত্রিল : 'ছিঃ ছিঃ! এতো জঞ্জাল!'
বদলায়, বদলে যায় পৃথিবীর রূপ ;

পৃথিবীর বড়ই 'দুরাবস্থা' এখন।

"সূর্য ঠাকুর ওঠ, সূর্য ঠাকুর ওঠ"
ডাক ভেসে যায়

অপরাজিতা গোস্বামী

শ্রাবণের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসে —
নিশুতি দুপুর কেউ কোথাও নেই,
চারিদিকে গভীর অরণ্য অন্ধকার।
হাজারো রকম পাখির কাকলি কলরবে আকাশ বাতাস মুখরিত,

ভোরের আলো না ফুটতেই
চাতকী পাখির রোমান্টিক ডাক
মনে আগুন ধরায় — রোমাঞ্চিত হয় শরীর।
কালো মেঘ ঘিরে বৃষ্টি নামে
অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি করে যায়
তপ্ত বসুন্ধরা বৃষ্টির শীতল স্পর্শে
স্নিগ্ধ-স্নাত হয়।
ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি শ্রাবণের ধারায় গা ভাসায়
বৃক্ষের ডালে ডালে চঞ্চল ডানা মেলে
আনন্দে কোলাহলে ওরা মেতে ওঠে —
অদূরে পুকুরের পাড় ঘিরে নারকেল গাছ
আর আমবাগানের আলো আঁধারি রহস্য ঘিরে
ফিঙি পোকার ডাক বুঁচোখে স্বপ্ন জাগায়,
'ইষ্টি কুটুম, ইষ্টি কুটুম' হলুদ মাথাবি পাখির ডাকে
মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে
ডালের অতলান্ত গভীরে মৎস্যনারীর
চোখ জ্বলে —
মেঘ কালো করে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে
এক একটি বৃক্ষ আকাশ ছুঁয়ে
শাখা প্রশাখা বিস্তার করে
নীরবে দাঁড়িয়ে ভিজে ভিজে স্নান করে।

বৃষ্টির ছাঁটে কেতকী
অতলান্ত গভীরে ডুব দেয়
তখনো 'চোখ গেল চোখ গেল' পাপিয়ার ডাক
তখনো অরণ্যের নীরবে ভেজে
বৃষ্টি ছাপিয়ে ডাক ভেসে যায় দূর দূরান্তে অনায়াসে
'খোকা খুকি হও' '[illegible] খুকি হও'
তবু এই মুহূর্তে
নিশুতি দুপুর — কোথাও কেউ নেই
নিঃসঙ্গ একাকী, মনের চারিধারে বাতাস হয়ে ঘোরে
অজানা ফুলের গন্ধে মন প্রসন্ন অবশ হয়ে আসে
'ইষ্টি কুটুম, ইষ্টি কুটুম'
হঠাৎ হাঁচে অজানা অপরূপের আবির্ভাবে
সচকিত হয়ে ওঠে মন
'চিক্ চিক্ চিক্' — মহানন্দে টিয়াপাখির ঝাঁক
এ গাছ থেকে ও গাছ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
মনের কথা সুরে সুরে যায়
'সূর্য ঠাকুর ওঠ, সূর্য ঠাকুর ওঠ'
শ্রাবণের আকাশ ঘিরে
ডাক ভেসে যায়

কবিতার মুখ

কাজি মুরশিদুল আরেফিন

একটি কবিতার বই যেন হঠাৎ নদীর হয়ে এল
কিশোরীর মতো চঞ্চলা শঙ্খমালা
আমাকে গোপনে নিয়ে যায় অজানা ঠিকানায়,
যেতে যেতেই অক্ষরের বৃত্তগুলি ফুল হয়ে যায়।
আমি সেই ফুল রাখবো কোথায়
বেড়ে উঠতে উঠতে ফুলগুলি
হয়ে তরুণীর মতো রঙিন হয়ে ওঠে।

দুই মলাটের ভিতরে একজন কবির বাসভূমি
বর্ষায় ভিজে যায় উঠোনের মাটি
দুটি চোখে তাকিয়ে থাকে নদীর দিকে
এই নদীর বুকে নেমেছে জল, সোনালী জ্যোৎস্নার মতো।
আমিও ভিজতে থাকি আজও বৃষ্টি এলে,
শিলাবৃষ্টির মতো কবিতারা ঝরে পড়ে,
একটি দুটি ঝরণের কুচি কুড়িয়ে রাখি বুক পকেটে।

হায় বরফ সেও এক সময় জল হয়ে যায়
কবিতার শব্দগুলি জলের স্রোতে ভাসিয়ে দেয়
এই জলে পা ধুয়েছে নারী
এই জলে স্নান করেছে দুঃখবতী কবি একজন।

অক্ষর বাঁচা অর্থে বেঁচে ওঠার জন্যে
কবিতার ঘরে ধূপ ধুনো জ্বেলে দিই
অক্ষরের বৃত্ত নিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে গেঁথে রাখি
গোপনীয় সুখ, সম্পদের হিসেব-নিকেশ,
একজন কবিকে দেবো বলে এখনও খুঁজে বেড়াই ফুল
একজন কিশোরী কবি হাঁটতে-হাঁটতে তরুণী হয়ে যায়।

এসময় এখানে থামে না কোন গাড়ি
রুপোর মতো রোদ্দুর ঘামে ভিজে যায় মুখ
কখনো ছায়ার মতো দীর্ঘ শ্বাস
কানে-কানে দীর্ঘ চিঠি লেখে,
কান্নায় ভাসিয়ে দেয় বর্ণমালার স্বর,
একে আমি বেঁচে থাকা বলি
এভাবেই বেঁচে থাকতে পারে অক্ষরের সাধি।

রূপকথা

বরুণ মাইতি

একটি নদী পথ হেঁটে যায়
একলা ভীষণ একা,
একটি মেয়ে নদীর জলে
ভাসায় একুল বাধা।
একটি মেয়ে যাচ্ছে ভেসে
শুকনো ঠোঁটে রক্ত মেখে,
একটি প্রেমের বাতিল চিঠি
জলের বুকে লেখা।
নদীর জলে কাঁপছে ছায়া,
নদীর জলে একা।
ও নদী তুই একলা মেয়ে
পাথরে কুটিস মাথা!

তুই কি জানিস হাজার বছর,
কেঁদেছে নদী অষ্টপ্রহর —
নদীর বুকে ভাঙা-গড়ার
একই রূপকথা।
ও মেয়ে তুই হাজার মেয়ে,
একা ভীষণ একা।

লজ্জা

প্রবীরকুমার সামন্ত

তোমার ওখানে কিসের ভীড়?
হাট বসে যায় কথা কলাকলি।
শিছলে পড়ার দিন এসে গেলে
অন্তঃপুরের বাস টানাটানি!

ধুলায় লুটায় প্রাণপ্রিয় সাধ
অনর্থাদা কতো হানিকর কথা,
রাতের গভীরে অশ্রুপাত
কতো মনে ফাঁকি সামগ্রিক ব্যথা!

পৃথিবী আঁধার প্রত্যয়িত ঘৃণা
চানচিকাও মারে নগণ্য লাথি,
জীবন-মৃত্যুর হাসি খলখল
নদী খুঁজে তার আপনার সাথী।

চরম লজ্জার পরিত্রাণ কোথা?
সোজা দাঁড়ানোর হাঁটার শপথ,
দু'হাতে সরানো ময়লার ভাঁই —
অন্ধকার পথে মাথা অবনত।

গভীরতা

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

সূর্য নয় চুম্বনও নয়, প্রেমই চিরতম মর্মিষ্ঠ আলাপ
হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে যেন

পলকের সুষমা নয়, বড়ো ভালো লাগে স্নিগ্ধ মৌনতা
প্রাণের অতলান্ত থেকে ঝরে যায় মধুর জ্যোৎস্না

ধ্বনি নয়, শুধু অপরূপা সুরের মূর্ছনাগুলি
রাগিনীর অন্তর-জ্যোৎস্না থেকে উঠে আসে প্রাণ

নক্ষত্র নয়, নীলিমাই অধিক প্রিয়া
অসীম আকাশ থেকে উঠে আসে চেতনার অনন্ত বিস্তার

আহুতি নয়, দুটোই সৃষ্টি সুখের উল্লাস
চেতনার কল্লোল থেকে হয় মেঘ হিমেলস্নান

বৃক্ষ নয় পল্লব নয়, বরংবেশ অনি মই ভীষণ ভিতরে
নিশ্চল মূলাধার থেকে করে পড়ে জীবনের রস

পথ

অজিত বাইরী

১.
'জীবন এতো ছোট ক্যানে?'
বেজেছিল যে বাউলের একতারাতে
সে জানে, পথের শেষ নেই।
পায়ে পায়ে পথও এগিয়ে যায় দূর থেকে দূরে —

২.
'পথের শেষ কোথায়?'
মহাপ্রস্থানের পথিক যে সে-ও জানে না।
পৃথিবীর জিনাব যেখানে নিঃশেষে বিলীন, সেখান থেকে শুরু
দূরতম নক্ষত্রের পথরেখা।

অবিশ্বাস্য

অলক জানা

মুখটাকে বিশ্বাস করা যায় না
কখন যে কি বলে বসে —
গতকাল ওমুক বাবুকে শালা বলতেই
একটা চাঁস করে চড় বসিয়ে দিলেন।

হাতটাকে বিশ্বাস করা যায় না
কখন যে কি করে বসে —
সেদিন চোখ ঘষে লাল হওয়ায়
অনেক টাকার ঔষধ খেতে হ'ল।

পা-টাকে বিশ্বাস করা যায় না
কখন যে কি মাড়িয়ে বসে —
হঠাৎ দেখি বোনায় পড়েছে তার গতি
আছড় খেয়ে পড়ল মাটিতে।

চোখটাকে বিশ্বাস করা যায় না
কখন যে কি দেখে বসে —
রাস্তায় ধর্ষিতা নারী বিবস্ত্রে ঘুরছে।
সূর্যের আলোয় খুন হচ্ছে পরের পর দ মানুষ।

সততা

বাসুদেব চাটার্জি

অভিজাত হো চি মিন সরণিতে মরুর কাছে
কুড়োতে কুড়োতে
গরিব ছেলেটির হাতে ঠেকলো একটি খাম
বিস্মিত হয়ে দেখে বহু টাকা
চমক লাগে মনে, ফেরে ফেরে
ভালভাবনি হাতেই মনে প্রলোভন
চোর খুঁজে প্রশাসন
পরিশ্রান্ত নিশ্চয়ই।
প্রকাশ্যে খামটি নিয়ে হাজির থানায়
তবু দিয়ে হাসে মুক্তির হাসি।
মূল্যবোধের এই নিদারুণ অভাবের দিনে
ছেলেটির নির্লোভ মনের এই পরিচয়
বুঝিয়ে দেয়
সততাই জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যধন।

কল্পনায় তুমি

সুজিত হালদার

তোমাকে মৃত্যুঞ্জয় ভেবেছিলাম হে, ভাঙাস
তুমি প্রেমের বিধবা প্রতীক্ষার —
নিদ্রিত নক্ষত্রের রাত্রে
চাঁদের নীরব নির্বাক্
তোমের প্রবাহ সন্তরণের মতো
প্রকাশিত মুখ ঢাকে ফুলের শরীরে
বাদুড়ের ডানার গন্ধে মনে হয়
পৃথিবীটা পুলিবার দানবের মত।
এমি কেন প্রশান্ত প্রহরে
মুখের কাছে মুখ নিয়ে
আমাদের কথা বলা যায়
কিম্বা প্রশান্ত প্রলেপে
বুকের দুধে ভিজে রেখে
তোমার সাথে সূর্যাস্ত
সমস্ত ভাগ করে নেব।
সন্ধ্যা সোহাগভরে নিশ্চুপ ভিজিয়ে
আলতো চুম্বন আঁকে
ভীরু ভাবনারা মাত্র আসে
এক বিরক্ত প্রতিধ্বনির,
নিয়ম নির্মোহে অনুসারী মরা চাঁদ
অতলান্তে ডুবে যায় —
বিরক্ত প্রকৃতির প্রত্যাশায়
বাতাস কথা বলে ওঠে এবং
কম্পিত হেন কল্পনা বিলাসে
পার্থিবতা প্রহরগুলো
ভরায় উজ্জীবন।।

অণুরেণু

তরণী ঘোষ

মেয়েটি লড়াই করে
বাঁচতে চায়
বাঁচবে বললেই কি
বাঁচা যায়?
এতোদিন ঘরের মধ্যেই
ঢেকে রাখে।
আজ উন্মুক্ত করেছে নিজেকে
দেখে তাকে।
তার বুকের মধ্যে ফোটে গোলাপ
অযুতও
পিপাসা মেটাতে আসে
পশুর ভ্রমরও।
পারবে কি ঠেকাতে তাকে?
না, শেষ পর্যন্ত পারেনি
বাঁচাতে নিজেকে।
শুধু শুনতে পেয়েছে
অনাগতের স্পন্দন।
মুঠো করা হাত বুকেতে হানে।
এ কোন দুর্জয় অভিমানে?
মেয়েটি শেষ পর্যন্ত
পারেনি বাঁচাতে নিজেকে।
শুধু দিয়ে গেছে বাঁচার বাসনা
শিওটির বুকে।
তোমরা কি পারবে
প্রজ্বলিত শিরে —
জানাতে তাকে রক্তিম অভিনন্দন?
কে জানো সে?
সে তোমাদের একজন
যে রয়ে গেছে অন্ধকারে।

পা রাখলেন প্রাঙ্গণে

প্রদীপকুমার ঘোষ

বেহায়া ভাদ্রর সহ্যের বাঁধ ভাঙে না —
গলিয়ে দিল মেঘ
আকাশ থেকে।
কে হাসছে, কারা ভাসছে
খবর নেই কোনো।
টেলিফোনের তারে
নিঃসঙ্গ পাঁচকাটা ঘুড়িগুলো
দুঃখ দুঃখ মুখ নিয়ে
একবার আকাশ দ্যাখে
একবার মাটি।

এইসব দেখতে দেখতে, দেখতে দেখতে
সময় যাচ্ছে হারিয়ে
সময়ের মধ্যে।
আর ঠিক তখনই
আমার গর্ভিণী মা, আলোর রোশনাই হাতে
পা রাখলেন প্রাঙ্গণে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার লাইসেন্সপ্রাপ্ত
পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমবায় ব্যাঙ্ক

তমলুক-ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপ. ব্যাঙ্ক লি.

হেড অফিস : তমলুক, মেদিনীপুর
ফোন নং : ৬৬৯৮৩ - চেয়ারম্যান
হেড অফিস : ৬৬০৪৮, ৬৬১৭০
তমলুক শাখা : ৬৬২৭৫
(বর্তমান তমলুকসহ ১৭টি শাখার মাধ্যমে কর্মরত)

সুযোগ ও সুবিধা

- অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় আমানতের উপর সুদের হার বেশি।
- ৬ বছর ৬ মাসে জমা আমানত দ্বিগুণ হয়।
- জমা আমানতের সমস্তটাই কেবলমাত্র এই এলাকার উন্নয়নে নিয়োগ করা হয়।
- পূর্ণ বন্ধকি ঋণ ও লকারের সুযোগ আছে।
- আমানতকারীর টাকা আমানত বিমা প্রকল্প দ্বারা সুরক্ষিত।
- এলাকার পান ও ফুল চাষের উন্নয়নে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ প্রকল্প চালু আছে।
- ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের রূপায়ণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও বেকারদের স্বনির্ভরতার জন্য ব্যক্তিগত ঋণ দেওয়া হয়।
- ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনে লগ্নি করা যায়।
- অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করা হয়।
- প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে সর্বজনীন সদস্যগণকে ঋণ দান করা হয়।

ন্যাবার্ড কর্তৃক জাতীয় স্তরে ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ বর্ষে পুরস্কার প্রাপ্ত

তমলুক কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

পোষ্ট - তমলুক ❑ জেলা - মেদিনীপুর

শাখা অফিস

তমলুক প্রধান কার্যালয় শাখা ❑ পাঁশকুড়া শাখা ❑ মহিষাদল শাখা ❑ ময়না শাখা ❑ নন্দীগ্রাম শাখা ❑ চণ্ডীপুর শাখা

(তমলুক ও হলদিয়া মহকুমার একমাত্র দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দাদন প্রতিষ্ঠান)

- পান চাষ, মাছ চাষ, ফুল চাষ ইত্যাদি কৃষিক্ষেত্রে ঋণ দাদন করা হয়।
- পাম্পসেট, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ও যেকোন কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ঋণ দাদন করা হয়।
- মুরগি পালন, গাভি ক্রয়, শুকর চাষ, ছাগল চাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দাদন করা হয়।
- সর্বপ্রকার কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিলে শতকরা ৬০ টাকা সুদ অনুদান পাওয়া যাইতে পারে।
- নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার, লজ, হোটেল-কাম-রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দাদন করা হয়।
- মালবাহী বড়, ছোট লরি, বাস, ট্রেকার, ট্যাক্সি, অটোরিক্সা ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঋণ দাদন করা হয়।
- গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প ইত্যাদি তৈরির জন্য ঋণ দাদন করা হয়।
- শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে খাদি বোর্ড হইতে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অনুদান পাওয়া যাইতে পারে।
- সেভিংস, রেকারিং, ফিক্সড ডিপোজিটে শতকরা ০.৫০ টাকা সুদ বেশি দেওয়া হয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায়।
- ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যত্র বিনা রসিদে টাকা জমা দিলে অত্র ব্যাঙ্ক কোনরূপ দায়ী থাকিবে না।

বিকাশ ভট্টাচার্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

নিশিকান্ত মাইতি
সহ-সভাপতি

গোপালচন্দ্র মাইতি
সভাপতি

বর্ধমান
শহর
ও
শহরতলীর
বাসিন্দাদের
সেবায় রত ঃ—

*

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লি.

৬৫. জি টি রোড
বর্ধমান
ফোন ঃ ৬৪১৫০

দি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

রাইটার্স বিল্ডিংস
কলিকাতা

পুরী
ও
দীঘায়
মনোরম পরিবেশে
হলিডে হোম

বুকিং-এর জন্য সোসাইটি অফিসে যোগাযোগ করুন
দূরভাষ ঃ ২৩৫-৭৫৩২

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

The Presidency Division Postal Co-operative Credit Society Ltd.

Alipore H.O. Building
Calcutta - 700 027
Phone 479 6665

ESTD. 1920

With Best Compliments From

Gariahat Market Byabasayee Co-operative Credit Society Limited

Registered under the West Bengal Cooperative Societies Act of 1973

212, Rashbehari Avenue
Calcutta - 700 019
Gariahat Market Complex (2nd Floor)

RUNNING SAVINGS DEPOSIT BUSINESS ALSO.

With Best Compliments From

Philips Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 54/Cal of 1958

7, Justice Chandra Madhab Road
Calcutta - 700 020
Phone : 475 3621 (Extn. 2053)

EKO CONSTRUCTION

Dealers of Government Disposal Materials (Ferrous & Non-Ferrous) & Used Contaminated Oil.

Official Correspondence

13, Beni Master Lane
Benala
Calcutta 700 061

City Office

5, Clive Row
(Dr. Rajendra Prasad Sarani)
3rd Floor, Room No. 75
(Sarva Mangala House)
Calcutta - 700 001

Cellular	9831070356
Office	220 5655
Residence	468 7203
Godown	337 8102

Legend Glory of LALA MANGLESH

একমাত্র সমবায়-ই হইবে নতুন সহস্রাব্দে

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের

নিজস্বতার

মূলমন্ত্র

❖❖❖
❖❖
❖

হিমালয়ান কো-অপারেটিভ কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড

পোঃ পশ্চিম মল্লিকপাড়া

গ্রাম ঃ ময়নাতলী

জেলা ঃ জলপাইগুড়ি (ধূপগুড়ি)

❖
❖❖
❖❖❖

শ্রী সুধাংশু মজুমদার
সভাপতি

শ্রী সুভাষ চন্দ্র রায়
সহ-সভাপতি

শ্রী উমাশঙ্কর চক্রবর্তী
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

খেলাধুলা

সফল ফুটবল সফর ঃ এবার ভারত নতুন পথের যাত্রী

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ভারতে কি ফুটবল খেলা হয়? প্রশ্নটা আমার কাছে আদৌ অপরিচিত নয়। তাই বিবিসি-র ফুটবল কর্তারা যখন ইংল্যান্ড সফররত ভারতীয় দলের নেতা এন খান্নের উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তখন স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। কারণ বিদেশে দল যাওয়ার আগের দিন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির বাড়িতে এই বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। ওই সভায় স্থির হয় বিদেশে সাংবাদিকদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব।

কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের উপর নির্দেশ ছিল কোনও খেলোয়াড়ই সরাসরি বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলবেন না। মুখ খোলার আগে আমার অনুমতি নিতে হবে।

ভারতীয় দল ইংল্যান্ড রওনা হয় ১৮ জুলাই, ভোর ৬টায়। রওনা হওয়ার ক'দিন আগে দিল্লিতে বসেছিল ভারতীয় ফুটবল কর্মকর্তাদের সভা। ১২ জুলাই-এর ওই সভার পর রাতে আমার কাছে অনুরোধ আসে ভারতীয় দলের মিডিয়া ডিরেক্টর হিসাবে ইংল্যান্ডে যাওয়ার।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির বক্তব্য ১৯৪৮ সালে ভারত লন্ডনে গিয়েছিল অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নিতে। ৫২ বছর পর এই সফর। স্বাভাবিক কারণেই ওখানকার সাংবাদিকদের মনে অনেক প্রশ্ন উঠবে এবং স্বভাবত অনেক প্রশ্নও করবেন।

সেইজন্য ভারতীয় ফুটবলের ভাবমূর্তি তুলে ধরার দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। যেহেতু দীর্ঘ ১৪ বছর আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আমি যুক্ত রয়েছি।

ফুটবল যে ভারতে খেলা হয়, আর ওদেশের ফুটবলপ্রেমীরা যে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে উৎসুক সেটার প্রমাণ মিলেছে ওদেশের মাটিতে পা দেওয়ার পরই। ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় ভারত হেরেছিল ২-০ গোলে। কিন্তু খেলার শেষে ভারতের অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়াকে ঘিরে সমর্থকদের অভাবনীয় উল্লাস দেখে অবাক হতে হয়েছিল।

বাইচুং অনেক ফুটবলারের চেয়ে ফুটবল বুদ্ধিতে অনেক পরিণত সেই বিষয়ে ভারতীয় ফুটবল কর্মকর্তাদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। তেমনি দ্বিমত ছিল না, এই সফরে ভারতীয় ফুটবল সামান্য হলেও যে লাভবান হবে সেই বিষয়ে।

ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের ক্রীড়াপ্রেমীরা ক্রিকেট, ফুটবল ও হকি তিনটি খেলারই সমান আগ্রহী।

হকি ও ক্রিকেটে ভারত যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম সারির দল বিদেশি সাংবাদিকদের ভাল করেই জানা আছে। কিন্তু ফুটবলে বিশ্ব ক্রম তালিকায় ভারতের স্থান ১১৫। তাই ফুটবল ঘিরে ভারতীয় সমর্থকরা তেমন উৎসাহী হয়ে উঠবেন না বলেই বিদেশি সাংবাদিকদের ধারণা ছিল। কিন্তু এবারের ভারতীয় ফুটবল দলের খেলা দেখে তাদের ধারণা পাল্টেছে। আর যে ব্যবসায়ী সংস্থাটি এই সফরের আয়োজন করেছিল সেই সংস্থা এখন আগামী পাঁচ বছরের জন্য নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হতে চেয়েছে।

সবচেয়ে উল্লেখনীয় বিষয় হল টিগানার মতো খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়ও ভারতের খেলা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারত কিভাবে এতটা পিছিয়ে রয়েছে?

টিগানা বিশ্ব ফুটবলে এক অতি পরিচিত নাম। আশির দশকে ফ্রান্সকে অলিম্পিক ও ইউরো ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান করানোর পিছনে টিগানার এক বিরাট ভূমিকা ছিল। টিগানা, প্লাটিনি ও জিকিসি এই তিনজনকে বলা হয় সর্বকালের জন্যতম সেরা মিডফিল্ডার।

১৯১৮ সালে ফ্রান্স যখন বিশ্বকাপ জিতল টিগানা তাদের বলেছিলেন, সব সময় সেরা দল লড়লেই সফলতা আসে না। ভাগ্যও সাফল্যের ক্ষেত্রে অনেক সময় বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাঁর এই কথার পিছনে অবশ্য একটি যুক্তি রয়েছে। সেরা দল নিয়েও ফ্রান্সকে স্পেন ও মেক্সিকোর সেমিফাইনালে উঠে বিদায় নিতে হয়েছিল। যদি তাই না হবে অতিরিক্ত সময়ে ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকেও ৮২ সালে ফ্রান্সকে জার্মানির কাছে হারতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুট আউটে।

টিগানা ফুলহ্যামের নতুন প্রশিক্ষক। আগে দায়িত্বে ছিলেন কিগান যিনি এখন ইংল্যান্ড দলের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

কেভিন কিগানকে ফুলহ্যামে নিয়ে এসেছিলেন নতুন চেয়ারম্যান আল্ ফয়িদ। প্রিমিয়র লিগ থেকে ফুলহ্যাম নেমে এসেছিল দ্বিতীয় ডিভিশনে। পরে কিগানের প্রশিক্ষণে দলটি প্রথম ডিভিশনে উঠেছে। এবারের লক্ষ্য আগামী বছর যাতে প্রিমিয়র লিগে দল খেলে তার জন্য চেষ্টা চালানো। এই প্রসঙ্গে ফুলহ্যামের নতুন চেয়ারম্যানের পরিচয়টাও জেনে রাখা উচিত বলে মনে হয়। ফয়িদ হচ্ছেন ব্রাজকুমারী ডায়নার বন্ধু ডোডির বাবা।

ফুলহ্যামের সঙ্গে খেলার দিন আল্ ফয়িদ মাঠে ছিলেন। এশীয় ও আফ্রিকার খেলোয়াড়রা যাতে ইংল্যান্ডের লিগ ফুটবলে বেশি অংশ নেয় সেই নিয়ে অনেক কথা হল। এছাড়া তিনি প্রস্তাব দিলেন প্রতি বছর ভারতীয় ফুটবল দল যেন ইংল্যান্ডে খেলতে আসে। তারজন্য তাঁর পক্ষে যা করণীয় তা তিনি করবেন বলেও জানালেন।

ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম খেলা। তাই স্বাভাবিক কারণেই আমরা সবাই চেয়েছিলাম মাঠের কাছাকাছি কোথাও থাকতে। কিন্তু লন্ডনে নেমে শুনলাম আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে লন্ডন শহর থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরে।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির বাড়িতে যেদিন আমরা কয়েকজন মিলিত হয়েছিলাম সেদিন আমি প্রশ্নটা তুলেছিলাম, প্রশ্ন ছিল — খেলার কতক্ষণ আগে খেলোয়াড়রা মধ্যাহ্নভোজন করবেন। নিয়ম হচ্ছে খেলার অন্তত পাঁচ ঘণ্টা আগে খাওয়ার। খেলা শুরুর সময় হচ্ছে দুপুর দুটো। তাহলে ৯টার মধ্যে খাওয়ার পালা শেষ করতে হয়। তার সঙ্গে কিছু হাল্কা খাওয়ারও ব্যবস্থা রাখতে হয়। এবং উচিতও। আর সেইমতো আগের দিন রাতের খাওয়ার সময়টাও কিছু এগিয়ে নিয়ে আসা।

আমাদের সঙ্গে ডাক্তার হিসাবে যিনি গিয়েছিলেন, তিনি পাতিয়ালার সাইয়ের সঙ্গে যুক্ত। ডা. নন্দী কলকাতার নীলরতন সরকার থেকে পাশ করে পাতিয়ালায় সরকারি কাজে যুক্ত হন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি হচ্ছেন বড়। অন্য দুই ভাই থাকেন বিদেশে। একজন থাকেন আমেরিকায়, আরেকজন কাজ করেন সিঙ্গাপুরে। ঠান্ডা প্রকৃতির এই ভদ্রলোককে ইংল্যান্ডে খেলার সময় অনেকে হয়তো দূরদর্শনের পর্দায় লক্ষ্য করেছেন। কোনও খেলোয়াড় আঘাত পেয়েছেন, উনি ছুটে গিয়েছেন মাঠে। তাঁর আন্তরিক পরিচর্যায় খেলোয়াড়রা সফরের শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন।

সফরের যিনি উদ্যোক্তা সেই রাজ পুরোহিত ও তাঁর সহকর্মীরা চেষ্টা করেছিলেন কত কমে খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। প্রথম দুদিন মধ্যাহ্নভোজ সারতে হয়েছে অলে। দু-পিস চমাটো স্যান্ডউইচ, একটা আপেল ও এক প্যাকেট চিপস্। চার ঘণ্টা বাস জার্নির মধ্যে একবার এক জায়গায় মিনিট ১৫ বাস থামার ব্যবস্থা থাকলেও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এক কাপ চা খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না। অবশ্য চুনী গোস্বামী ও আমি দু'জনেই নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিলাম। এই ক্রমাগত বাস জার্নির ধকলের জন্য মাঠে অনুশীলনও অধিকাংশ দিন ঠিকমতো হয়নি।

ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে খেলার আগের দিন আমাদের চাপে শেষ পর্যন্ত এক রাতের জন্য হিথরো এয়ারপোর্টের কাছে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই খবরে খেলোয়াড়রা খুশি। ঠিক হল সকালে অনুশীলন না করে বিকালে জিমখানা মাঠে অনুশীলন করবে। তখনও কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল দুপুর ৩টার মধ্যে হোটেলে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর ৬টা নাগাদ মাঠে যাব। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না রাত দশটা পর্যন্ত হোটেলের বাইরেই কাটাতে হবে।

আমাদের ফেরার আগের দিনও একই ব্যবস্থা ছিল। সেদিনের ব্যবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। আগের দিন খেলার পর আমাদের অনেক রাতে ফিরতে হয়েছে কিং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। অনুশীলনের পক্ষে পরিবেশটা ভালই। তবে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডে ভাল খেলা। যাতে প্রতি বছর এদেশের ছেলেরা আন্তর্জাতিক ফুটবল আসরে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ পায়। ইংল্যান্ডে তিনটি খেলায় হেরেছে একটিতে, জিতেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আর গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করেছে ওয়েস্ট ব্রাউমিচ-এর সঙ্গে।

প্রশিক্ষক সুখবিন্দর সিং, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর প্রদীপ ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী ও আমি নিজেদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনায় বসতাম। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল কিভাবে ভারতীয় ফুটবলের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়।

ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে প্রিয়বাবুকে রাজি করিয়েছিলাম ভারতীয় ফুটবল সম্বন্ধে অন্তত ১৬ পাতার একটি বই বের করার। ইংল্যান্ডে ঐ বইটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। বইটি বহন করা সার্থক হয়েছে। কারণ ওখানকার সাংবাদিকদের বোঝানো গেছে ভারতীয় ফুটবল শিশু অবস্থায় নেই। ভারতে ফুটবল শতবর্ষের প্রাচীন।

যাই এফ এ কিংস শুরু হয়েছে ১৮৯৩ সালে, কলকাতা লিগ ১৮৯৮ সালে। আর বিশ্ব ফুটবল সংস্থা 'ফিফা'র জন্ম ১৯০৪ সালে। ভারত প্রথম অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নেয় লন্ডনে, ১৯৪৮ সালে। আর ঐ অলিম্পিক আসরে খালি পায়ে খেলে ভারত ফ্রান্সের কাছে হেরেছিল শেষ মুহূর্তের গোলে। ঐ খেলায় ভারত জেতার সুযোগও পেয়েছিল। কিন্তু গুরুজড়া হয়ে দু-দুটি পেনাল্টি নষ্ট করে। প্রথম পেনাল্টি শটটি নেরেছিলেন সৈলেন মান্না। সেই শটটি সরাসরি গোলরক্ষকের হাতে চলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পেনাল্টি নষ্ট করেন মহাবীর প্রসাদ। আর এখন সেই ফ্রান্স বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সম্প্রতি ওরা দখল করেছে 'ইউরো সেরা' খেতাবটিও। আর ভারত এখন বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১১৫ নম্বরে।

ইংল্যান্ডের অধিকাংশ সাংবাদিকই জানতেন না এশিয়া থেকে ভারতই প্রথম অলিম্পিক ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠেছিল। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছিল, তাহলে ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবলে কেন এত পিছিয়ে আছে?

মাঠে যদি ফুটবল ম্যাচ দেখতে অগণিত দর্শক হাজির হন, বিশ্বকাপ ও বিদেশে বড় ফুটবল খেলা টিভিতে উপভোগ করেন লক্ষাধিক ফুটবল অনুরাগী। তাহলে সেই জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভারতীয় ফুটবল কেন এগিয়ে যেতে পারছে না।

বিদেশে ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে এটাই আমার প্রথম সফর। এর আগে এশিয়া কাপ, প্রাক্-অলিম্পিক, প্রাক্-বিশ্বকাপ বা এশিয়ান গেমসে সাংবাদিক হিসাবে খেলার মাঠে উপস্থিত থেকেছি। প্রশিক্ষকদের সঙ্গে খেলা নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রয়োজনে সমালোচনাও করেছি। কিন্তু দলের একজন সদস্য হিসাবে উপস্থিত থেকে ভারতীয় ফুটবলের ভাবমূর্তি তুলে ধরার দায়িত্বে থেকে কাজ করতে গিয়ে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হল। বুঝতে পারলাম পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম।

ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ যাই বলুন না কেন, আমরা এখনও অপেশাদারি কাঠামোর মধ্যেই রয়েছি। ফুলহ্যামের সঙ্গে খেলার পর ওদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়রা জার্সি বদল করতে পারেননি। কারণ আমাদের সঙ্গে জার্সি ছিল ওই একটা সেট। একই ঘটনা পরের দুটি খেলাতেও। আর

এই ঘটনার দায়িত্ব প্রশিক্ষক বা কর্মকর্তা কেউই নিতে রাজি হয়নি।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা যে খেলার শেষে জার্সি ধোয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বা বলা যায় আমাদের কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধে দায়িত্ব পড়েছিল আমাদের সঙ্গে সবসময় দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি অফিসারের। একে নিয়োগ করেছিল রাজ পুরোহিতের লোকেরা। ভাবতে পারেন, ভারতের জার্সি ধুচ্ছে এক সাহেব সিকিউরিটি গার্ড আর ধোয়ার পর জার্সি ইস্ত্রি করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিকিউরিটি গার্ডের মা!

আসার আগের দিন আমাদের যখন লন্ডন শহর দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন যে ড্রাইভারের উপর দায়িত্ব ছিল তিনি শহরের কিছুই জানেন না। জানবেন কি করে? তিনি তো থাকেন লন্ডন থেকে ৩০০ কিমি দূরে। তাই লন্ডন শহরে প্রবেশের পর বার বার ড্রাইভার নেমে পথচারীদের রানির বাড়ির পথনির্দেশ জানতে চেয়েছেন। এক সময়তো আমরা সবাই এই মজার খেলার সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম। অনেকেই বাসের মধ্যে থেকে পথচারীদের লক্ষ্য করে বাকিংহাম প্যালেসের রাস্তা কোনদিকে সেটাই জিজ্ঞাসা করে চলেছে। শ্যামবাবু ভাবতে পারেন কলকাতার কোন সর্দারজি ড্রাইভার এসপ্ল্যানেডে এসে কোথায় রাজভবন বা রাইটার্স বিল্ডিং জিজ্ঞাসা করছে? — প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন প্রদীপ ব্যানার্জি।

রানির বাড়ি তো দেখা হ'ল কিন্তু ততক্ষণে আমাদের খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রায় শেষ। সেদিন ছিল রবিবার, সপ্তাহের শেষে যে গার্ড বদল হয় সে সম্বন্ধে আমি, চুনী প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল। তাই বাকিংহাম প্যালেসের ওই ঘটনার পর, হঠাৎ জো পল আনচারি আমার অনুরোধ করলেন, 'স্যার, আপনি তো গত বছর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এখানে দীর্ঘদিন ছিলেন, আপনি বরং আমাদের গাইড হোন।' কেরালার এই দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় তার আগের দিন আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। বাংলাদেশের সাথে খেলার দিন মধ্যাহ্নভোজ সেরে আমরা যখন বাসের জন্য অপেক্ষা করছি তখন আনচারিকে বলেছিলাম বক্সের বাইরে থেকে বল পেলেই শট নেবে। তাতে গোল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঐ বক্সের মাথা থেকে আনচারির নেওয়া শট-ই ভারতকে ছিটিয়েছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

রানির বাড়ি দেখার কথাতেই আবার ফিরে আসি। খেলোয়াড়রা বাসের মধ্যে অযথা সময় নষ্ট করার জন্য বাইচুং ভুটিয়াকে ঘিরে ততক্ষণে জেগে উঠেছে ক্ষোভ। 'তুমি অধিনায়ক, তুমিই বল এভাবে ঘোরার দরকার কি?' ওরই বন্ধু বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রস্তাব দিল। একটা প্রস্তাব সবারই পছন্দ হ'ল — আমাদের নির্দিষ্ট বাসটিকে কোথাও রেখে ট্যুরিস্ট বাস নিয়ে বের হই। কিন্তু তারজন্য পয়সা দেবে কে? আর প্রত্যেকের ঘরে ফেরার তাগিদ, কিছু কেনারও ইচ্ছে রয়েছে। তাই আর লন্ডন না ঘুরে সবাই ছুটলেন সাউদলে, বেটা বলতে গেলে এই উপমহাদেশের বাজারই বলা যায়।

ভারতীয় দলের সঙ্গে এই সফরে গিয়েছিল মোট ৩১ জন। এরমধ্যে ২২ জন খেলোয়াড়, তিনজন প্রশিক্ষক, একজন ডাক্তার, তিনজন ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তা, চুনী গোস্বামী ও আমি।

দিল্লিতে বিমানে ওঠার আগে, কার কি দায়িত্ব প্রিয়বাবু সকলকেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমার দায়িত্বটা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি সাংবাদিকরা যাতে আমাদের কর্মকর্তা কিংবা খেলোয়াড়দের মুখ দিয়ে বেফাঁস কিছু কথা না বের করেন।

ক্রিকেট বেটিং নিয়ে এদেশের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের হেনস্তা করার জন্য বিদেশি সাংবাদিকরা বেশ তৎপর ছিলেন। ভারতীয় দলের সঙ্গে যে তিনজন কর্মকর্তা গিয়েছিলেন ওঁরা হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের এন খান, বরোদার রতিন জাদেজা ও হিমাচলপ্রদেশের তেওয়ারি। এঁরা নিজেরাই জানতেন না এঁদের কি কাজ। ফলে নিজেদের প্রচারের আলোয় আনার জন্য তৎপর ছিলেন, বিশেষ করে খান।

মাঠে অনুশীলনের সময় রাজ পুরোহিতের লোকজন এসে যখন তখন খেলোয়াড়দের ক্যামেরার সামনে হাজির করাচ্ছেন। কাজটা যে ঠিক নয়, এটারই আমি ঘোরতর বিরোধী ছিলাম। পদত্যাগ করতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু ম্যাচ মরকত প্রিয়বাবু পদত্যাগের সিদ্ধান্ত না নেওয়ার অনুরোধ করেন। খান সাহেবকেও তার কি করণীয় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

ইংল্যান্ড সফরে দলের সঙ্গে থেকে অনেক অভিজ্ঞতাই হল। যেটি সবচেয়ে আনন্দের কথা সেটি হচ্ছে বাইচুং ভুটিয়ার পেশাদারি মনোভাব। ফুলহ্যামের সঙ্গে খেলার পর মাঠ থেকে সরাসরি কিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার পথে বাসের মধ্যেও ভিডিও-র পর্দায় খেলাটি দেখলাম। ভাষ্যকারের কিছু কিছু মন্তব্য আমাদের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের অস্বস্তির মধ্যে ফেললেও বাইচুং -এর প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ।

ফুলহ্যামের পর দ্বিতীয় খেলায় ওরে ব্রাউমিচ এলবিনও-এর বিরুদ্ধে ভারতের গোলশূন্য খেলাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ খেলায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে ভারত জিতেও যেতে পারতো। বিজয়নের গোলমুখী শেটার বাইচুং যে হেডটা করেছিলেন সেটা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হতো তাহলে ওই খেলায় ভারত জিততো।

বাংলাদেশের সঙ্গে খেলার আগে সকলেই ছিল চিন্তিত, তার কারণ বিদেশি প্রথম ডিভিশন দল দুটির বিরুদ্ধে আমাদের যে জেতার সম্ভাবনা কম সেটা আমরা সবাই জানতাম। কারণ ওদের এক একজন খেলোয়াড়ের প্রতি সপ্তাহে আর্থিক আয় যা ভারতীয় দলের প্রাপ্য ৩১ হাজার পাউন্ডেরও বেশি। আর বাইচুং হচ্ছে আমাদের সেরা খেলোয়াড়, সে এখনও ওখানকার দ্বিতীয় ডিভিশনের দক্ষ বারি ফুটবল দলের নিয়মিত সদস্য নয়। অধিকাংশ সময় তাকে বাতাতে হয়েছে মাঠের বাইরে। ভারতের এই ক্রীড়া-দক্ষতায় বিশেষ করে ভূবনেশ্বরে ভারতের তিনটি খেলার লাইভ টেলিকাস্ট হওয়ায় এদেশের ফুটবল অনুরাগীরাও উপলব্ধি করেছে যে আমাদের ছেলেরাও যদি সুযোগ পায় তাহলে বিদেশি দলের বিরুদ্ধে তারা মাথা উঁচু করে সংগ্রাম করতে পারবে। তাই ভারতীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাক্ বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলকে বিদেশে পাঠানো কিছু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। তবে এই মুহূর্তে যেটা দরকার কোন একটা টুর্নামেন্টে ভারতের সাফল্য লাভ করা। আর প্রাক্ বিশ্বকাপে আমাদের প্রাথমিক পর্বে শক্তিশালী দেশ হিসাবে একমাত্র ইউ এ ই আছে যাদের কাছে আমরা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৬৬ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত হেরেছি ৩-১ গোলে — অভিজ্ঞতার অভাবে। তাই আমাদের জাতীয় কোচ সুখবিন্দর ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলায় উজ্জীবিত ও উৎসাহিত। ওঁর প্রত্যাশা, ভারত প্রাক্বিশ্বকাপে প্রাথমিক গন্ডি পার হতে পারবে।

ভারত পারবে কি পারবে না সে প্রশ্নের উত্তর মিলবে মে মাসের শেষের দিকে কিন্তু তার আগে আমাদের ফুটবল কর্তৃপক্ষ কিভাবে অনুশীলনের ব্যবস্থা করে সেটাই দেখার! ☐

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

Park Circus Market Byabasayee Co-operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 9/Cal. of 1981.

126/1, M.S.T. Park Circus Market
47, Karaya Road
Calcutta - 700 017

With Best Compliments From

BALLYGUNGE NEW MARKET CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

46/31/1, GARIAHAT ROAD
CALCUTTA - 700 029

With
Best
Compliments
From :

Science Association Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

Jadavpur
Calcutta - 700 032

With Best Compliments From :

IICB EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

4, Raja S. C. Mullick Road
Calcutta - 700 032

পুরীর সমুদ্র বেলায়
দূর দিগন্তে মিশেছে আকাশ আর সমুদ্রের নীল
ঝাউ-এর মর্মর তান
মনকে নিয়ে যায় কোন সুদূরে —

স্বল্প খরচে, স্বাস্থ্যকর এবং ঘরোয়া পরিবেশে আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে

সুস্বাস্থ্য

হলিডে হোম

- পুরীতে স্বর্গদ্বারে ভারত সেবাশ্রম সংঘ লাইব্রেরীর পাশেই
- স্বয়ং সম্পূর্ণ আলো বাতাস যুক্ত ঘর
- প্রতি ঘরে চারজনের থাকার সুবন্দোবস্ত
- সংলগ্ন রান্নাঘর ও ভাণ্ডার
- বিনা ব্যয়ে ব্যবহার্য সমস্ত উপকরণ

জেনারেটরের বিশেষ ব্যবস্থা আছে

বিশদ বিবরণ ও বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন :

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল হস্‌পিটাল ফর চিলড্রেন স্টাফ্ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

১১১, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড, কলিকাতা - ৫৪
ফোন নং : ৩৫২ ৮১০১/৩৫২ ৯৭৪০
সকাল ১১টা থেকে ৫টা

তত্ত্বাবধায়ক — শ্রীআনন্দ চন্দ্র দাস

N. B. : HOLIDAY HOME AT DARJEELING HAS BEEN TEMPORARILY CLOSED.

বাঙালি কি খেতে ভালবাসে ..... মাছ

বাঙালি কোথায় যেতে পছন্দ করে ..... পাহাড়ে অথবা সাগরে

তাই

বাঙালির আপনজন (বেনফিস) নিবেদন করছে

ভ্রমণ বিভাগ

বেনফিসের ট্যুরিস্ট লজগুলি পাবেন নিম্নে জায়গাগুলিতে

শঙ্করপুর (কিনারা)
দেউলারগণ্ড (সাগরকন্যা ও সাগরি)
দার্জিলিং (হিমালয়া)
ডায়মন্ডহারবার (গঙ্গা)
দিঘা (মীনালয় ও মীনাক্ষী)
জলপাইগুড়ি (আরণ্যক)

খাদ্য তালিকা

বেনফিসের স্টল এবং মোবাইল ভ্যানগুলিতে পাবেন

১। ফিস ফ্রাই ২। ফিস বাটার ফ্রাই ৩। ফিস রোল ৪। ফিস সিঙ্গাড়া ৫। প্রণ পকোড়া ৬। ফিস ফিঙ্গার ৭। ফিস টিকিয়া ৮। চিলি ফিস ৯। ফিস তন্দুরী ১০। চিলি কাঁকড়া ১১। ফিস কবিরাজি ১২। তপনে ফ্রাই ১৩। ফিস বিরিয়ানি ১৪। ভাপা বা সর্ষে ইলিশ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

ফোন : ৩৫৫-৪৯৩১

পি-১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল)

কলিকাতা -৭০০ ০৫৪

বেনফিস
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিসারিজ
গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিয়োজিত

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭

ফোন : ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৭২ * ফ্যাক্স : ২৪৭-৭১২৮

প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা

১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ১১৭.২৫ কোটি টাকা, কৃষিক্ষেত্রে ৬১.৬৭ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে ৪৬.০৮ কোটি টাকা, আবাসন প্রকল্পে ৯.৫০ কোটি টাকা।

কৃষি, অকৃষি ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে পশ্চিমবাংলায় গত বছরের সর্বমোট লগ্নি ৬৫ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ও পরিবহণে গত চার বছরে আমাদের লগ্নি ৫৮ কোটি টাকা।

গ্রামে কিংবা শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ দানে আমরাই অগ্রণী — এখনও পর্যন্ত লগ্নির পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা।

আমরা স্ট্যাম্প ডিউটিসহ কোন ঋণ দাদন করি না, কারণ আমাদের ঋণ গ্রহণের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটি লাগে না।

সুদের উপর উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না। আয়কর আইনের ১৯৪ ধারা অনুযায়ী স্বল্প সঞ্চয় দপ্তর ছাড়া আর কোনও প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানতে এই সুযোগ নেই।

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LTD.

11, ABDUL HAMID STREET, CALCUTTA - 700 069.
PH NO. 248-9413/2621, FAX - 210-4122, TELEGRAM SELPHELP/69
ESTD. - 1923

1. A premier Co-operative Bank functioning under Banking Regulation Act
2. Provides Banking facilities to members & also to public.
3. All deposits covered under deposit insurance Act.
4. Nomination under section 45 ZA of the Banking Companies Nomination Rules 1985 in respect of Bank Deposits
5. Minor Accounts allowed as Banking Rules.
6. Premature encashment as per Banking Rules.
7. We give loan against NSC/KVP/FIXED DEPOSITS/RECURRING DEPOSITS etc. on easy terms & conditions
8. Term deposits & Re-investment plan.
9. Rates of interest on various deposits as R B.I. Guideline (as applicable to Co-operative Societies/Banks)
10. We allow more interest than commercial Banks as per R B.I. guidelines as applicable to the Co-operative Society
11. Sub clearing facility under sub clearing membership with The West Bengal State Co-operative Bank Ltd
12. Join with our PLATINUM JUBILEE SPECIAL SCHEME.
13. Double your money in 69 months annualised yield 17.39%

Sekhar Kanti Dasgupta
Sr. Vice-Chairman

Asim Kumar Basu
Chairman

FOR STANDARD QUALITY, CORRECT WEIGHT, REASONABLE PRICE

STEP IN AND SHOP AT

SAMAVAYIKA

Lindsay Street, Hazra Road, Maniktala,
Rash Behari Avenue, C. R. Avenue,
Ekdalia Road, Hatibagan

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.
113/1/1A, Hazra Road
Calcutta - 700 026
Phone : 475 5566, 475 2390

দি সিউড়ি ক্রেডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত
ফোন নং : সিউড়ি-৫৫-৫১৭, ৫৭-০০৮, এস টি ডি : ০৩৪৬২
স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।

২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, বিলাস দ্রব্য, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার ঋণ পাওয়ার সুবিধা আছে

৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমস্ত আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।

৪। সেফ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়

৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।

৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় কর্মরতরা ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

Feeding the teeming millions

Coming into existence way back in 1980, KRIBHCO is today the world's premier fertiliser producing cooperative.

With its large Ammonia, Urea complex at Hazira (Surat), KRIBHCO has ever maintained its tradition of excellent performance and established umpteen records in the fields of production, marketing and finance.

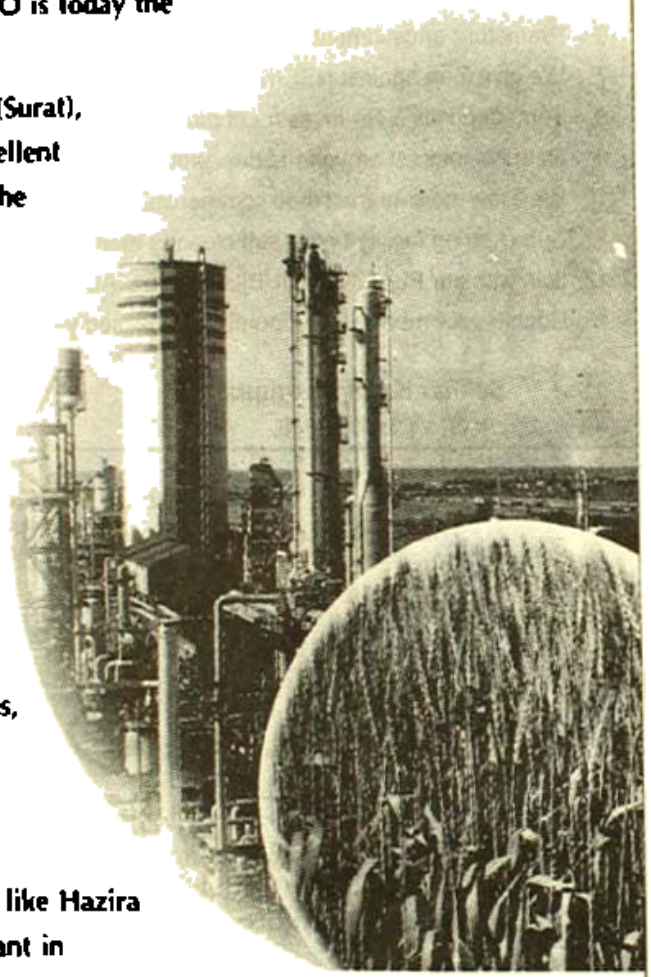

Over the years, the Society has emerged as the true friend of the farming community working for its overall development. And along the way, sowing seeds of nation's progress and prosperity. KRIBHCO plays a significant role in raising farm productivity and profitability by manufacturing and marketing quality fertilisers and seeds. Consolidating this are its farmer-friendly programmes like farmers' meetings, crop seminars, technological melas, field demonstrations, Rainfed Farming Projects, Command Area Development Programmes etc.

KRIBHCO has embarked on a major expansion/ diversification programme with proposed projects like Hazira Phase-II, Gorakhpur Fertiliser Project, a power plant in Gujarat and joint venture fertiliser projects in Oman and Iran.

KRIBHCO

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LIMITED

Regd. Office : Red Rose House, 49-50, Nehru Place, New Delhi-110019

***Calcutta Office* : 246B, Lake Town, Block B, Calcutta - 700 089**

HELPING FARMERS TO HELP THEMSELVES.

গল্প

অসুখ

অশোককুমার হাইত

সেই সকাল থেকে শাকিলকে পড়াতে বসেছে সাইমা। পড়া কি প্রহরপর্ব তা বোঝা মুশকিল। তিন বছরের শাকিলকে নিয়ে এই কিছুদিন কলকাতায় এসেছে। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে পরীক্ষা দিতে হবে। গৃহশিক্ষক প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন। ইংরেজিতে গড়গড় করে কথা বলতে হবে। এক থেকে একশো পর্যন্ত ইংরেজিতে বলতে হবে। সোজা দিকে বা উল্টো গুণে, পশুপাখির ডাক মুখস্থ করতে হবে, ইংরেজি রচনা লিখতে হবে ইত্যাদি। অঙ্কের ব্যাপারে প্রেসক্রিপশন-মোদ্দা বিয়োগ গুণ ভাগ লিখতে হবে, নামতা মুখস্থ করতে হবে। এই রকম আরও কত কি! সবই শেখানো চলছে। তোতা-পাখির মত সব গিলে চলেছে শাকিল। বাংলা পড়াতে সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছে সাইমা। শিক্ষক বলে গেছে চার অক্ষরের বানান বলতে হবে। নিজের সম্বন্ধে রচনা লিখতে হবে। গতকাল বর্ণমালা শিখিয়ে দিয়েছে। সকাল থেকে দুপুরে অক্ষর চিনিয়েছে, আর বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত সব অক্ষর লেখা শিখিয়েছে। আজ সকালে চার অক্ষরের বানান শিখতে হবে আর বাংলা রচনা লিখতে হবে। কিন্তু ছেলেটা কিছুই পারছে না। সাইমা বুঝতে পারছে না কি করে ছেলেটা এত বোকা হল। ওর আব্বাতো খুব মেধাবী ছিল আর নিজে তো ভাল নম্বর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে। ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাই মানবরূপী শাখামৃগটিকে কখনও পিঠে, কখনও হাতে বা পায়ে আঘাত করে প্রবঞ্চকের প্রাপ্য প্রতিদান দিচ্ছিল। শিশুটি যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছিল। কান্নাতে সময় নষ্ট হচ্ছে। তার জন্যও মার খেতে হচ্ছে।

শাকিল বুঝতে পারছে না তার স্নেহময়ী মা দুদিনে এত নিষ্ঠুর কি করে হল। মায়ের মুখ দেখে তার ভয় করছিল। যাকে এতদিন পরম ভরসার স্থল ভাবত আজ তাকে ছেড়ে পালাতে চাইছে। মা একটু চোখের আড়াল হলেই কখনও খাটের নীচে, কখনও পর্দার আড়ালে লুকিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। মায়ের সাথে লুকোচুরি আর আনন্দের খেলা নয় প্রাণ বাঁচানোর অবলম্বন মাত্র। শাকিল ভুলে গেছে গান গাওয়া, পাখি দেখা, আকাশের বুকে মেঘের নকশা দেখা। তাকে শুধু দেখতে হয় ধূসর বর্ণের বই, খাতা ও পেনসিল। পেনসিল দিয়ে নির্দিষ্ট ঘরগুলি ছক লিখছে যার কোন মানে নেই ওর কাছে। জেরক্স মেশিন যেমন ত্রুটিপূর্ণ সম্বলিত লেখা হুবহু লিখে দেয়, দক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবি অবিকল এঁকে দেয় আর আরশি তার সম্মুখের ছবির অনবদ্য রূপ প্রতিবিম্বিত করে। তেমনি শিশু শাকিল চোখ বুজে বলে যায়, 'অ-এ-উকার, আ-এ-ঋ, ই-এ-ঐকার, উ-এ আকার — কুম্ভটিকা। মাই নেম ইজ শাকিল, মাই ফাদারস্ নেম ইজ জাকির হোসেন, আই লিভ ইন কালকাটা' ইত্যাদি আরও কত কি! শিশুর মুখে ইংরেজি শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মায়ের মন। রাগ ভুলে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে। চোখ বুজে বলতে বলতে অজান্তে শাকিল ঘুমিয়ে পড়ে। একটু পরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইংরেজিতে বিড় বিড় করতে থাকে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠে — লাগছে না, খুব লাগছে — বলছি, বলছি — ওড মর্নিং স্যার, মে আই টেক সিট, থ্যাঙ্ক ইউ। সাইমা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে চায়। কিন্তু অবচেতনের যে গভীর স্তরে শাকিল বিচরণ করছে সেখানে মায়ের ডাক পৌঁছায় না। সেখানে অঙ্ক নেই, আম্মা নেই, চাচা নেই কেউ নেই আছে শুধু কিছু অর্থহীন শব্দ অপরিচিত প্রতিকৃতি সেখানে ভাষা কোন কথা বোঝায় না। বাস্তব ইংরেজি-বাংলা শব্দগুলি এক অদ্ভুত রহস্যাবৃত জগতের সৃষ্টি করে, যের না কোন আলোর চিকন সাইমা ছেলেকে দেখে ভয় পেয়ে যায় আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। বাড়ির সকলে ছুটে আসে। তৎক্ষণে শাকিল জেগে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সকলের দিকে। বাপজান আমার, আর তোকে মারব না—বলতে বলতে শাকিলকে কোলে তুলে কাঁদতে থাকে সাইমা। শাকিল চুপ করে দেখতে থাকে। তার মনের ভয় তখনও উধাও হয়নি। জড়ভরত হয়ে গলা জড়িয়ে থাকে। ভাবে এটা তার আগের মা তো?

বাড়িতে কান্নাকাটি শুনে পাশের বাড়ির পিসু মাসি ছুটে এসেছিলেন। কী হল রে তোদের? সেই সকাল থেকে শুনছি বুধের শিশুটিকে পড়াচ্ছিস আর মারছিস। জানি না বাবা, কি তোদের পড়ানোর ছিরি! লেখাপড়া তো আমরাও করেছি। দু' বছরে হাতে খড়ি। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া। কই আমরা তো কম শিখিনি। তিন বছরের শিশু ওর তো এখন খেলে বেড়ানোর সময়। আ তো তোরা লিখি না। ঘুগের হাওয়া বলেছে, হয়তো একটু পড়তে হবে। কিন্তু তা বলে এ রকম। মাতৃভাষাটাই শিখল না আর তোরা গেলাচ্ছিস ইংরেজি। সব কিছুর তো সময়-অসময় বলে কথা আছে।

— কী করব মাসি, সাইমার উত্তর। স্কুলে ভর্তি হতে না পারলে যে ছেলেটা মানুষ হবে না।

— ওসব তোদের অতিরিক্ত চাহিদা। বাড়াবাড়ি করিস না। সে, ছেলেটাকে খেলাতে সে। ওর চেহারাটা দেখেছিস? চোখে কালি পড়েছে, দুর্বল শরীর আর দেখ সারাদিন ধরে লিখিয়ে আঙুলে কড়া পড়ে গেছে। তোরা কি ছেলেটাকে মেরে ফেলবি?

— ভাতকে ওঠে সাইমা। অন্যরা জানে, সে কী চায়। একমাত্র সন্তান, প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সকাল বিকেল সন্ধ্যা ওকে ভরিয়ে রাখে ওই এক রত্তি ছেলে। কতেক বছর আগের এক মেয়ে জীবনের কথা মনে হয়। সবই ক্লান্তি মাখিক চলত। বৈচিত্র্যহীন জীবন—সকালের লাল সূর্য দেখে বাড়ির কাজ করা, কাজ করতে করতে দুপুর, দুপুরে একলা বিছানায় বসে বই পড়া। সন্ধ্যায় আবার কাজ। তারপর আবার আগামীদিনের অপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র পড়তে আর ভাল লাগে না। টিভির অনুষ্ঠানগুলিও বড় একঘেয়েমিতে ভরা। হাঁপিয়ে উঠেছিল জীবন নিয়ে। জাকির অফিসে চলে গেলেই পৃথিবীটা জনশূন্য মনে হত। ওকে হিংসে করত। তোমরা বাইরে যাও। নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। আমার অবস্থা ভেবেছ কখনও। জাকির কোন সমাধান দেখাতে পারত না। জীবন পরিবর্তন চায় — দুঃখ হোক, নিপীড়ন হোক। সেটাকেও মাঝে মাঝে ভাল লাগে।

তারপর শাকিল এসেছে। সাইমা প্রতিদিন ওর বড় হয়ে উঠা দৈনন্দিন নড়াচড়া ওধা বলা বা চুপ করে থাকা অভিব্যক্তির মাঝেও আনন্দ পেয়েছে। নিজেকে তৃপ্ত ভেবেছে। সেই অনাবিল সুখরাশি জীবনের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

পিতৃ মনির কথা তার মরমে আঘাত করে। শুধু ভাবে তার মনের কথা কেউ বুঝল না। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে হলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সব ভাল স্কুলেই ভর্তির পরীক্ষা নেবে। ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়া দরকার। কলকাতায় এসে অবধি স্কুলের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছে; সবাই জন্মের তারিখ ঠিক করে দিয়েছে। তার আগে জন্মালে ফর্ম দেবে না। একটু অসময়ে ওরা কলকাতায় এসেছে। সব জায়গায় বলছে ছেলের বয়স বেশি হয়ে গেছে। সেন্ট-মার্কা সব স্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলগুলিতে একই অবস্থা, ঠাঁই নেই কোথাও। স্কুলের সামনে লম্বা লাইন এঁকে বেঁকে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। অনেক জায়গায় লাইন দিয়েও ফর্ম পাওনি শেষ হয়ে গেছে। সকালে উঠেই লাইন দিতে চলে গেছে সাইমা; বিকেলে ফিরেছে শূন্য হাতে। তখন তার মাথা ঝনঝন্ করে ঘুরছে, যতটা না ক্লান্তি তার চেয়েও বেশি হতাশায়।

মায়ের কাছে সন্ধ্যে বেলা যখন বসে আছে তখন এক বন্ধু একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সাইমার সাথে দেখা করতে এল। পরিচয়পর্ব শেষ হলে, সেই ভদ্রলোক বললেন—কিছু চিন্তা করবেন না বিদি, আপনার ছেলের জন্মের প্রমাণপত্র বার করে নেবে: কোন তারিখের সার্টিফিকেট চাই বলুন। তারিখটা, নামটা, আপনার নাম লিখে দেবেন। হয়ে যাবে।

— কী বলছেন দাদাই, এত অন্যায়।

— আরে বিদি, এটাই চলছে আজকাল। বলেই ব্যাগটা খুলে ৩২ খানা বার্থ-সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলল, দেখুন এগুলি আজই ডেলিভারি দিতে হবে। তিনদিনের অর্ডারে বার করে দিয়েছি।

— এরা ধরা পড়ে না?

— হাসালেন বিদি। শহরের এতগুলি ওয়ার্ড, তার প্রত্যেকটাতে দশ-বিশখানা রেজিস্টার, পুলিশ কেস স্বয়ং লেখক আসলেও কিছু করতে পারবে না।

— কিছুটা কৌতূহলবশেই সাইমা জিজ্ঞেস করল। ওত টাকা লাগবে?

— বিদি, নানা রকমের রেট আছে। হোম ডেলিভারি হলে তিনশ টাকা, নার্সিং হোমে হলে পাঁচশ টাকা আর বিদি যদি হাসপাতালের ডাক্তার তাহলে দেড় হাজার পড়বে।

— দেড় হাজার!

— বিদি বুঝতেই পারছেন। পাকা কাজ, অনেক জায়গায় লেনদেন আছে। কি, কোনটা চাই? অর্ডার হলে পরশু দিন, রেটটা ডবল হবে। কিছু চিন্তা করবেন না বিদি, স্কুলের ছেলেগুলি দেখলেই বুঝবেন বয়সে কত জল মেশানো আছে।

— আমাকে একটু ভাবতে দিন। কাল খবর দেবো।

লোকটা চলে যেতেই সাইমা ভাবতে বসল। এত বড় অন্যায় করবে! জীবনের চলার পথটা মিথ্যা দিয়ে শুরু হবে। সারাজীবন ওই জ্বালা সহ্য করতে হবে। দুটি জন্মদিনের ব্যাথা দিতে হবে। স্কুলের বন্ধুরা জন্মদিনে আসবে; আনন্দ করে, হৈ হুল্লোড় করে চলে যাবে। আর তখন একদিন মা গোপনে ছেলেকে জন্মদিনের আশীর্বাদ দেবে। ছেলেকে বলতে হবে কারও কারও দুবার জন্ম হয়। তাদের বলে দ্বিজ। যেমন পাখি। তুমি হলে আমার সোনার পাখি তাই তোমার দুটি জন্মদিন। কিন্তু কতদিন। শাকিল বুঝবে মা মিথ্যা কথা বলছে। মায়ের প্রতি তার বিশ্বাস আর থাকবে না। ধীরে ধীরে স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধার ভীতটা নড়বড়ে হয়ে যাবে। তখন কি ছেলেকে আর বলতে পারবে-জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী! গেটের ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত গোঙানী ঠেলে বেরিয়ে আসে। সশব্দে বলে না ...। এ হতে পারে না।

ফিরে তাকিয়ে ওর মা বলে, কী ভাবছিস রে অত? তোরা মফস্বলে থাকলে ভাল করতিস। ওখানকার স্কুলে ছেলেকে পড়াতিস। কত ভাল হত।

— না না। ওখানকার স্কুলগুলির কথা তুমি বোধ হয় শোননি। শিক্ষকরা কেউ সব্জির ব্যবসা করে, কেউ পাটের আড়তদার, কেউ বা রাজনীতি করে। স্কুলে এসে দায়সারা কাজ সারে আসল কাজ তো বাড়িতে। আর যারা রাজনীতি করে তারা তো আরও চমৎকার। একজন একজনকে ও বলেছিল তুমি স্কুলে না এসে, ক্লাস না পড়িয়ে মাইনে নাও। তোমার সংকোচ হয় না?

— তা হবে কেন! আমার বদলে তো একজনকে তো দিয়েছি। সেই ক্লাস নিয়ে নেয়। পাঁচশ করে নিই। আমি তো তবু একজনকে দিয়েছি, তোমাদের আকবর আলি তো বড় পার্টি করে ও তো স্কুলেও আসে না। কোন ব্যবস্থাও করে দেয়নি। তোমরা তাকে কিছু বল না তো!

ওখানে দিলে আর কিছুই শিখবে না মা। তাই তো চলে এলাম। কিন্তু এখানে যা অবস্থা তাতে ছেলেকে ভর্তি করাতেই পারব বলে মনে হচ্ছে না।

জাকির এলে একটু ভরসা পাই। এই বলে আবার ছেলেকে নিয়ে কসরত শুরু করে দিল। সকাল পেরিয়ে ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে গেল। সন্ধ্যের সময় বাইরের কলিং বেল বেজে উঠল। জাকির বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অনেকদিন পরে ফিরছে। কখন শাকিলকে দেখবে সেই আশায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ভাবছে শাকিল দরজা খুলে দেবে; তারপর হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে যাবে ও কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মাকে এমনও হত চারতলার বারান্দা থেকে দেখেই চিৎকার করে ওকে ডাকতে শুরু করত। ছুটে নেমে আসত নীচে।

আব্বা ওর মুক্ত আকাশ, যেখানে অবাধে পাখা মেলে দিগন্তের দিকে উড়ে চলা যায়। ঝুরঝুর করে বাতাস উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম থেকে বয়ে শীতল কোমল স্পর্শ নেয়। জাকির পরম আনন্দে শাকিলকে তোলে নিয়ে ঘুরতে থাকত।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার কলিং বেলটা বাজাতেই, দরজাটা খুলে গেল। সাইমা কোন কথা না বলেই ভিতরে চলে গেল। জাকির সোফায় বসে পড়ল। চিৎকার করে উঠল, শাকিল কী করছে? একটু পরে শাকিল এল, তার পা কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না। জড়ের মত সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শাকিলকে জিজ্ঞেস করল — কি রে সারাদিন? দরজার সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কেন দরজাটাও খুলতে পার না। সামান্য কাজও তুমি করতে পারবে না কেন। বলেই সজোরে চড় বসিয়ে দিলে ছেলেটির গালে। ফরসা নরম গালে পাঁচটা আঙুলের দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কোনো কথা বলতে পারল না।

— ছুটে এসে সাইমা কোলে তুলে নিল শাকিলকে।

— কেন মারলে ওকে? কী অপরাধ করেছে?

— কোন সদুত্তর জাকির দিতে পারল না। কীভাবে বোঝাবে সে কি চায়। শাকিল তার কাছে আসুক। আদর করুক। এই ন্যূনতম চাহিদাটুকুও পূরণ করতে পারছে না। শাকিলকে কেউ কেন ওর থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এই বিচ্ছেদ বেদনা বোঝাতে পারছে না জাকির।

— কি হয়েছে শাকিল, তুমি আব্বার কাছে গেলে না কেন? ক্রন্দনরত শাকিল কোনক্রমে বলল, ভাবলাম পড়ছি ওনলে আব্বা খুশি হবে তাই।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শাকিলের ভর্তির পরীক্ষা। স্কুলের গেটে তীব্রণ ভিড়। বাবা মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে। মাইকে ঘোষণা হল অভিভাবকরা যেন তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলের ভিতরে ছেড়ে দেন। তাঁরা বাইরে থাকবেন। আবার এক অনিশ্চয়তায় সাইমা জাকিরের বুক কাঁপতে লাগল। পাঁচ-ছ'শ শিশু, এর মধ্যে হারিয়ে গেল, কি করবে। আল্লার ভরসায় ছেড়ে দিল। শুরু হল ভর্তির পরীক্ষা। দেড় ঘন্টার পরীক্ষা। এই লেখা পরীক্ষায় নির্বাচিত হলে পরে মৌখিক পরীক্ষা। আল্লার বুক বেঁধে দুজনে অপেক্ষা করতে লাগল। এক ঘন্টা কেটে গেল। সকলে নিশ্চুপ। কারও মুখে কোনো শব্দ নেই। হঠাৎ স্কুলের ভিতরে একটা চেঁচামেচির শব্দ। কি হয়েছে? সকলের একই প্রশ্ন। মাইকে কি একটা ঘোষণা করা হচ্ছে ভাল শোনা যাচ্ছে সকলে শুনছে।

জাকির হোসেন—সাইমা বেগম, আপনারা দয়া করে স্কুলের ভিতরে আসুন। চমকে উঠল ওরা দুজন

ওরা ছুটে চলেছে। একশ ফুট দূরত্ব যেন হাজার মাইলের মত। কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। কি হয়েছে, কি হয়েছে বলতে বলতে কন্যা হলঘরের মধ্যে ওরা ঢুকল। শাকিল শুয়ে আছে বেঞ্চের উপর। কয়েকজন শিক্ষিকা ওকে ঘিরে আছে, শাকিল শূন্য চোখে চেয়ে আছে 'শূন্য দৃষ্টি', কথা বলছে না, মাথে মাঝে বিড় বিড় করছে

— প্রিন্সিপাল বললেন ওকে একুণি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে ওর অসুখ করেছে; হয়তো বা মাথার অসুখ। ❑

অবসর বিনোদনের জন্য চলে আসুন

পুরীতে

ঘরে বসে সমুদ্র দেখুন। মনোরম পরিবেশে বাথরুম সংলগ্ন চার শয্যা বিশিষ্ট দুটি ঘর।

(স্বর্গদ্বারের পাশে)

যোগাযোগের ঠিকানা :

কলিকাতা ডক লেবার বোর্ড স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

২০বি, আবুল হামিদ স্ট্রিট (বি আই স্ট্রিট), (দ্বিতীয় তল)

কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ—

সাতগাছিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

সাতগাছিয়া (কালনা রোড), বর্ধমান

- সমিতির মাধ্যমে আপনার সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলুন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিক সুদ পাড করুন।
- সমিতি নিম্নলিখিত ব্যবসায় আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে —
  সার, কীটনাশক ঔষধ, বীজ, কাপড়, এল পি গ্যাস (সরকারি)
- পোস্টাল সার্টিফিকেট বন্ধক দিয়া ঋণের সুবিধা আছে।
- চাকুরিজীবীদের জন্য গৃহ সংস্কার ও গাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঋণের সুবিধা।

গোপগন্ডার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি লি.

পোঃ- গোপগন্ডার, জেলা ঃ বর্ধমান, মেমারী - ১ ব্লক

রেজিঃ নং - ৪০, তাং - ১২-২-১৯৫৯

পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আমাদের সমিতি।

জনসাধারণের জন্য আমাদের প্রকল্পসমূহ ঃ—

গোপগন্ডার ইউসিএসলিঃ

- ★ স্বল্প সুদে সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দেওয়া হয়।
- ★ সকল প্রকার রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ও খইল বিক্রয় করা হয়।
- ★ সকলপ্রকার বস্ত্র, কন্ট্রোল, নন-কন্ট্রোল দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
- ★ সমিতির নিজস্ব ট্রাক্টর দিয়ে কম খরচে চাষিদের জমি কর্ষণ করা হয়।
- ★ সমিতির এলাকায় বিভিন্ন মৌজায় ৩২টি মিনি ডিপ-টিউবওয়েল সেচের কাজে নিয়োজিত।
- ★ পিতল ও কাঁসার দ্রব্য অল্প সুদে বন্ধক নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
- ★ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যাদের বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদান।

আমানত প্রকল্প ঃ-

সেভিংস, টাইম ডিপোজিট, ফিক্সড ডিপোজিট, রেকারিং ডিপোজিট।

(আমাদের সমিতিতে সুদের হার অন্য যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশী প্রদেয়)

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত
শিখে যা আমরে আয়,
মুক্তি জনের নবীন মন্ত্র "সমবায়-সমবায়"।

নিমাইচরণ দত্ত	তারকনাথ দত্ত	ভবানীপ্রসাদ ঘোষ
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

With Best Compliments From :

BIRBHUM DISTRICT
CENTRAL CO-OPERATIVE
BANK

Manager

With Best Compliments Of :-

Narayan Chandra Dey

Govt. & General Order Supplier

Vill. - Garsafat
P.O. - Moyna
Dist Midnapur
Pin 721629

With Best Compliments From :

SINGHARI PURBAPARA HANDLOOM
DEVELOPMENT CENTRE

Implemented By :

SINGHARI PURBAPARA ADARSHA TANTUBAY SAMABAY SAMITY LTD.

Regd. No. 42 D.H.T. & A.D.A. Date 10.3.86

Vill. Singhari
P. O. - Lakshmipur
Dist. Burdwan

All kinds of Daccai Jamdani & Buti Sari Manufacturer & Suppliers.

With Best Compliments From

RAMPARA SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.

Regd. No. - 14 *Date : 22-2-1930*

Vill & P.O. : Rampara
Murshidabad
Pin : 742 189, W.B.

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

পরিচালিত

হলিডে হোম

গোপালচন্দ্র সেন মেমোরিয়াল

হলিডে হোম

পুরী

(স্বর্গদ্বার সমুদ্র সৈকতে)

পি সি ভি মল্লিক মেমোরিয়াল

হলিডে হোম

দীঘা

(পুরাতন দীঘা)

ডঃ বিপ্রদা সেন মেমোরিয়াল

হলিডে হোম

শিমুলতলা

(দেওঘর/মধুপুরের সন্নিকটে)

বুকিং/যোগাযোগ

অরবিন্দ ভবন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফোন : ৪৭৩-৪৪৯৫/৪৬৪৩ (সকাল ১০টা থেকে ৫টা)

৪৮৩-৮৪৪১ (৫-৩০ থেকে ৭-৩০)

With
Best
Compliments
From :

Bharat Brakes and Valves Employees' Co-operative Credit Society Limited

(Regd. No. 24/CAL of 1983)

22, Gobra Road
Calcutta - 700 014
Phones : (033) 244 3854, 244 1756

With Best Compliments from :

THE ELECTRO URBAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED.

HONESTY, SINCERITY & INTEGRITY IS OUR MOTTO.

বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

রেজিঃ অফিস : সিউড়ি
পোঃ সিউড়ি, বীরভূম
ফোন : (০৩৪৬২) ৫৫৩০৪/৫৫৩২৮

১৯৯৯-২০০০ সমবায় বৎসরে পুঞ্জীভূত লোকসান নিঃশেষ করে লাভ করতে চলেছে। ২টি সান্ধ্য শাখা সহ মোট ১৬ (ষোলটি) শাখার মাধ্যমে আমাদের ব্যাঙ্ক উত্তরোত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

জেলার সর্বত্র আমাদের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার শপথ আমরা নিয়েছি।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য — ২০০০-এর ১লা এপ্রিল থেকে আমাদের ব্যাঙ্ক ICDP (Integrated Coop. Development Project) বা সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের PIA (Project Implementing Agency) বা পরিকল্পনা রূপায়ণ সংস্থা হিসাবে কাজ করে চলেছে — আপাতত যার মেয়াদ আগামী ৩১/৩/২০০৫ পর্যন্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও NCDC (National Coop. Development Corporation) বা জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম যৌথভাবে এই প্রকল্পের উদ্গাতা। এই উদ্দেশ্যে একটি PIT (Project Implementing Team) বা প্রকল্প বাস্তবায়ন দল গঠিত হয়েছে।

ব্যাঙ্কের সর্বস্তরের আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দের, সর্বোপরি জেলাবাসীর অকৃত্রিম সহযোগিতা আমাদের উৎসাহ বর্ধন করুক এই কামনা।

বিনীত

শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল
প্রাক্তন বিধায়ক ও চেয়ারম্যান

রেবতী রঞ্জন বিশ্বাস
সমবায় সমিতি সমূহের
উপনিয়ামক ও মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

গল্প

আশ্রয়

কিঙ্কীশ সাঁতরা

ছোট মেয়েকে বাটিতে করে মুড়ি বেড়ে দিয়েছে। দুধের সর দিয়েছে খানিকটা। জলের গেলাস দিতেও ভোলেনি। খেতে বসিয়ে দিয়ে উঠান। বড় মেজ করে চার-চারটে মেয়ে। রান্নার ঘর সামাল দিচ্ছিল বড় মেয়েটা। সে-ই তার ছোট বোনের কান্না শুনে দৌড়ে আসে। এসে দেখে, মা নেই। হয়তো কোথাও গেছে বাইরে-টাইরে। বোনটাকে সামাল দেয়। না না কাঁদিস না, মা আসবে,— এখুনি আসবে। ভাবে এখুনি আসবে, — কিন্তু আসে না। সময় যায়—সময় যায়। শেষতক বাপের কাছে খবর পাঠায় — মাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাপ নারাণ চন্দ্র ছিল নদীর চরে। বেগুন বাড়ি কোপাচ্ছিল। খবর পেয়েই কোদাল ফেলে দৌড়ে আসে। খোঁজ খবর নেয় ভালো করে। কতক্ষণ গেছে বলে মনে হচ্ছে? ঘণ্টা খানেক? তাহলে কাছে পিঠে কোথাও আছে দেখ।

খোঁজ শুরু হয়। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ি ওরা তন্ন তন্ন করে খোঁজ নেয়। — ও কাকিমা, আমার মাকে দেখেছ না কি? — ও জেঠিমা, আমার মা এদিকে এসেছিল? —ও কমলাদা, তুমি আমার মাকে এ পথে যেতে দেখেছ? সকলেই চোখ কপালে তুলে। মাথা নাড়ে। — না বাপু, এদিকে তো আসেনি।

— তাহলে গেল কোন্ দিকে? মেয়েরা জানে মায়ের মাথার ঠিক নেই। যেদিকেই গোঁ ধরে সেদিকেই চলে যায়। গত বছর একবার চলে গিয়েছিল। অবশ্য দশদিন পরে ফিরে এসেছিল-সেবার। সেই দশদিনে দশ ভাগু। বাপটা ঘুমোল না পর্যন্ত। একবার এদিক তো একবার ওদিক। চরকির মতো ঘুরলো। এক এক করে সব কুটুম-বন্ধুর বাড়ি। — এলাকার সব বাজার-গঞ্জ — এককাঁড়ি লোক নানাদিকে ছুটে শেষ পর্যন্ত হারানের আস্তাবলে পাওয়া গেল খুঁজে। একটা হাটচালের নীচে বেচারি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। খাওয়া নেই-দাওয়া নেই, পেট মড়ি। দশদিনে দশ অবস্থা। ঘরে টরে ঢুকিয়েছিল সেবার।

এবার যে কি হবে কে জানে! প্রতি প্রতি করে লোককে শুধোচ্ছে। খেয়া ঘাটের পরাণ মাঝি সে-ই একটা হদিস দিলে — সন্ধ্যের আগে হাঁটুজল ভেঙে ওপারে যেতে দেখেছি বৌমাকে। থামতে বললাম থামলে না, কথাও বললে না পর্যন্ত!

দৌড়-দৌড়-দৌড়। সেই রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিমদিকে। তাহলে ওর বাপের বাড়ি মল্লিকহাটে গেছে। গিয়ে দেখে, যায়নি। নেই সেখানে। তাহলে? বামদিকে ঘুরে বামুনহাট। নারাণের ছোট বোনের বাড়ি। সেখানেও যেতে পারে। দৌড় তাহলে। গিয়ে খবর, আসেনি। এক এক করে সব কুটুমবাড়ি। রক্তের সম্পর্ক শুধু নয়। যত ইষ্টি-কুটুম ছিল সকলের ঘরে গেল নারাণ। কারোর ঘরে বাদ দিলে না। সেক পাড়ার দাদু স্যাঙাতের ঘরেও খোঁজ নিলে, সেখানেও যায়নি।

কুটুম বাড়ি ছেড়ে মন্দির মেলার ঠাঁই। মৌকেশ্বর বুড়ো শিবের তলা, পূর্ববাড়ের শীতলামায়ের থান। তেঁতাশির মনসা মন্দির। বেঁড়েদিঘির বড় আস্তানা, কোথাও বাদ দিলে না।

খুঁজতে খুঁজতে পনেরো দিন। স্যাঙাত একদিন বললে — চলতো মুদা মেরে মেখি। ঘাটপুরের মাঙনবুড়ি মুদা মারতে খুব বসে। খানে বসলে, অলৌকিক সব কথা বলে। কথাগুলোর ঝোলো আনা লেগে যায়।

ধরলে মুদা। বুড়ি খানে বসে বলল, এখন খানে-বেখানে ঘুরছে গ'। সহজে ঘর ফিরবে না। খুঁজে লাভ নেই।

কদ্দিন এভাবে ঘুরবে মাসি?

তা বছর খানেক।

মাথায় হাত নারাণের। মনটা, হ-য ব হতাশ। চোখের আলোটা দপাস করে নিভে যায় যেন। পাগলিটা যাই করুক ঘরে তো ছিল। কাছে কাছে ছিল। চোখের আগে আগে থাকত। এখন কোথায় যে ঘুরছে। দুমুঠো পেটে পড়ছে কিনা কে জানে? এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় কোন্ হাটের চালায় পড়ে আছে, নাকি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে? মনটা বড় খারাপ হয়ে যায় নারাণের।

আশা আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে আছে গ'। আশা কি সহজে ছাড়ে। খবর পায়, হরিখালির কাছে এক বামুন নখদর্পণ করে। দৌড় মাত্র স্যাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে। গিয়ে পায়ে পড়ে যায় ঠাকুর মশায়ের — ঠাকুরমশায়, একটু কৃপা করুন। আমাকে প্রকাশ করে বলে দান্ আমাদের পাগলিটা এখন কোথায় ঘুরছে? একটু ঠিক ঠিক করে বলে দ্যান্।

বামুনঠাকুর নিজের নখের ওপর সরষের তেল আর সিঁদুর মেখে দিয়ে বলে — দ্যাখো দিকিনি, কিছু দেখতে পাচ্ছো কি না?

নরাণ ভালো করে চোখ মেলে দেখে — একটা মানুষের মুখগো ঠাকুরমশায়!

মানুষ নয়গো, তোমার বউ। ভালো করে দ্যাখো —

নারাণের মাথা ঘুরে যায় — দেখার দরকার কি? আপনি তো বলছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার বউ। এখন পথে পথে ঘুরছে। কোথাও ঠাঁই নিচ্ছে না। কদ্দিন ঘুরবে এমন?

— তা তো বলতে পারি না। তবে ধরে রাখতে পারো বছর খানেক।

এক বছর। — বশ করে বসে পড়ে নারাণ। চোখ কপালে তুলে বলে — সময়টা কমিয়ে ফেলা যায় না?

যাবে কি করে? গ্রহ কাটিবে তো? এখন শনির দশা চলছে। একদম তুঙ্গে রয়েছে শনি। ডাইনে বাঁয়ে রাহুর দৃষ্টি। ও শালা রায় একদম খচ্চর। প্রেমটেম হে, ওরলে ছাড়ে না। এটুলিও বলতে পারো — বড্ড কেস বিত্রি মারে।

নারাণ দস্তুরমতো অনুরোধ করতে থাকে — শনিটাকে কাটান করা যায় না ঠাকুরমশায়?

— মিথ্যে বলতে পারব না। যে কথা বলছে, ওটি হয় না। ধৈর্য ধর, সময় হলে আপনি চলে যাবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে যায় নারাণ। স্যাঙাতে আবার পরামর্শ করে — গাঁয়ে-গঞ্জে ঘুরে লাভ নেই। তার চে বাজারে বাজারে ঢ্যাড়া মার, যদি কেউ খবর করতে পারে।

স্যাঙাতের মাথায় বুদ্ধি দারুণ। কথাটা মন্দ বলেনি, মনে ধরে যায়। প্রথমেই শুরু করে নলহাড়োর বাজারে। পর পর মোহনপুরের হাট, বুড়ুলের বাজার, চাবুকের হাট। আট-দশটা বাজারে টিন বাজিয়ে প্রচার করে নারাণ — গায়ের রং ফরসা উজ্জ্বল। মাথায় কোঁকড়া ঘন। একেবেঁকে কথা বলে। মাথায় দোষ আছে। ডানপাশে আঁড়ি তিল। এক মাসের বেশি শুধু পালিয়েছে। কেউ যদি দেখে থাকেন তাহলে আমাদেরকে খবর দেবেন। উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন।

পুরস্কারের আশায় একের পর এক সংবাদ আসে। মনে হয় সেই মেয়েটি। ইস্কুলের উঠোনে প্রায় এসে দাঁড়ায়। দুমুঠো ভাত দিলে খেয়ে চলে যায়।

পড়িমরি করে নারাণ দৌড়ায়। গিয়ে দেখে আর হতাশ হয়। না, এ নয়। আবার খবর আসে। হাসপাতালের ধারে ধারে ঘোরে। কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা বলে না। দেখুন গিয়ে যদি হয়।

আবার দৌড়ায় নারাণ। গিয়ে দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। খুটিয়ে দেখে মুখ বাঁকায় — না না। এ অন্য জন। আমাদের নয়গো।

দৌড়ে দৌড়ে হয়রান। আশেপাশের কোন শহর বাদ দেয় না। ওপাশে বেলদা, এপাশে খড়কপুর আর পূর্বে তমলুক পর্যন্ত। তমলুকের বেহুলা বর্গভীমা জাগ্রত দেবী। নারাণ মাথা ঠুকে বার বিনতি করে — মাগো, পাগলিটাকে ফিরিয়ে এনে দাও মা। আমি তোমাকে জোড়া পাঁঠা দেব। হ্যাঁ মা, ঘর ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেব।

দেবে তো ফিরে নেবার মন কই মায়ের! মার কানে তো কথা ঢোকে না। সময় কাটে কিন্তু পাগলি আর ঘরে ফেরে না। হতাশ হয়ে নারাণ ঘরে ফেরে। থ মেরে বসে যায়। আর দরকার নেই পাগলিটার পিছু সময় নষ্ট করে। এলে আসুক। না এলে কি আর করব!

দিন যায় রাত যায়। সময় কেটে যায় স্রোতের বেগে। নারাণের মনটা এক সময় আঁকুপাঁকু করে। ছ'সাতটা মাস কেটে গেল। আসবে আসবে করে আসার আশাও নেই। দেখতে দেখতে বছরও ফিরে যায়। শেষমেশ মনটা কু-কথা বলে ওঠে। সন্দেহ বাসা বাঁধে — বেঁচে আছে তো? মেয়েগুলো যখন তখন জানতে চায়, মা কি আর ফিরে আসবে না?

নারাণের মুখে কথা সরে না। খালি ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে ওঠে যেন। বলতে গিয়ে চোখ দুটো ভিজে যায় জলে। মেয়েদেরকে আড়াল করে করেক ফোঁটা জল ঝরিয়েও ফেলে।

এক সময় ছোট মেয়েটা গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালে, টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। এই এক বছরের বাচ্চা মেয়েটা মায়ের রূপ কেন ভুলেই গিয়েছে। মাকে আর খুঁজেই না। মার কথা উঠলে ভাল ভাল করে চেয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে আরো একটা বছর চলে গেল। স্যাঙাতে একদিন ডেকে পেয়ে নারাণকে পরামর্শ করলে — যদি একটা ব্যাটা ছেলে থাকত। চার চারটে মেয়ে। এগুলোকে দেবার পর করবেটা কি? তার চেয়ে তুমি বিতীয় সংসারী কর স্যাঙাতে।

নারাণ বড় বড় চোখ করে সবিস্ময়ে বলে — এ তুমি কি বলছো গো স্যাঙাতে? — ঠিকই বলছি। ভেবে দেখ না ভাল করে। ছোট মেয়েটাকে তোমার কে দেখবে বলতো? — কেন সুলোচনা আছে?

সুলো কি চিরদিন থাকবে? বিয়ে দেবে না? শ্বশুর বাড়ি যাবে না সুলো? তিনটি মেয়েকে তো একসঙ্গে পাত্রস্থ করতে হবে। কোনটারই মুখের দিকে তাকানো যায় না। বুঝলে স্যাঙাতে, মেয়েছেলের বাড়। কলা গাছকেও হার মানায়।

স্যাঙাতে সত্যি সত্যিই একটা বড় কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তিনটি মেয়েকে তো একসঙ্গে পাত্রস্থ করতে হবে। বউয়ের কথা ভুলে গেলে নারাণ জামাই খুঁজতে লেগে পড়ে।

জামাই খোঁজা, সে সহজ কম্ম নয়। সৃষ্টিছাড়া দাবি দাওয়া। কোনও রকমে এক দুটিকে গছানো যাবে। সম্বল কিছু ছিল। এক মাসের ওঠাপড়ায় দুটি মেয়েকে যা হোক দেয়া হয়ে গেল। খেটে খাওয়া ছেলে। জমিজায়গা কিছু আছে। মোটা ভাত-মোটা কাপড়ের অভাব হবে না।

আরো মাস দুয়েকের মধ্যে সেজো মেয়েটিও শ্বশুর বাড়ি চলে গেল। নারাণের মাথার বোঝা যেন এক একটা করে নেমে গেল ফটাফট। হাল্কা মনে হ'ল মাথাটা। পিছু ছিল স্যাঙাতে। আবার সেই কথা। ছেঁকে ধরল নারাণকে — ও স্যাঙাতে। এবার কি করবে বল? ছোট মেয়েটাকে কে দেখবে?

নারাণ বশ মানে। সহজে হা কাড়ে না। পাগলিটার মুখ মনে পড়ে। বড্ড কেটে গেল। কোন হদিসই মিলল না। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে নারাণের। স্যাঙাতে বলে — এখনও তুমি তার কথা ভাবছো?

ভাববো না! কতগুলো দিন তার সঙ্গে ঘর করেছি বলো? যাই করুক না সুখ দুঃখের সঙ্গী তো ছিল বটে! ভুলি কি করে বলো?

স্যাঙাতে চোখ কপালে তুলে, —ওকি বলছো তুমি? এখন যদি ফিরে আসে তুমি তাকে ঘরে তুলতে পারবে?

কেন? পারব না কেন?

কথায় চাপা দেয় স্যাঙাতে — ইয়ার্কো। তোমার লাজ ঘেন্না বলে কিছু নেই না কি? আরে যতই বল মেয়ে মানুষ তো নাকি? গাছেদের ছড়া মেয়ে মানুষ হাটের মাল। এদ্দিন বাইরে আছে, কখন কে তার সর্বোনাশ করছে তার কোন ঠিক আছে না কি? তার আর চরিত্তির বলে কিছু আছে?

মাথার মধ্যে আগুন জ্বেলে দেয় স্যাঙাতে। নারাণ হাঁ করে চেয়ে থাকে, পলক পড়ে না। স্যাঙাতের মুখখানা তার কঠিন পাথরে নির্মাণ বলে মনে হয়। কথা কটা মাথার জলতরঙ্গ ঝিলুর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে ভাবনার সমুদ্রে দিক হারিয়ে ফেলে। কূলকিনারা খুঁজে পায় না। স্যাঙাতের বুকে আর একবার আছাড়। কঠিন কঠের মুখখানা বড় হৃদয়হীন, প্রাণহীন।

নারাণের গ্রাম থেকে মাওরির হাট পাক্কা দু-ক্রোশ। কলাপাকড় কিনতে হলে ওখানে? ভাল। শস্তা শহর ভাব। সবরকমের ফল জমা থাকে। বাঁধাই দোকান।

শ্রাবণের রথের উৎসব। এ উপলক্ষে মেয়ে জামায়ের বাড়ি ফলপাকড় পাঠাতে হয়। পুরনোদের কথা থাক। কমপক্ষে নতুন জামায়ের বাড়ি না পাঠালে মানসম্মান যাবে। লোকে ভাববে কি? বলবেও বা কি? শাশুড়ি নেই বলে ফল খেতে পেলে না মেয়ে-জামাই।

ফলের বাজার করতে নারাণ গিয়েছিল মাওরির হাটে। সাতরকমের ফল। আম, আনারস, নারকেল, সপেদা। সব দেশি ফল। উপরি কিনলে কমলালেবু, বেদানা, খেজুর, বাসপাতি। যা চোখে পড়ল সবটাই দুটো করে কিনলে। সন্ধ্যের আগেই একটা পৌটলা কাঁধে আর একটা হাতে ঝুলিয়ে একা ঘরফিরতি হলো। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। বড় বাঁধ পেরিয়ে নামল মাঠে। মাড়া ধরে মাঝমাঠে পৌঁছেছে হঠাৎ নারাণের মনে হল, কে যেন পিছু ডাকছে — একটু দাঁড়িয়ে যাবে গো, শুনছো-একটু দাঁড়িয়ে যাবে।

গলাটা কানে এসে বাজতেই পা-টা একটু থামা দিলে। গলাটা খুব চেনা-চেনা। অনেকদিন চেনা জানা, খুব পুরনো। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখেও নিলে। অনেকখানি দূর থেকে একটি মেয়ে মানুষ ঝটিতি পায়ে তার দিকেই হেঁটে আসছে। চেনা জানা কিনা কে জানে! নারাণ একবার ভাবলে, একা মেয়ে মানুষ তাই বোধ হয় সঙ্গী হবার জন্য ডাক পাড়ছে। আবার ভাবলে, আমাকে নয়। অন্য কাউকে বুঝি হাঁকছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে হাঁটা শুরু করলে। আসছে তো পেছনে। আসুক না কাছে এলে বুঝা যাবে কি ওর উদ্দেশ্য।

মেয়েটি কিন্তু থামছে না। ডাক পাড়তে পাড়তে এগিয়ে আসছে — শুনছো নাকি? একটু দাঁড়িয়ে যাও না —

আসতে আসতে মেয়েটি নারাণের একদম কাছে এসে পড়ল এক সময়। একেবারে পেছনে এসেই কেন রসিকতা করে বলে উঠল — একা মেয়ে মানুষ, বলি তো সঙ্গে যাব। একটু দাঁড়িয়ে যেতে বলনাম, কথাটা একেবারে কানেই তুললে না তুমি। আচ্ছা মানুষ বটে।

গলাটা একেবারে পরিচিতই। পেছন ফিরেই নারাণ হাঁ মেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যেন খুঁটি পুতে পা দু'খানা কেউ বেঁধে দিলে। পাথরে তৈরি পুতুল। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। প্রথমে হাতের পৌটলাটা পড়ে কাঁধেরটা নামিয়ে ফেলল নীচের মাটিতে। তারপর সোজা হয়ে অবাক চোখে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। মনের মধ্যে বার বার প্রশ্ন হতে লাগল — এমনকি হয়? কি করে ব্যাপারটা সম্ভব হল? তার চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। অথচ ব্যাপারটা সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। দীর্ঘ তিন বছর বাদে তার বউ কদমবালা বর্তমান তার সামনে দাঁড়িয়ে খিক খিক করে হাসছে।

বাকরোধ হয়ে গেল নারাণের। পাগলামির চিহ্ন এতটুকুও নেই। একেবারে সুস্থ, সবল, সুন্দর চেহারা। দেখে, কে বলবে যে, এ সেই তিন বছর আগের পাগলি কদমবালা। স্থির, শান্ত। সংযত সুন্দর ব্যবহার। মুখশ্রীর সৌন্দর্য বরং পড়ছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল নারাণের — এ কি করে সম্ভব হল? মুখের ভাষাটা পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে!

নারাণকে নীরব থাকতে দেখে কদমবালা এক মুঠো কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে দিলে — কি এত দেখছো আমার মুখে গো? আমি তোমার কদম গো, কদম বুঝলে? না, না অন্য কেউ নয়। আরে সেই পাগলি কদম। চিকিৎসা করে ভাল হয়ে গেছি। ভেবেছিলে, আমি বোধ হয় মরে গেছি। না, না আমি মরিনি। ভগমান আমাকে মারেনি। তোমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তা কি ভাবছো অত গো?

নারাণ সত্যিসত্যিই সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল। কদমের খোঁচায় জ্ঞানটি ভাঙল। নিজেকে সংযত করে নিয়ে আমতা আমতা করে বলল — না, না কিছু ভাবিনি তো? বলে একবার কষ্টের হাসি হাসল যায়। হাসিটা যে নেহাতই দেখানো। কদমের বুঝতে বেটা বাকি থাকল না। তবু সামলে নিয়ে বলল — ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন ঘরে চল। তারপর সব বলছি। বলে নিজের থেকে এগিয়ে এসে একটা পৌটলা তুলে নিলে। বললে — তোমার কষ্ট হচ্ছে। একটা আমি নিই-বলে, চলতে শুরু করে আগে আগে। নারাণও চুপচাপ দ্বিরুক্তি নিয়ে অন্য পৌটলাটা কাঁধে তুলে।

তিন বছর বাদে কদমবালা সুস্থ মাথায় সুস্থ শরীরে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে সব এলোমেলো। ছত্রখান হয়ে গেছে সংসারটা। একা মানুষ নারাণ। কোলের মেয়েটাকে নিয়েই নাজেহাল। কি করে কোথা যায়! সংসারই বা কখন গুছায়। নারাণের প্রতি কদমের বড্ড মায়া জাগে। গামছা কোমরে বেঁধে লেগে পড়ে সংসার গুছাতে। নিজের সংসার এলোমেলো দেখলে কার না কষ্ট হয়। যেখানের জিনিস সেখানে নেই। বিশেষ করে হেঁসেলটা। সরঞ্জামে শিকেয় রোঁয়ি। হলুদের সাথে লঙ্কার লটরপটর। নবণের হাঁড়ি বেবড়ক জলে ভর্তি। রাজ্যের মাকড়সা ঘরদোর জালে জালে ঘিরে ফেলেছে। আর ক'দিনের মধ্যে যেন মানুষটাকেও ঘিরে জড়িয়ে শেষ করে ফেলবে। কলি বুলে চাদ্দিকটা ভরপুর। কাঁটা ঘরে ঘ্যারর ঘ্যারর করে ঘরটার আগাপাশতলা ঝেঁটিয়ে কুল কাঁদ নিকেশ করে দিলে। দু-এক দিনের মধ্যেই যেখানের জিনিস সেখানে এনে তুললে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে হয়ে উঠল নারাণের ঘরবাড়ি। দেখে দেখে নারাণেরও খুব ভাল লাগল। অনেকদিন পরে মাথার থেকে তার দুশ্চিন্তার বোঝাটা নেমেই গেল বলে মনে হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল নারাণ। তখন তার অজান্তে মুখ দিয়ে একটা ছোট্ট স্বস্তির শব্দও বেরিয়ে গেল — আঃ!

কিন্তু আঃ বললে কি আঃ হয়! আঃ-টা, না হয়ে যায়। স্যাঙাতের সঙ্গে নারাণের পথে দেখা। দেখা হতেই যে রে রে করে উঠল — শুনলাম ও নাকি আবার ফিরে এসেছে? সুড়সুড় করে ঘরেও ঢুকে পড়েছে?

নারাণ কথা বলল না। এক নাগাড়ে শুধু শুনেই গেল। বলি তোর আক্কেলটা কি রকম? বলা নেই কওয়া নেই তিন বছর বাদে একটা মেয়ে মানুষ হুড়মুড় করে ঘুরে ঢুকে গেল তাকে বাধা দিলি না পর্যন্ত! কোথায় ছিল, কার কাছে ছিল। কেমন করে ছিল খোঁজ পর্যন্ত নিলি না — ঘরে ঢুকিয়ে নিলি? ও মেয়েটার চরিত্র বলে কিছু আছে? বশ হাত ফের হতে হতে তো বেউস্যে হয়ে গেছে রে! নষ্ট মেয়ে মানুষটাকে আবার করে বউ বলে ঘরে তো ঢুকালি, এখন গ্যাখ সামলাতে পারিস কি না। মানুষজন মেনে নেয় কি না গ্যাখ। আমরা কিছু বলতে পারব না — বলে, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

শুধু স্যাঙাতে কেন। কদমবালার গৃহপ্রবেশের সংবাদটা মুখে মুখে চাউর হয়ে গিয়েছিল। ফলে সকলের মুখে মুখে, আড্ডায় আড্ডায়, দোকানে দোকানে বেশ জমাও করে আলোচনার মাধ্যমে মুখরোচক হয়ে উঠছিল। ঘটনা যা ঘটেছে তার চার গুণ রঙ চড়ে সড়ে আরো রঙদার এবং মজার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। চা দোকানের কালীদা, দক্ষিণ পাড়ার মধুপাইকার, সদর ঘাটের রূপাই মাঝি প্রত্যেকেই —। যার সঙ্গেই দেখা হল সকলেরই কৌতূহল এবং পরামর্শ দেওয়া, দূর দূর একটা নষ্ট মেয়ে মানুষকে ঘরে তুললি কি করে, তোর ঘেন্না-টেন্না নেই? আমরা হলে তো ঘাড় ধাক্কা

দিয়ে জড়িয়ে ধরতাম। মুখটা শুকিয়ে যায় নারাণের। আহ-টা তখন দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে 'মা' হয়ে বেরিয়ে যায়।

পাড়া বেপাড়ার মেয়েরা তো কথা বলতে বলতে খিল খিল করে বাঙ্গের হাসি হাসে। নিতান্ত যার অন্তর আছে সেই কেবল বলে, তিন বছর পরে চিকিৎসা হয়ে ঘরে ফিরেছে। ভালো হয়ে গেছে তো এখন। তা তার বিরুদ্ধে অত কথা কেন?

উত্তরে কেউ ভেটে কাটে — অতদিন বাইরে ছিল, মাথার ঠিক ছিল না। কে কখন কি করেছে তার কি ঠিক আছে। রাস্তার লোকে চেটেপুটে খেলো আর এটো কাঁটাটা নারাণের বুঝি, তুমি কেমন মেয়ে মানুষ গো! একি এক আধদিন, তিন তিন বছর। আমরা হলে বিষ খেতাম, গলায় দড়ি দিতাম। স্বামীর কাছে মুখ দেখাতে কিরে আসা, মুখে আগুন অমন মানির। নারাণটাকে জ্বালাতে এসেছে —

কথাগুলো বাতাসে ভেসে ভেসে কদমের কানে গিয়ে বাজে। পাড়া বেপাড়া, গাঁ-গঞ্জ, আত্মকুটুম সবদিক থেকে ভেসে আসে একইরকম কথার শব্দ। মুখটা শুকিয়ে যায় — বুক ধড়ফড় করে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বোজে। চোখের জল বাধা মানে না।

এদিকে কোলের মেয়েটা। ঐ টুকুন বাচ্চা মেয়ে। মাকে একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছে। বাপের কাছে কাছেই থাকে। যখনি কদম তাকে আদর করে কোলে নিতে চায়, অমনি চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে। নারাণ মাকে চেনাবার চেষ্টা করে, মেয়েটা ও পথে হাঁটেই না। বরং বেশি করে চেঁচায়। মায়ের কোল যেন তার কাছে খেজুর কাঁটার বাগটা। শেষ পর্যন্ত কোল থেকে নামালে তবে থামে। দেখে শুনে কদমের মনটা আরো হতাশায় ভরে যায়। নিজের মেয়ে নিজের হতে চায় না। এর চেয়ে বিষম দুঃখ আর কি আছে!

জানলার ওপর জানলা। এক প্রাওন বুকের মধ্যে বাউ দাউ, তার ওপর ডবল ছাঁকা। মেয়েদের কাছে খবর গিয়েছিল, তোদের মা কিরে এসেছে তোরা সবলে চলে আয়। সবলে কি আসবে — একা একাও কেউ একদিন এসে পৌঁছয়নি। গতকাল মেজো মেয়েটা হাজির। এসেই হম্বিতম্বি। নাক সেঁটকানো, যেন ছুঁয়ে যায় ছুঁয়ে যায় ভাব। গা বাঁচিয়ে চলে। যেন্না যেন্না কথাবার্তা। কদম শোনে আর অবাক হয়। তার নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে না পড়শির মেয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবু ছিল, কথায় কথায় যেন এক সময় পরিষ্কার ভাষায় বলে ফেলল — তুমি জান না, তুমি আসার জন্যে গ্রাম-গঞ্জের লোকেরা বাবাকে দুষছে?

কদম চেয়ে থাকে, তার চোখে অসংখ্য প্রশ্ন: মেয়েটা বলে চলে — কোথায় ছিলে, কি রকম ছিলে, কার কাছে ছিলে, কেউ জানে না তো! তাই লোকে সাত কথা ছড়াচ্ছে।

সাত কথাটা যে কি, কদমের তা গোচরীভূত। কিন্তু নিজের মেয়ে হয়েও কথাটা প্রকাশ করে বলবে, আর মা হয়ে তা শুনবে। তার চেয়ে মনে হয় মরণ ঢের ভালো ছিল।

পরের দুটো মেয়েও এল। বড়টা ঠান্ডা মাথার মানুষ। মিহিমিহি কথা বলত। মাকে দেখার পর বিপরীত। তেড়ে গালাগাল। কোথায় ছিলে একটা চিঠি দিয়ে জানাতে পারোনি? যা তাও করে এলে, দশ গ্রামের লোক ছি ছি করছে! আমাদের শ্বশুর বাড়িতে পর্যন্ত আমরা মুখ দেখাতে পারছি না। টেলিটা আবার খেই ধরে দেয় — পারছি না বলছিস? আমার শাশুড়ি তো মার কথা বলে খোটা দিলে আমায়। আমার তো শুনে মরতে ইচ্ছে করছিল। অবাক হয়ে চেয়েই থাকে কদম। মেয়েদের কথা শেষে কান ভরে। মুখে যেন খই ফুটছে। কি দজ্জাল হয়েছে ওর মেয়েরা। টেলি আবার উপদেশ করে — তুমি যখন ভালো হয়ে গেছো তখন বাবাকে ডেকে পাঠালে না কেন? বাবা গিয়ে নিয়ে আসত। এমন সব কাণ্ড করলে, আরু বাবার মুখে চুনকালি পড়ে গেল।

কথা শুনতে শুনতে কানের পোড়াটা ঝাঁ-ঝাঁ করে কদমের। মাথা ঝুলপাক খায়। কারোর কণ্ঠস্বর তার কান পর্যন্ত পৌঁছয় না। শুম মেরে বসে থাকে। কথা হারিয়ে যায়। বোবা হয়ে যায় যেন সে। শুধু চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল।

একদিন স্যাঙাতে এল ঘরে। বসতে দিয়ে কথা বলতে যেতেই উঠল ফোঁস করে। হিসে সাপের মত। হিস্ হিস্ শব্দে গরজন করে উঠল প্রবল আক্রোশে — কি কথা বলব আর! সব কথা তো তুমি শেষ করে দিয়েছ গা। আমার স্যাঙাতটাকে এখন গলায় দড়ি দিতে হবে। পাড়ায় তো আর ভিটেতে পারছে না। আরে বাবা লোকের ঘরে গিয়ে যদি এদিন তুমি কাটিয়ে আস, তাহলে মানুষ কত আর মুখে চাপা দিয়ে থাকবে বল? সবাই তো আর তোমার মত নাক-কান কাটা নয়! নির্লজ্জও নয়! আমিও বলি কোথাকার কে ডাক্তার, তার কাছে এদিন কাটিয়ে-উটিয়ে, দেদার ফুর্তি-টুর্তা করে কেন সড়সড় করে ঢুকে গেলে! তোমার একটুকুও বাধল না!

কদম আর শুনতে পারে না। কানে হাত চাপা দেয়। এ তো স্যাঙাত। আত্ম-কুটুমরা পর্যন্ত বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। জামাইরা একজনও কেউ এল না। কি বলবে এর পর কদম? ভেবে ঠিক করতে পারে না। এ সংসারের কোথাও কি এতটুকু আশ্রয় তার জন্যে নেই? থর থর করে কেঁপে ওঠে যেন তার স্বপ্নের পৃথিবীটা। ভূমিকম্প হবে নাকি কে জানে। আকাশে তাকায়। একঝুক অন্ধকার। দিনের আলোটা যেন হতাশার অন্ধকারে ডুবে একাকার হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপর ঝড়ের বাতাস হু হু শব্দে প্রবহমান। সব ধৈর্যই বাঁধ কেটে চৌচির হয়ে যায়। একান্তে নারাণকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে বলে — তুমি কি আমাকে সন্দেহ কর?

নারাণ উত্তর করে না। এমন একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সে আপাতত তৈরি ছিল না। এই ক'দিনে এমনিতে তার মানসিক অবস্থা ভাল নয়। সুস্থ হয়ে তার স্ত্রী বাড়ি ফিরে যেন তাকেই বিগুণ অসুস্থ করে তুলেছে। সে চুপ করেই থাকে।

কদম আবার প্রশ্ন করে, তুমি কি আমাকে সহ্য করতে পারছ না? নারাণ তবু চুপ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত কদম শেষ প্রশ্ন করে — খুলে বল। মনের কথা চেপে রেখে তো লাভ নেই। বললে আমি আমার পথ দেখে নেব।

যেন কান্নায় বিপর্যস্ত চৌচির হয়ে যাওয়া বাঁধ। ঘোর পড়েছে চন্দ্রিকে। কটা ঘোরের মুখে আটকা দেয়। চান্দিক দিয়ে কেনো জল ঢুকে পড়েছে। দিকভ্রান্ত, ভিত্তিবিরক্ত নারাণ বলে বসে — ভালো লাগলে দেখে নাও, আমি তার কি বলব — বলে নারাণ স্থানত্যাগ করে।

নারাণের কথা কটা তিরের ফলার মত বুকে এসে বিঁধে। কদমব্যানার মাথাটা ঝনঝন করে ঘুরে যায়। ঠাহর হয় পায়ের তলায় নিশ্চিত ভূমিকম্প। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। ঠায় বসে পড়ে। নিজের দুহাতে নিজের চোখ মুখ ঢেকে ফেলে। তারপর এক সময় ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে।

এভাবে কতক্ষণ কেটে যায়। সম্বিত্তের ফিরে সবেগে এগোতে থাকে। কদম মুখ তুলে দেখে। সন্ধ্যে উত্তরে দিয়ে রাত্রি নেমেছে। জানলার ওপারে ঘন অন্ধকার। আস্তে আস্তে কদম উঠে দাঁড়ায়, বেরিয়ে আসে

দরজার বাইরে।

সে এতক্ষণ বুঝে নিয়েছে, এ ঘরে মুহূর্তকাল থাকার অধিকার তার আর নেই। এ সংসারের উঠোনটুকুও পর্যন্ত তার জন্যে নয়। এই কদিনের সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা সংসারে তার আর কোন দাবি খাটে না। এমনকি আজ সকালেই যে বেলু গাছটার গোড়ায় জল ঢেলেছে বালতি করে সেই বেলু গাছটি পর্যন্ত এখন তার আর নয়। যদুরের তুলসীতলা, যে তুলসীতলায় ক'দিন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে সংসারের মঙ্গল কামনা করেছে, যে শিউলির গাছটা তার হাতের সেবা নিয়েছে ক'দিন। গন্ধভেদনের ঝাড়, ইউক্যালিপটাসের গাছ, পোষা বেড়ালটা —কেউ আর তার নয়। তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক যেন এই মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা টন টন করে। কি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে।

সব হারিয়ে কদম বড় নিঃস্ব হয়ে গেল। যেন নিঃস্ব অবস্থায় সে বড় অসহায় বোধ করে। এখন তার কর্তব্য কি হবে সেটাই ঠিক করতে গিয়ে নানা কথা মনে হয়। একবার মনে করে, ফিরে যাবে সে শহরের ডাক্তার বাবার কাছে, একবার ভাবে, বাপের বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু কোনদিকে যেতে তার মন রাজি হয় না। হঠাৎ তার মাথার মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়। টগরির কথাটা মনে পড়ে যায়। টগরি বলেছিল, তার শাশুড়ি তার মরণ কামনা করেছে। মন বলে ওঠে, এটাই তোর উপযুক্ত কাজ রে কদম! সবস্ত অবহেলা লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে এটাই সঠিক পথ। মনটাকে শক্ত করে এগোতে থাকে সে।

ঘরের পশ্চিম দিকটার বাঁশঝাড়টাই বেশি নির্জন। ওখানে নানান গাছ। অর্জুন, করঞ্জা, আম, বেল ইত্যাদি। বেলগাছটা ভালো। সহজে উঠে কাজটা শেষ করা যাবে। বুড়ি মানুষের মত মাথা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে বেলগাছটা।

এরপর যা করণীয় কটিতেই সেরে ফেলল কদম। গোয়াল বাড়িতে ঢুকে সতর্ক হয়ে নিলে একগাছা দড়ি। তারপর ত্রস্ত পায়ে পৌঁছলে সেই বেল গাছের গোড়ায়। কাকের ডেকে ফেলার আগেই কাজ শেষ করতে হবে। গিয়ে তাড়াতাড়ি চড়ে বসে গাছের মাঝ বরাবর। হাত চালিয়ে দড়ির একটা খুঁট বাঁধে শক্ত করে বেল গাছে। অন্যপ্রান্তটা নিজের গলায় বেঁধে নিয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলে আস্তে করে। হাজার চেষ্টা করেও বোকাতে গেল না, ভেবে বসে মেয়েদের কথা, নারায়ণের কথা, সংসারের কথা, সংসারের ভালমন্দের কথা, বুনো সুখের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও ভাবতে গিয়ে চোখের কোল ঠেলে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা গরম জল টলটল করে। তারপর? মরা জানবার আগেই লাফ দিয়ে ঝুলে পড়ে নীচে। সবকিছু চোখে ফাঁকি দিয়ে সে দুহাতে আলিঙ্গন করে সব জ্বালা জুড়োবার চেষ্টা করে।

জুড়োবার চেষ্টা করবে বললে কি করা যায়। কদম অনুভব করে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাকে পাঁজাকোলা করে ধরে নেয়। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারে না প্রথমটা। গলার দড়িটা ছেঁড়া করে খুলে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে সেই মানুষটা —

এ তুমি কি করছিলে কদম? তুমি কি সর্বনাশ করছিলে? বলতে বলতে মানুষটি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে যেন। ওইক্ষণ শুনে কদমের চিনতে কষ্ট হয় না মানুষটিকে। এ যে অতি পরিচিত, অতি আপনার, —নারাণ।

কদম আর থাকতে পারে না। নারাণের বুকে মুখখানা সজোরে ঘষতে ঘষতে ধরে তাকে। তারপর আনন্দের অশ্রুমোচন করতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অনেকদিন পরে সে আজ তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

"খবর বিক্রি করেন বা বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত একজন সাংবাদিক, যিনি জেনেশুনে অর্ধসত্য বা অসত্য খবর অথবা গ্রহণযোগ্য করার জন্য রঙ-চড়ানো মতামত প্রকাশ করেন, তিনি ওজনে ফাঁকি দেওয়া ব্যবসায়ী বা ভেজাল জিনিস প্রস্তুতকারীর চেয়েও বেশি দোষী। অসত্য সংবাদের প্রচার মিথ্যা বর্ণনার আড়ালে জিনিস বিক্রি করার চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক। যে সাংবাদিক জনসাধারণের আস্থার খেলাপ করেন, তিনি অসাধু ব্যবসায়ীর চেয়েও বেশি দূষণীয়।"

দ্বিতীয় ভারতীয় প্রেস কমিশন, ১৯৮২

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমবায় পাঠক্রম

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে সমবায় ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছেন। এই বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি।

শারদ
শুভেচ্ছা সহ

দি রিজিওনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি. নং ১৮/ক্যাল. তাং ৩/৬/৮৫

রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
যাদবপুর
কলিকাতা - ৭০০ ০৩২

With Best Compliments From

DARJEELING DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

(Regd No. 2 of 1959)
Head Office :
Rishi Road, Kalimpong
P.O. Kalimpong, Dist. Darjeeling
Phone No. : 55373, Fax No. 03552-55372

THE BANK WITH FIVE DECADE IN THE SERVICE OF THE HILL PEOPLE OF DARJEELING.

OUR BRANCHES AND PHONE NOS. :

1.	KALIMPONG	55372
2.	DARJEELING	52487
3.	KURSEONG	44486
4.	SUKHIAPOKHRI	64263
5.	PEDONG	51334
6.	GORUBATHAN	64030
6.	BIJANBARI	60258
8.	RIMBICK	

- *We provide Agril./Allied, Farm/Non-Farm and M.T. Non-Agril. (Salary Earners) sectors through various co-op. societies.*
- *Quick, Prompt & Cordial Service is our motto.*
- *Deposits are covered by Deposit Insurance Scheme.*
- *Attractive Deposit Scheme, with higher rate of interest than Commercial Banks.*
- *High School & Primary School Teachers' salary disbursement.*

শারদীয়ার অভিনন্দন জানাই

ফোন : ৫২০৮৯

হাবড়া লার্জ সাইজড এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লি.

হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
শাখা : বদরহাট পোঃ পৃথিবা
উত্তর ২৪ পরগণা

ভাণ্ডার পত্রিকার শুভ কামনায়

কুলতেঘরী-কেটৈরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজিঃ নং - ১২৬ তাং ২-৯-৬৪

কুলতেঘরী, কেশবচক, হুগলি
শাখা : শিবপুর, পদ্মপুকুর

শ্যামলকুমার মুখার্জি
সভাপতি

বাসুদেব মণ্ডল
সম্পাদক

এলাকার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ও কৃষিজীবী মানুষের সেবায় দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবৎ নিয়োজিত আছি।

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

ধামাসিন ও মুন্টী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

পোঃ ইটাচুনা, হুগলি

বাবলুচন্দ্র দাস
সভাপতি

রবীন সরকার
সম্পাদক

বিপ্লবাদ বসু
ম্যানেজার

"সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন এক করিতে করিবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নালিকুল পশ্চিম গ্রামপঞ্চায়েত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

মালিয়া, হুগলি
(হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়ন গৃহীত দত্তক সমিতি)

মহাদেব দাড়ী
সভাপতি

বাসুদেব দাস
ম্যানেজার

হুগলী জেলার সমবায় আন্দোলনে অগ্রণী সমিতি —

সিজা কামালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

★ সদস্য সংখ্যা — ১৮৬৫

★ স্বল্প মেয়াদী ঋণ দাদন — ২৩,৪৩,০৮৬ টাঃ (৯৮-৯৯)

★ ক্যাশ ক্রেডিট — ১,৯৪,৫০০ টাঃ (৯৮-৯৯)

★ বন্ধকী ঋণ — ৩৫৮৮৫ টাঃ

★ হাড়কো স্কীমে গৃহ নির্মাণ ঋণ — ১৬,৯৬,৫০০ টাঃ

★ আমানত সংগ্রহ — ৭৮,২৭,৪২৮ টাঃ (৯৮-৯৯)

★ নন ফার্ম এ্যাকটিভিটি — লেদ কারখানা, টিভি বুষ্টার কারখানা, হাস্কিং মিল, ইট ভাটায় ঋণ দাদন, কেরোসিন ডীলারশিপ।

★ নীট লাভ — ১,১০,৫০৭ টাঃ (৯৮-৯৯)

★ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী — গ্রুপ ১২৬টি। গ্রুপগুলিকে সমিতির ঋণ দাদন ৫,৯০,৩৫০ টাকা।

৪০ বৎসরের অধিকাল এলাকার কৃষি ও কৃষকের সেবায় নিয়োজিত

শ্রী নিতাই চক্রবর্তী
সভাপতি

শ্রী সুবল দাস
সম্পাদক

শ্রী আজামিল বারিক
ম্যানেজার

অভিনন্দন সহ —

গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৬, চার্চ লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০১

শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ —

পারুলডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজিঃ নং ৪০ তাং ১৮-৬-২৬/২৪/৩/৬৪

গ্রাম : পারুলডাঙ্গা, পোঃ নসরতপুর
জেলা : বর্ধমান

অজয়কুমার ঘোষ — ম্যানেজার
মূলালচন্দ্র ঘোষ — সম্পাদক
জগবন্ধু ঘোষ — সভাপতি

শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ —

টিকরখাঁজি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজিঃ নং - ৫কে টি, তাং ২২-৬-১৯৬৫

টিকরখাঁজি ● পোঃ সুদপুর ● থানা : কাটোয়া
কাটোয়া ১নং ব্লক, জেলা : বর্ধমান

মহাজনী শোষণমুক্ত করতে এই সমিতি স্বল্প সুদে কৃষিঋণ দাদন করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া ন্যায্য মূল্যে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ন্যায্য মূল্যে কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সমিতিতে স্বল্প সঞ্চয় আমানত প্রকল্প চালু আছে। অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বনির্ভর করে তোলা ও সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য সমিতির মাধ্যমে দু'টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হইয়াছে (পুরুষদের ও মহিলাদের)।

দয়াময় মণ্ডল — সভাপতি
ক্ষীরোদকুমার মণ্ডল — সম্পাদক
গুরুপদনাথ ঘোষ — ম্যানেজার

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন —

বিবেকানন্দ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজিঃ নং - ৫৭ এইচ ডি তাং ১৭-৯-৭৭

গ্রাম ঃ কাঁড়ারিয়া পোঃ কেশবচক জেলা ঃ হুগলি
ফোন : এস টি ডি : ০৩২১২
প্রধান কার্যালয় : ৭৬৬১৭
মোহনবাটী শাখা : ৭৭৩৪৩

কার্যকালীন সময় ঃ
সকাল ৭-৩০ মিঃ থেকে ১১-৩০মিঃ ও
বিকেল ৪-৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ পর্যন্ত

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

হেড অফিস - জলপাইগুড়ি

জেলার উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করুন,

সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন,

অধিক সুদের সুযোগ নিন,

সুদের হার অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের থেকে বেশি

ঃঃ *লকারের সুবিধা আছে* ঃঃ

জলপাইগুড়ি, বেলাকোবা, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, শিলিগুড়ি

সেভিংস আমানতের সহিত অতিরিক্ত দুর্ঘটনাজনিত বিমার সুবিধা

ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা সমূহ

জলপাইগুড়ি

ধূপগুড়ি

মালবাজার

ময়নাগুড়ি

রাজগঞ্জ

বেলাকোবা

শিলিগুড়ি

হলদিবাড়ী

সত্যজিৎ বসু
সভাপতি

নিতাই কাজী
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

ভ্রমণ

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

নন্দিতা রায়

সুদীর্ঘ প্রস্তুতির অবসান। অবশেষে ১৫ই মে আমরা চার ভাইবোন মিলে বেরিয়ে পড়লাম ইউরোপের উদ্দেশে। প্রস্তুতি পর্বটা সত্যিই সুদীর্ঘ। প্রথমত, অর্থ; দ্বিতীয়ত, স্বদেশের ও বিদেশের নানান অনুমতিপত্র। আর এইসব কর্মকাণ্ডের শুরুতেই সবচেয়ে আগে যেটা দরকার সেটা হল স্ব স্ব নিয়োগকর্তার অনুমোদন। প্রতিটি পর্যায়েই প্রচুর সময় লাগে। স্কুলে ছাত্রীদের পড়াই 'আন্তর্জাতিকতাবোধ কিভাবে গড়ে তুলতে হয়' আর নিজের আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার পথে এত বাধা।

আমার ছুটি এক মাসের। ইচ্ছা ইউরোপের যতটুকু সম্ভব তার মধ্যে ঘুরে নেওয়া। সঙ্গে পাথেয় ১৫ দিনের Euro-Rail Ticket, ৫০০ ডলার এবং নিখরচায় থাকা-খাওয়া যাবে এরকম দু-চারটি ঠিকানা। চারজনের দলের জন্য Euro-Rail Ticket-টা মোটামুটি সস্তা। অন্তত এদেশ থেকে টাকাতেই ওটা কেনা যাবে, তাই ওটা নেওয়াই সাব্যস্ত হল। আর সস্তায় হবে বলে জেট এয়ারলাইন্সের প্লেন-এর টিকিট নিলাম।

'শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি' যাত্রা শুরু। প্রথম গন্তব্য ইউরোপের ক্রীড়াক্ষেত্র সুইজারল্যান্ড। নির্দিষ্ট সময়ে দমদম পৌঁছে গেলাম। কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, সিকিউরিটি চেকিং সব পার করে লাউঞ্জ-এ বসে আছি প্লেন-এর অপেক্ষায়। দেখলাম আমাদের মত আনাড়ি প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ইতিমধ্যে আমার ভাই বাদুর একটু গলা ভেজানোর শখ হয়েছিল। ডিউটি ফ্রি শপ-এ দর করে এল এক প্যাকেট ঝুচির (অ্যাপো জুস) দাম মাত্র এক ডলার। বুঝলাম আগামী এক মাসে হয়ত অনেকদিন না খেয়েই কাটাতে হবে।

জেট এয়ারলাইন্সের প্লেন বেলগ্রেড যাবার পথে প্রথম স্টপেজ দেবে দুবাই। কলকাতা-দুবাই ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিটের উড়ান। প্লেন ছাড়ল রাত ১২টা ৪০ মিনিটে। অস্পষ্ট ঘোষণা থেকে বুঝলাম প্লেনটা উড়বে ৫০,০০০ ফুট ওপর দিয়ে। ভোর পাঁচটায় দুবাই পৌঁছলাম। এয়ারপোর্টের ঘড়ির সঙ্গে আমার ঘড়ি মিলিয়ে দেখলাম ৩৫ মিনিটের তফাত হয়ে গেছে। দুবাই এয়ারপোর্টটা দেখে আমার মনে হচ্ছিল — মরুদানবের তৈরি সেই প্রাসাদের কথা। এখানে নাকি জিনিসপত্র খুবই সস্তা — তাই লোকজন প্রচণ্ড ভেনাকাটি করছে। আমাদের শুধু চোখ দিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার নেই। ৪৫ মিনিটের স্টপেজ। যেটুকু সম্ভব দেখে নিয়ে আবার প্লেনে উঠলাম। প্লেন ছাড়ল — ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। নীচে এয়ারপোর্ট আলোয় ঝলমল করছে — কেমন যেন উৎসবের আলোকসজ্জার মত।

ঘন কুয়াশা আর মেঘের বাধা কাটিয়ে প্লেন যখন বেলগ্রেডের মাটি ছুঁল আমার ঘড়িতে তখন ১১-৩০টা — বেলগ্রেডের ঘড়িতে ৮টা অর্থাৎ সাড়ে তিন ঘণ্টার তফাত। ১১-৫০-তে এখান থেকে প্লেন রওনা হবে জ্যুরিখ। সেখান থেকে ছোট প্লেন আমাদের নিয়ে যাবে জুরিখ। হাতে আধঘণ্টা সময়ও নেই — এর মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে হবে। কিন্তু ব্রেকফাস্ট-এর জন্য মাত্র দুটো কুপন দিয়েছে। আর আমরা চারজন। অগত্যা খানিকটা মেজাজ দেখাতেই হল, তবে মিলল আর দুটো কুপন। শুকনো এক টুকরো রুটি, দুধ ছাড়া চা আর খানিকটা অরেঞ্জ জুস — এই নাকি কন্টিনেন্টাল ডিস। বেলগ্রেড থেকে জ্যুরিখ ৫০ মিনিটের উড়ান। আর জ্যুরিখ থেকে জুরিখ ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট। আমরা যখন পৌঁছলাম জুরিখে তখন লোকাল টাইম বেলা ২টো ৪০ মিনিট। কলকাতার সঙ্গে সময়ের তফাত সাড়ে তিন ঘণ্টা। তবে মজা হচ্ছে শীতে ও গ্রীষ্মে ওবের ঘড়ির তফাত ১ ঘণ্টা অর্থাৎ শীতকালে ওদের ঘড়ি কলকাতা থেকে পিছিয়ে থাকবে সাড়ে চার ঘণ্টা।

জুরিখ এয়ারপোর্টে আমাদের মামা অপেক্ষা করছিলেন। জুরিখ এয়ারপোর্টটা একটা আটতলা বাড়ির হবে। সুতরাং এলেভেলেটর চেপে ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে হবে। মামার বাড়ি Kliendottingen-এর Fahr Strasse-তে। রাস্তার পাশে ফার গাছের সারির জন্যই ঐ রকম নাম। ৪০ মিনিটে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। সেখানে আবার দেখি ফ্ল্যাটবাড়ির গ্যারেজটা মাটির নীচে — তার ছাদে একটা পার্ক। খাওয়া-দাওয়া হৈ-চৈ-এর মধ্যে দিয়ে সময়টা কেটে গেল। ঘড়িতে দেখি রাত ১০টা — অথচ বাইরে এখনও কিছুটা আলো আছে।

ঘুম ভাঙলো পরদিন সকাল সাতটায়। মামির সঙ্গে বেরোলাম দোকান-বাজারের দিকে। জায়গাটা বড় সুন্দর। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে একটা শহরতলী (ওরা অবশ্য গ্রামই বলে), পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে আরা — রাইনের একটা উপনদী। কথা হল দুপুরবেলা সবাই মিলে ঐ নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে যাব। নদীর পাড়টা অনেকটা লম্বা, তাই সাইকেলে যেতে হবে। আমার তো বেশ ভয় ভয় করছে — দীর্ঘ ২৫

বছর বাদে সাইকেল! তবে শুনেছি সাইকেল নাকি একবার শিখলে কেউ ভোলে না। আমার বেলায় কিন্তু তা আর মিলল না — খানিকটা এগিয়েই সাইকেল সমেত নদীতে — খরস্রোতা নদী, ছেলে গেলে ওপারে জার্মানি। যাই হোক, সবাই মিলে কোনরকমে তো টেনে তুলল আমাকে। কিন্তু গায়ের ব্যথা সারতে আরও দশ-পনেরো দিন লেগেছিল।

পরের দিন মামুর গাড়িতে ঘুরতে বেরোলাম — Brugg → Lenzburg → Luzern → Sarnersee → Brienzer See → Interlaken → Thun See → Burn.

সকাল ৯টা নাগাদ খাবার-দাবার সঙ্গে করে বেরিয়েছিলাম। জুরিখ লেক-এর পাশে Luzern শহরটা বেশ সাজানো-গোছানো. তাই এখানে টুরিস্ট-এর ভিড় দেখা যায়। পুরো পথটাই পাহাড়ের পাশ দিয়ে, পাহাড়ের টানেলের মধ্য দিয়ে, হ্রদের পাশ দিয়ে — প্রায় একইরকম দৃশ্য কিন্তু নয়নমুগ্ধকর। Interlaken-এ এই সময় ফুলের সমারোহ দেখার মত। দুটো লেক Brienzer See এবং Thun See-র মধ্যবর্তী অঞ্চল বলে এর নাম Interlaken। এখান থেকে আমরা একটা হিমবাহ দেখতে গেলাম — Grindlewald। হিমবাহটা কেটে ওদের মতো বানানো এবং তার মধ্যে বরফ কেটে কেটে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের আকৃতি বানিয়ে রেখেছে ওরা। এরপরে দেখলাম একটা পাহাড়ী ঝরনা — Lanterbrunen. পাহাড়, ঝরনা আমাদের দেশেও কম সুন্দর নয়, কিন্তু সুইজারল্যান্ডে ঐসব অঞ্চলের সুরক্ষায় যে যত্নের ছাপ দেখা যায় তা এখানে নেই। সারাটা দিন আলপস-এ ঘোরা খুবই উপভোগ্য করলাম। কিন্তু আবার এক বিপত্তি। ফেরার পথে দেখি আমার ভাই কানুর সারা মুখে ফোস্কার মতো কি বেরিয়েছে — অসহ্য যন্ত্রণা। আমার তো দেখে মনে হল হারপিস। প্রথমে বাবার বন্ধুর কাছাকাছি এক সাউথ ইন্ডিয়ান ডাক্তারকে দেখানো হল। তিনি কোন দায়িত্ব নিতে চাইলেন না, সোজা পাঠিয়ে দিলেন ট্রপিক্যাল ডিজিজ-এর চিকিৎসা হয় এমন একটা হাসপাতালে। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে দিলেন হারপিস এবং পক্স-এর একটা উৎপত্তিগত মিল আছে। সুতরাং বেশি জানাজানি হলে বাড়িটা, এমনকি পুরো লোকালিটিটাই Quarantine করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, মামু আর আমি কানুকে নিয়ে অনেকটা ঘুরের সেই ক্যান্টন হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানে একাধিক ডাক্তার নানা রকমভাবে দেখে নিয়ে জানাল আমার ধারণাই ঠিক। তবে এর তো কোন ওষুধ নেই। কিন্তু পেইন কিলার এবং ভিটামিন দিয়ে দিলেন। আমার বাড়তি লাভ হল ওদেশের একটা হাসপাতাল দেখা। সত্যিই এও দেখার মত।

পরের দিন কানুকে বাড়িতে রেখে আমরা বেরোলাম। গন্তব্য জুরিখ শহর। পথে লিমাথ নদী এবং তার উৎস প্রবল। দেশ-বিদেশ থেকে লোক এখানে স্নান করতে আসে। তাই এই জায়গাটার নাম Baden। বেশ কিছু রোমান আমলের বাড়ি (প্রায় অবিকৃত), স্কুল, ইউনিভার্সিটি এসব দেখে গেলাম Armin Kruz ঘড়ির দোকানে। দোকানের সামনের দিকে উঁচুতে একটা শো-কেস-এর মধ্যে বিভিন্ন পোশাক ও ভঙ্গির অনেকগুলো পুতুল আছে। প্রতি ঘন্টায় অজস্র ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পুতুলগুলো সচল হয়ে উঠে এক পাক ঘুরে নেয়। এছাড়া রাস্তায় আইসক্রিম, চকোলেট — সমস্ত দোকানই খুব সুন্দর করে সাজানো। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নকে অন্যান্য শহর থেকে কিছু আলাদা মনে হয় না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে বসলাম জুরিখ লেকের পাশে। এটা ৫১ কিলোমিটার লম্বা। এখান থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ঠিক সুইজারল্যান্ডের মাঝখানে Rapperswil-এ। এই জায়গাটিও খুব সুন্দর। বাচ্চাদের জন্য একটা ছোট চিড়িয়াখানাও আছে এখানে। জুরিখ লেকের পাশে অনেকগুলো পুরনো চার্চ আছে। তার মধ্যে একটিতে একটা ঘড়ি আছে — সেটি নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম ঘড়ি।

পরের দিন যাওয়ার কথা রাইন নদীর জলপ্রপাত দেখতে। সেখানে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত রাস্তাটা হল জার্মানির ভিতর দিয়ে। সুতরাং পাসপোর্ট সঙ্গে নিলাম। রাস্তার পাশে দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক ফরেস্ট — এত গাঢ় সবুজ বনের জঙ্গল যে দূর থেকে দেখায় কালো — তাই এর নাম ব্ল্যাক ফরেস্ট। অনায়াসেই জার্মানির চেকপোস্ট পার হয়ে গেলাম পাসপোর্ট দেখিয়ে। রাইন নদীর জলপ্রপাত চওড়ায় ১৫০ মিটারের মত, গভীরতা প্রায় ১৩ মিটার। প্রায় ৬০০০ বছরের পুরনো এই জলপ্রপাতে ১৮৬৪ সালে যুদ্ধের সময় থেকে টারবাইন বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। ফেরার পথে আবার জার্মান বর্ডার — আবার পাসপোর্ট দেখানো। এবার দেখা গেল জার্মানির ভিসা আমাদের আছে ঠিকই তবে তা আরও পাঁচ দিন পর থেকে। অর্থাৎ এ পথে আসাটাই বেআইনি হয়ে গেছে। তাই এপথে ফেরা আর যাবে না। অতএব প্রচুর ঘুরপথে বাড়ি ফিরতে হল। একেই বলে কপালের ভোগ।

পরের দিন আবার বেরোলাম। যদি পাহাড়ে পাহাড়ে আর একটু ঘুরে আসা যায়। এখানে পাহাড়ের ওপরেও ঘাস বাড়ির লনের মতো ছাঁটা। পাহাড়ের ওপরে ভার্সি গরুগুলো যখন দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের গলার ঘন্টার আওয়াজ আমাদের দেশের পাহাড়ের ওপর মন্দিরের ঘন্টাধ্বনির কথা মনে করিয়ে দেয়। পাহাড়গুলোর চূড়োয় পৌঁছবার জন্য নানান ধরনের কেবল্ কার — কোন কোনটা আবার বাসের মত বড়। এদিন ফেরার পথে একটা চার্চে গেলাম — Maria Einsdein — স্প্যানিশ স্যাপে সজ্জিত কালো পাথরের মাতা মেরী।

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেছে। ভ্রমণের ছুটি মাত্র এক মাসের। এর মধ্যে Euro-Rail টিকিটটার সদ্ব্যবহার করে নিতে হবে। ২২শে মে সুইজারল্যান্ড থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এবার দলে আর একজন বেড়ে গেল — আমার মামাতো বোন। রোম আমাদের প্রথম গন্তব্য। রাত্তিরের ট্রেনে ৬ জনের একটা কুপেতে আমাদের রিজার্ভেশন। ওদেশে রাত্তিরের ট্রেন খুবই আরামদায়ক। ট্রেনে ওঠার পরেই কন্ডাক্টর গার্ড প্রত্যেকের জন্য সাদা চাদর আর বালিশের ওয়াড় এনে দিল। ওগুলো পাততে গিয়ে দেখি টিস্যু কাগজের তৈরি। সকাল ৭-৩০টা নাগাদ ট্রেন পৌঁছাল রোমে। ইয়ুথ হোস্টেল-এ জায়গা মিলল না, প্রতিদিন ২০,০০০ লিরা হিসাবে একটা হোটেল নিলাম। স্নান-খাওয়া সেরে বেরোলাম ভাটিকান সিটির উদ্দেশে। রোমের মধ্যে হলেও ভাটিকান-এর সমস্ত ব্যবস্থা তাদের নিজস্ব — এমনকি মুদ্রা পর্যন্ত। রোম থেকে ভাটিকান বাসের ভাড়া ৭০০ লিরা। ইতালিতে একটা মজা হ'ল — বাসের টিকিট পাওয়া যায় সিগারেটের দোকানে, বাসে নয়। পথে রোমান আমলের অনেক স্থাপত্য নজরে এল। ভাটিকান-এর বিশাল গির্জা চত্বর, ভিতরের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সবই দেখার মতো।

প্রচুর বিখ্যাত ছবিও এর মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, তবে তা টিকিট কেটে দেখতে হয়। সব দেখেশুনে বেরিয়ে এলাম Pizza Navona-র উদ্দেশে — এটা শহরের নামকরা চক। চত্বরটির চারপাশে রেস্টুরেন্ট আর মাঝখানে নানান ধরনের শিল্পীর সমাবেশ — কেউবা ছবি আঁকছেন, কেউবা গান-বাজনা করছেন, কোথাও বা কয়েকজন মিলে কনসার্ট-এর আসর বসিয়েছেন। আর একটু এগিয়ে একটা পার্কের মত জায়গা দেখলাম — Viale de Belvedere. পার্কটি রোমান প্রত্নবস্তুসমূহের গলাকাটা

প্রাচীন রোমের স্মৃতিচিহ্নবাহী কলোসিয়াম

মূর্তি দিয়ে সাজানো। Pizza Navona থেকে গেলাম Fontana Di Trevi. এখানে একটা বিশাল চৌবাচ্চার মধ্যে কিছু মূর্তি আর ফোয়ারা আছে। মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে লোকে এখানে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। আরও কয়েকটা চার্চ দেখে হোটেলে ফিরলাম। পরের দিনটা প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ, কলোসিয়াম ইত্যাদি দেখে নিলাম। দেখলাম অলিম্পিক স্টাডিয়াম। দেখে মনে হচ্ছিল না আর কদিন বাদেই সেখানে অলিম্পিকের আসর বসবে। সারাদিন ঘুরে রাত ১০টা নাগাদ আবার ট্রেনে চেপে বসলাম — এবারের গন্তব্য গ্রিস।

সকাল ৯-৩০টায় ট্রেন পৌঁছল ব্রিন্দিসি। এখান থেকে জাহাজে যেতে হবে পাত্রাস। Euro-Rail Ticket-এ এই জাহাজের ভাড়াও ধরা আছে — তবে এই ভাড়ায় জাহাজের ডেকে যেতে হবে। ডেকে যাওয়ার মত গরম জামা বা স্লিপিং ব্যাগ কোনটাই আমাদের নেই। অগত্যা আরও কিছু পয়সা দিয়ে কেবিন-এর রিজার্ভেশন নিতে হ'ল। কেবিনও মারাত্মক কি ঠান্ডা! দু'দিনের জন্য গ্রিসে যাচ্ছি, তাই জাহাজে ওঠার আগে বাড়তি মালপত্রগুলো ব্রিন্দিসির ক্লোকরুমে রেখে যাওয়া ঠিক করলাম। আমি বাইরে বসে আছি — ওরা সবাই মাল রাখতে ভিতরে গেছে। এমন সময় ওখান থেকে একটা ইতালিয়ান ছেলে বেরিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে আমার কাছে ইন্ডিয়ান কারেন্সি কিছু আছে কিনা — ও তার বিনিময়ে আমাকে লিরা দেবে। আমি রাজি হওয়ামাত্র দেখি ভেতর থেকে পিলপিল করে লোক বেরিয়ে আসছে — সকলেরই একই চাহিদা। একটা মেয়ে আবার আমার রূপোর ব্রোচটাও চাইছিল। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না। তবুও এই সুযোগে আমরা কিছু টাকা বিনিময় করলাম। ইতালিতে জিনিসপত্রের যা দাম — অন্তত একবেলার খাওয়ার খরচটা উঠে আসবে। রাত্রি ১০টা নাগাদ জাহাজ ছাড়ল — ১৮ ঘন্টা লাগবে। মধ্যে তিনটে স্টপেজ — Corfin, Igoumenitsa, Cafalonia. গ্রিসের ঘড়ি ইতালি থেকে এক ঘন্টা এগিয়ে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে আড়াই ঘন্টার তফাত। এখানকার কারেন্সি হ'ল দ্রাকমা — ভাটিকান সিটায় ১০ পেন্স এর দাম। পাত্রাস থেকে এথেন্স যেতে হবে ট্রেনে। ট্রেন ছাড়ল বিকেল ৬-৪৫-এ।

ট্রেনের রাস্তাটা বড় সুন্দর। একপাশে পাহাড়, অন্যপাশে জলরাশি — মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। এথেন্সের আগের স্টেশনে হৈ হৈ করে সব হোটেলের দালালরা ট্রেনে উঠে পড়ল। এছাড়া নানান জিনিসের বিক্রেতারাও ট্রেনে উঠে হাঁকডাক জুড়ে দিল। এদের সম্মিলিত আওয়াজে মনে হচ্ছিল নিজের দেশেরই লোকাল ট্রেনে বসে আছি। সকালের পিছু পিছু আমরা গিয়ে উঠলাম এথেন্স ইন-এ। লাগেজ-এ স্টিকিনি নেই — কলে গরম জল নেই — তবু বেশ! ২৫০০ দ্রাকমা ভাড়া প্রতি রাতের জন্য। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ামাত্র গভীর ঘুম।

সকালে উঠে চটপট তৈরি হয়ে নিয়ে বেরোলাম Acropolis-এর উদ্দেশে। সেখান থেকে বেরিয়ে মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি সবই এক এক করে দেখে নিলাম। এখান থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলাম পার্লামেন্ট হাউস — সামনে দু'জন গার্ড কিছুক্ষণ বাদে বাদে তাদের বেল্টের অবস্থানের মতো জায়গা বদল করছে। এই দৃশ্য ইউরোপে অনেক জায়গাতেই দেখানো হয়। পার্লামেন্ট হাউসের পাশেই ন্যাশনাল গার্ডেন — এর মধ্যে একটা চেটাপুটি চুপচাপ বসে থাকা একটা ময়ূর আমাদের দেখে সামনে এগিয়ে এসে তার পেখমটা মেলে দিল (আমাদের ভাগ্যিস পাখি হোই)। তারপরে গেলাম ভাস্কর্যের কারখানা হল এখানে একটা আর্ট গ্যালারি আছে — যেখানে খেলার বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি দেখলাম। গ্রিকরা যে 'Healthy Body'-কে আজও সমান গুরুত্ব দেয় সেটা বোঝা গেল। এখান থেকে গেলাম অলিম্পিক স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের চারপাশে গ্রিক দেবদেবীদের সাদা পাথরের মূর্তি। ওখান থেকে গেলাম জিউস-এর মন্দির — অনেকটা ভাঙা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রাচীন গ্রিসের প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু এথেন্সের মতো আধুনিক লোকজন এ পর্যন্ত ওদেশে কোথাও পাইনি। এরা বেশ সঙ্গীতপ্রিয়, সন্ধ্যেবেলা রাস্তার মোড়ে অনেকেই গানবাজনা নিয়ে বসে যায়। অনেক সময় পথচলতি লোকজনও তাতে সামিল হয়। বিভিন্ন গানের সুর অনেকগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। রাস্তার মোড়ে ফুটপাতের ওপরেই দোকানিরা পসরা নিয়ে বসেছে, রেস্টুরেন্টে খাবার খাবারে স্বাদও বেশের মতই অনেকটা। বেশ ভালই লাগছিল। তবে আবার ফিরতে হবে ইতালি। ফ্লোরেন্সের আর্ট গ্যালারিগুলো দেখা বাকি রয়ে গেছে। রাত

দশটায় জাহাজ ছাড়ল পত্রাস থেকে।

আলো দেখে মনে হচ্ছিল দেওয়ালির রাত। জাহাজ চলছে — আলোকমালা ক্রমে বিন্দুতে পরিণত হ'ল — তারপর গাঢ় অন্ধকার।

প্রিন্সের ভলিন্টিক স্টেচিলান

ঘন কালো রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভেসে চলেছে 'পসিডোনিয়া'।

ব্রিন্দিসি থেকে আবার ট্রেন — গন্তব্য ফ্লোরেন্স। ইতালিতে এর উচ্চারণ Firenze. ফ্লোরেন্স যেতে হলে এই ট্রেন বদল করতে হবে বোলোনায়। ভোর পাঁচটায় বোলোনা পৌঁছলাম। স্টেশনে চা খেয়ে ট্রেনের অপেক্ষা। ইতালিতে দোকানপাট সব অফিসের ঘন্টা অনুযায়ী চলে — বিকেল ৪টের সব বন্ধ — খোলে সকাল ৮টায়। ফ্লোরেন্সে থাকার জায়গা হিসাবে ইয়ুথ হোস্টেলই সবচেয়ে ভাল, কিন্তু তা খুলবে বিকেল ৪টেয় এবং তখনই জানা যাবে সেখানে জায়গা পাওয়া যাবে কি না। অতএব মালপত্র ক্লোকরুমে রেখেই শহরটা ঘুরতে বেরোলাম। শহর বলতে চার্চ এবং বড়লোকের প্রাসাদোপম বাড়ি। এই বাড়িগুলোকে দর্শনার্থীদের দেখিয়ে কিভাবে পয়সা রোজগার করা যায় তা দেখার মতো। ক্যাথিড্রাল এবং তার গোলাকার ছাদের দেওয়ালের পেইন্টিং উল্লেখযোগ্য।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা আর্ট গ্যালারি Uffizi দেখতে গেলাম। এখানে চতুর্দশ শতক থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং ভাস্কর্য আছে। সারা পৃথিবীর লোকই এইসব গ্যালারি দেখতে আসে — সুতরাং বিরাট লাইন। হঠাৎ দেখি আমার দুই ভাই লাইন ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে। কি ব্যাপার? না, গেট কিপার নাকি অন্যান্য দর্শনার্থীদের অনুরোধ করেছে আমাদের যাতে ওরা আগে যেতে দেয়। কারণ ইন্ডিয়া থেকে এরকম টুরিস্ট নাকি আগে কেউ দেখেনি। পরে রাস্তাঘাটে আরও অনেকের কাছেই এই মন্তব্য আমি শুনেছি। আমাদের পোশাক দেখে কারোই বুঝতে অসুবিধা হয় না আমরা কোথা থেকে গিয়েছি। সবকিছু ঠিকমত দেখতে হলে আমাদের আরও একটা দিন থেকে যেতে হয়। ইয়ুথ হোস্টেল-এর কর্মকর্তারা অবশ্য আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করলেন। গ্যালারিগুলো সব না দেখলে এদেশে আসাটা অর্থহীন, কিন্তু এক একটা গ্যালারির প্রবেশমূল্য অনেক।

পরের দিন সকাল ৯টা নাগাদ বেরোলাম পিসার উদ্দেশে। এখান থেকে পিসা পর্যন্ত ট্রেন চলে। সেখান থেকে বাসে যেতে হবে 'হেলানো মিনার' দেখতে। বাস ভাড়া ৬০০ লিরা। সিগারেটের দোকান থেকে টিকিট নিয়ে বাসে উঠে যার যার টিকিট মেশিন-এ পাঞ্চ করাতে হয়। ৪০০০ লিরার টিকিট কেটে ২৯৬টা সিঁড়ি ভেঙে মিনারের মাথায় উঠলাম। শুধু মিনার নয়, চারপাশটা নিয়েই জায়গাটা খুব সুন্দর। শুনলাম ঘন্টা হেলে থাকলে নিশ্চিন্ত থাকা যেত, মিনারটা নাকি তার থেকে বেশি হেলে যাচ্ছে। তাই খুব শিগগিরই মিনারের মাথায় ওঠাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যত্তসে আমাদের দেখা তো হয়ে গেছে।

এখান থেকে আমরা যাব সিয়েনা। সিয়েনা শহরটা খুবই পুরনো। চড়াই-উতরাই ভেঙে কয়েকটা চার্চ দেখলাম। পরের দিন যাব ভেনিস। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ দেখি বাসুর সারা গায়ে চিকেন পক্স এবং খুব জ্বর। কি হবে ভেবে ভয়ে মরছি।

সকাল ১১-৩০টায় ভেনিসের ট্রেন। সাড়ে তিন ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম। প্রথম দর্শনেই আমার জলে ডোবা কলকাতার চেহারা চোখে ভেসে উঠল। খালি রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি, রিক্সার বদলে মোটরবোট। মোটরবোট এখানে ট্যাক্সি নামেই চলে। হোটেলের ঘরে মালপত্র রেখে ঘুরতে বেরোলাম। বেরোনো মাত্র বৃষ্টি — টানা দেড় ঘন্টা। এখানে এইরকমই হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি হয় মাদ্রাজের মতো। কাশ্মীরের হাউসবোটের মতো এখানে চলে গন্ডোলা। পরের দিন আমরা যাব সাউথ ফ্রান্সের নিস্-এ।

নিস্-এর আকর্ষণ হল এর সমুদ্রতীর। এখানে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। নিস্-এর সমুদ্রে স্নান করে বাসুর পক্স-এর গুটিগুলো একদম শুকিয়ে গেল — ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য লাগছিল। এখান থেকে আমরা যাব প্যারিস।

আমাদের ১৫ দিনের Euro-Rail Ticket-এর মেয়াদ শেষ। প্যারিস স্টেশনে অপেক্ষা করছিল আমাদের এক ভাই। পরের চার দিন তার কাঁধে ভর করে যেটুকু দেখা সম্ভব দেখে নিলাম — আইফেল টাওয়ার, ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ, ল্যুভর মিউজিয়াম। একদিন সেইন নদীতে বোটেও চড়লাম। এবার যাব ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডে দুই প্রান্তে আমার দুই মামা থাকেন। একজন সাসেক্সে, একজন কেন্টে। আমার হাতে সময় মাত্র চারদিন। প্যারিস থেকে Hover Speed-এর বাসে Calis এবং সেখান থেকে Hover Craft-এ Dover. Dover থেকে বাসে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। সেখান থেকে মামার গাড়িতে সাসেক্স। এখানে আমার প্রথম কাজ চারদিন বাদে সুইজারল্যান্ড ফেরার ট্রেনের টিকিট কাটা। কারণ আমাকে ফিরতি ট্রেন ধরতে হবে সুইজারল্যান্ড থেকে। আমি একাই ফিরব — কারণ ওরা আরও দিন পনেরো থাকবে। মামা বললেন, কাছেই Gatwick এয়ারপোর্ট, ওখান থেকে ট্রেনের টিকিটটা করে নেওয়া যাবে। বেশ আনাড়ি গোছের এক ভদ্রলোক কন্সিলটার টিপেটুপে

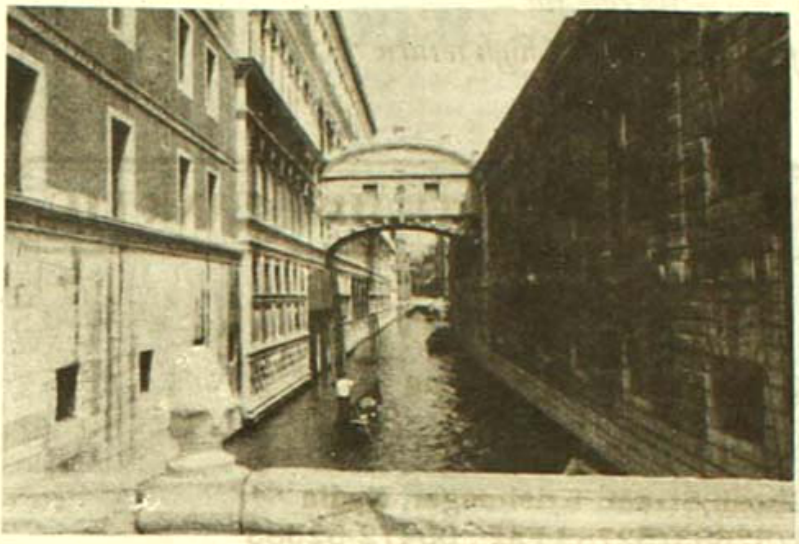

ভেনিসের এই চেহারা জলে ডোবা কলকাতাকেই মনে করিয়ে দেয়

একটা টিকিট আমাকে ধরিয়ে দিল — ১০৫ ডলার। একি! যা শুনেছিলাম এ তো তার দ্বিগুণ ভাড়া! কিছু আর বললাম না। পরদিন ওখান থেকে বেরিয়ে লন্ডনের টুকটাক দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে নিলাম। আর দেখলাম মাদাম তুসোর মিউজিয়াম — এককথায় অপূর্ব!

পরের দিন আমার আর এক মামা ও মামাতো বোন সাসেক্স থেকে আমাদের নিয়ে গেল তাদের বাড়ি। এখান থেকেও কিছু কিছু জায়গা ঘুরে নিলাম। পরের দিন ফিরে যাব সুইজারল্যান্ড। সবাই মিলে আমাকে তুলে দিতে এল স্টিমারে — এর নাম Jet Foil — ওপারে গিয়ে ট্রেন।

Jet Foil যেখানে আমাকে পৌঁছে দিল তার নাম Oostende — এটা হল্যান্ডের অন্তর্গত। আমার তো হল্যান্ডের ভিসাই নেই। ছোকরা অফিসার তো ভিসা ছাড়া আমাকে ওদের দেশ থেকে ট্রেনে উঠতেই দেবে না। আমি এখন কি করি? ওকে বললাম — 'দেখ বাপু আমার কাছে বাড়তি পয়সা তো নেই-ই। আর ইংল্যান্ডের জন্য আমার ছিল Single Entry ভিসা। সুতরাং সেখানেও ফিরে যেতে পারব না। আর তোমার দেশে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না — থাকলে দেশ থেকে ভিসা নিয়েই আসতাম। আসলে গন্ডগোলটা পাকিয়েছে ঐ Gatwick এয়ারপোর্টের লোকটা। ওর উচিত ছিল আমার পাসপোর্ট দেখে টিকিট দেওয়া। আমার এই দীর্ঘ বক্তৃতায় ও কি বুঝল তা ও-ই জানে। কিন্তু সামান্য জ্ঞান দিয়ে আমাকে ছেড়েও দিল। রাত ৯টায় ট্রেনে চাপলাম। আমাদের গয়া প্যাসেঞ্জারের মতো সারা রাত প্রায় সব স্টেশনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চলল ট্রেন। ভিড়ও নেই। আমার মতো প্যাসেঞ্জার দেখার অভ্যেস বোধহয় ওদের নেই। সারা রাত টিকিট চেকার আর পুলিশের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমি নাজেহাল। ভোরবেলা ট্রেন পৌঁছাল বাসেল। মামা স্টেশনেই ছিলেন। সব শুনে বললেন, 'আরে প্যারিসের মধ্যে দিয়ে একটা ট্রেন আসে, তার ভাড়াও অর্ধেক, সময়ও লাগে কম — তুই সেটাতে এলি না কেন?' বললাম ভাগ্যে ছিল বিনা ভিসায় হল্যান্ড ঘোরা — তাই। ❐

গড়বাড়ি ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি. নং ১০৪ মিড, তারিখ ঃ ১-৪-৫৮

নাজিরবাজার, মেদিনীপুর, ফোন ঃ ৭৪৩৪১

সভ্য সংখ্যা ঃ ২০৩২

৩১-৭-২০০০ পর্যন্ত আমানতের পরিমাণ — এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা (প্রায়)

বিভিন্ন প্রকারের আমানত

ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ

বিভিন্ন প্রকারের লোনের সুবিধা

(১) প্রেস্টিজ লোন (২) কে ভি পি লোন (৩) জমাকৃত আমানতের লোন (৪) বন্ধকি লোন

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
সকল প্রকার আমানত ডিপোজিট গ্যারান্টি ফান্ড দ্বারা সুরক্ষিত।

সুধাংশুশেখর মাল সম্পাদক | **উত্তমকুমার বেরা** ম্যানেজার | **পূর্ণেন্দুশেখর মণ্ডল** সভাপতি

We care for
Safety, liquidity and high return

NADIA DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

It always pays to
Our clientele
Quick and better banking

Head Office
M. M. Ghosh Street, Krishnagar, Nadia
Ph : 52394/52683/52789 Fax : 03472-52683

Our Commitments to :

Agriculture Finance	Weavers' Finance	Salary Earners' Loans	Diversified Finance	Consumers' Loans

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book:, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson,
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills—even poultry hatcheries and fisheries—offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life
Of course, good weather will always be important in village life.

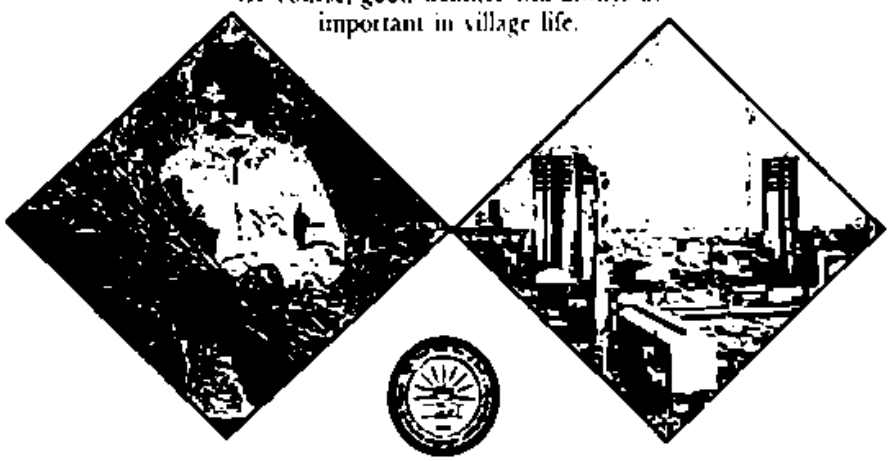

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC, The Co-operative story.

'সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
আমরা এগিয়ে চলেছি দৃঢ় পদক্ষেপে' —

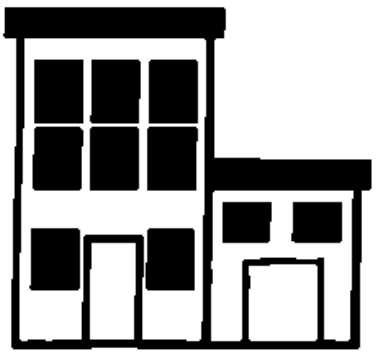

৩৫টি শাখা, ২টি পে অফিস সহ মেদিনীপুর শহরে সান্ধ্য ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে
মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায় নিয়োজিত

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি. মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী সমবায় ব্যাঙ্ক

মুখ্য কার্যালয় : মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ : ০৩২২২-৬২৪১৭, ৬২৪১১, ৬২৭৪৪, ৬২৭৫৯
ফ্যাক্স : ০৩২২২-৬২৪১১
গ্রাম : VIDCOB

সজলকান্তি ঘোষ
জেনারেল ম্যানেজার

মৃগাঙ্কশেখর কর
সভাপতি

রম্য রচনা

জলছবি

নব্য লেখিকা

সত্যবালা নামটা ওঁর ঠাকুমার দেওয়া। আমরা বলি সত্যবালা দিদি। সত্যবালাদি বললে উনি ভারি চটে যান। বলেন ও আবার কী? দিদি বলতে পার না? নামটা নিয়ে সত্যবালা দিদি একটুও লজ্জিত নন। বরং বেশ গর্বই আছে ওঁর। বলেন ব্যাখনা, এখন কেমন সব ওল্ড ফ্যাশন ফিরে আসছে। পুরনো প্যাটার্নের গয়না, নাকে নাকচাবি, ঘটিহাতা ব্লাউজ। আমার নামটাও বেশ ওল্ড ফ্যাশনের। ওসব মিলি, অদিতির মত দু-তিন অক্ষরের নামের ভাঁড়ার ফুরিয়ে এলে আবার এসব পুরনো নাম নিয়ে টানাটানি পড়বে।

নামের ওপেই হোক বা যে কারণেই হোক আমাদের সত্যবালা দিদির, সত্যের প্রতি বেশ একটু কৌকই আছে বলা চলে। ওঁর সঙ্গে বেনাকাটা করতে বেরোনো এক রকমারি ব্যাপার। পছন্দসই জিনিসের দাম আয়ত্তের মধ্যে হলে দোকানদারের সামনেই সরবে ঘোষণা করবেন 'ও মা কি সস্তা! আর কটা নিয়ে নিই কি বলিস?' বুঝুন ঠ্যালা। এরপর সেই দোকানদার পেয়ে বসবে না তো কী। স্কুলে চাকরি করেন। বাড়ি স্কুল থেকে হাঁটা পথে দশ মিনিট। সত্যবালা দিদি ঠিক দশটা পনেরোর রওনা দিয়ে প্রেয়ারের বেল পড়ার ৫ মিনিট আগে স্কুলে পৌঁছে যান। তা একদিন পৌঁছে দেখেন প্রেয়ারের বেল বেজে গেছে। সত্যবালা দিদি রেগে আগুন। হেড মিস্ট্রেসকে চ্যালেঞ্জ করলেন স্কুলের ঘড়ি ৫ মিনিট এগিয়ে রাখা হয়েছে বলে। তিনি তো অবাক। সত্যবালা দিদি গটগট করে বাড়ি ফিরে এলেন। নিজের টাইমপিসটা (উনি হাতঘড়ি ব্যবহার করেন না) নিয়ে গিয়ে হেড মিস্ট্রেসের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে ওঁর আসা-যাওয়া, হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে বচসা ইত্যাদির জন্য কতটা সময় লেগেছে সে সব যোগ-বিয়োগ করে নিজের ঘড়ির সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে দেখিয়ে দিলেন স্কুলের ঘড়ি ৫ মিনিট ফাস্ট। তাঁর রেডিওর সঙ্গে মেলানো ঘড়ি-অতএব অভ্রান্ত। সত্যের প্রতি এই কৌকটা খানিকটা তাঁর কলেজ জীবনের এক মাস্টারমশায়ের থেকেও তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। সত্যবালা দিদির কাছেই শুনেছি তাঁদের আমলে আমাদের মফস্বল শহরের সরকারি কলেজে ইংরিজির এক অধ্যাপক ছিলেন যিনি সত্যবাদীতা ও সময়ানুবর্তিতা এই দুয়ের ব্যাপারে বেশ একটু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির ছিলেন। নামটা বলা গেল না। সেই অধ্যাপক বহুদিন ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ছেলেমেয়েরা বেঁচে বর্তে আছে। তারা আপত্তি তুলতে পারে। ইংরিজি সাহিত্যে পণ্ডিত ভদ্রলোক বাইবেলের গভীর অনুরাগী ছিলেন। মাঝে মধ্যে নিজের পাঁটের পয়সা খরচ করে বাইবেলের দু-একটি উপদেশ নিয়ে কয়েক পাতার এক প্রবন্ধ ছাপিয়ে তিনি পয়সায় বিলি করতেন। সে সব প্রবন্ধের বাক্য গঠন এত জটিল যে প্রায় ক্ষেত্রেই তা বোঝার উপায় ছিল না। দশ লাইনের আগে ফুলস্টপ পড়ত না একেকটি সেন্টেন্সের। অনেকের মতে ওসব সেলিকোনে ভর্তি একেকটি সেন্টেন্স শেষ হতে পুরো পাতা লেগেছে - এমনও নজির আছে। এটা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি। তবে লোকমুখে ওঁর বাংলা বলে শুনে আমরা কথাটা খুব একটা অবিশ্বাস করতে পারিনি। কথা বলার সময় তিনি একটাও ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করতেন না। বরং দুরূহ শব্দে রচিত এমন বাংলা বাক্য ব্যবহার করতেন যে বোঝে কার সাধ্য। শুনেছি পোস্ট অফিসে খাম কিনতে গিয়ে বলতেন 'মহাশয় আমাকে চারটি পত্র বহনী দিতে পারেন' মানুষের দোকানে গিয়ে নাকি জিজ্ঞেস করতেন 'পণ্ড মাসে উদ্ভম তো'? এই ঢঙে কথার ফুল ফুটিয়ে তিনি যে 'বোম্বাস্টিক' ইংরিজিতে দীর্ঘতম বাক্যরচনার রেকর্ড ছুঁতে চাইবেন সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সত্যবালা দিদি গল্প শুনেছেন তাঁদের মাস্টারমশায় নাকে মধ্যেই রেশনের বড় ব্যাগ ভর্তি করে কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে বাড়ি যেতেন। কলেজের সামনে রিক্সা না থাকলে পাঁচ মিনিট হেঁটে বাস স্ট্যান্ডে এসে রিক্সা ভেকে নিয়ে যেতেন। তার সঙ্গে কড়ার হত কলেজ থেকে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। ভাড়াও নিতে হবে সেই অনুযায়ী। রিক্সাওলা যাচ্ছে খালি রিক্সা নিয়ে; তিনি পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছেন। এ দৃশ্য অনেকে দেখেছে। রিক্সাওলাই বরং অস্বস্তিতে হয়ে বারবার তাঁকে রিক্সায় উঠতে বলত। কিন্তু অধ্যাপকের ঐ এক গোঁ। তিনি তো কলেজ থেকে বাড়ি যাবার ভাড়া দেবেন। এটুকু বিনি পয়সায় যাবেন কেন? অবশ্য রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া দেবার সময় যদি খুচরো না থাকে তবে টাকা দিয়ে ফেরত নেবার কোন প্রশ্নই নেই। তাঁদের গলির মোড়ের সেলুনের নাপিত তো ওঁর পয়সাতেই বাড়ি বসিয়ে ফেলল। প্রতি সপ্তাহে চুলকাটার অভ্যাস ছিল ভদ্রলোকের। টাকা দিয়ে খুচরো ফেরত নিতেন না। ক্লাসে ছেলেরা ওঁর এই অভ্যাসটা নানান কাজে লাগাত। স্যার নোট নিতে পারছি না-পেন নেই-বলামাত্রই পকেট থেকে কলম বার করে দেবেন। সে তো আর সস্তার উটপেনের যুগ নয়। মোটামুটি দামী কলমই ব্যবহার করতেন। কিন্তু দেওয়া পেন ফিরিয়ে নেবেন না। ফলে অধ্যাপকের কলম ছাত্রের পকেটে। প্রতি বছর ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের মধ্যে এই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতাই চলত বলা চলে। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে অবশ্য তারা অধ্যাপকের ওপস্রাহী হয়ে পড়ত। ফলে আর 'পকেটমারির' চেষ্টা করত না। ওপস্রাহী হবার কারণ ছিল। উনি ক্লাসে কখনও কাউকে প্রশ্ন করে বিব্রত করতেন না এবং ৪৫-এর কম নম্বর কাউকে দিতেন না। এ ব্যাপারে ওঁর মত ছিল — কলেজে পড়ছ তোমরা-তোমাদের মানহানি হয় এমন

কাজ কোন শিক্ষকের করা উচিত নয়। তবে ঐ পর্যন্তই। ওঁর হাতে ফার্স্টক্লাসের নম্বর পাওয়া ওঁর প্রবন্ধ পড়ে বোঝার মতই দুরূহ ছিল।

কথা হচ্ছিল সত্যবালাদিদিকে নিয়ে। রিক্সাওলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ইনিও কম যান না। দিদির খুব রিক্সায় চড়া অভ্যাস। রাজ্যের রিক্সাওলার উনি মা বাপ। প্রায়ই তারা ছেলের অসুখ, মেয়ের বই কেনার নাম করে টাকা নিয়ে যায়। আমরা বলি দিদি বেকার টাকা দিচ্ছেন। সব মদ খেয়ে দিয়ে। এ কথাও তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করবেন উনি এবং জোর গলায় ঘোষণা করবেন হতচ্ছাড়াদের আর যদি এক পয়সাও দিই। রিক্সাওলারা এর পরেও খালি হাতে ফিরেছে বলে কখনও শুনিনি। দোকানদাররা আখছার ঠকায় ওঁকে। একবার দুরপাল্লার যাত্রায় হাওড়া স্টেশন থেকে একটা তালা কিনেছিলেন তিনি। হোটেলের দরজায় বাড়তি সাবধানতা হিসাবে লাগাবার জন্য। যথা সময় বাপ খুলে দেখা গেল তালা আছে চাবি নেই। শুনে সত্যবালাদিদির ছোটবেলার অঙ্কের মাস্টারমশাই বলেছিলেন সত্যি তোর কোষ্ঠী তো আমি তৈরি করেছি। তুই কী জিনিস আমি জানি। দোকানদারটা জানল কী করে যে এই সেই লোক যে বাক্স খুলে তালা চাবি ঠিকমত লাগছে কিনা দেখে নেবে না?

এ হেন সত্যবালাদিদি ঠিক করলেন মোটর সাইকেল চালানো শিখবেন। ওঁকে সম্ভবত কেউ বুদ্ধি দিয়েছিল সব জায়গায় রিক্সায় যেতে গিয়ে ওঁর বড্ড খরচ হচ্ছে। নিজের একটা মোটর সাইকেল থাকলে অনেক সুবিধে। আমরা অনেক বারণ করলাম। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে মোটর সাইকেল শিখে চালানো মুখের কথা নয়। তাছাড়া শহরের ঘিঞ্জি রাস্তা। রিক্সা, সাইকেল, বাস, ট্রেকার, অটোয় একেবারে জটলা থাকবেন। এর মধ্যে দু-চাকার গাড়ি নিয়ে ছেলেরাই হিমসিম। কিন্তু সত্যবালাদিদি কোন ব্যাপারে মনস্থির করলে ওঁকে থামানো কঠিন। অতএব কেনা হয়ে গেল একটা টি ভি এস স্কুটি। পাড়ার বুটি ছেলে পালা করে শেখাতে লাগল। কোন জন্মে ছোটবেলায় দাদাদের সাইকেল নিয়ে দু-চারবার ওলটপড়া করেছেন। ওতে কি আর ব্যালান্স তৈরি হয়! অর্থাৎ সত্যবালাদিদি তাঁর নতুন মডেল নিয়ে প্রায় সাইকেল চড়া শিখতে লাগলেন। পড়ে পড়ে মডেলের রংই চটে গেল। সত্যবালাদিদি দমবার পাত্রী নন। পাগলের ছেলেগুলোও ওঁকে শেখাবেই। তা মাসখানেক ধরে কখনও ছাগল চাপা দিয়ে কখনও সাইকেলের ঘাড়ে পড়ে, রিক্সার চাকা ফুটো করে এবং যথেচ্ছিত খেসারত দিয়ে বাসের চাকার তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে লোকের কটু কাট্য গায়ে না মেখে দিব্যি শিখে গেলেন। এইরকমই এক প্রস্তুতি পর্বে একদিন মাঠের ধারে একাই ভোরবেলায় চালাচ্ছেন। চালাতে চালাতে চলে এসেছেন বাস রাস্তার কাছাকাছি। মোড়ের মাথায় শিবমন্দির। দিদির কথনা অনুযায়ী প্রাতঃভ্রমণকারী এক বয়স্ক মানুষ গভীর ভক্তি সহকারে শিবমন্দিরের বারান্দায় সবে প্রণাম নত হয়েছেন এমন সময় দিদির সামনে পড়েছে এক রিক্সা। ডাইনে বাঁই না বাঁয়ে যাই করতে না করতেই তাঁর মডেল সোজা গিয়ে ধাক্কা মেরেছে ভক্তিনত ভদ্রলোকের পশ্চাদ্দেশে। দিদি কুপোকাৎ ওঁর গাড়ি ধুলিসাৎ ভদ্রলোকের অবস্থাও তথৈবচ। অক্ষেপহীন দিদি নিজে উঠে এই চমৎকার দৃশ্যের একমাত্র কৌতূহলী দর্শক সেই বিধ্বংসকারী রিক্সাওলার সাহায্যে গাড়ি তুলে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন - লাগল? নেহাত মহিলা তাই সম্ভবত গায়ে হাত তোলেননি। কিন্তু ওঁর চটবার এবং চটাবার বিলক্ষণ কারণ ছিল। খিঁচিয়ে উঠে জবাব দেন — আবার জিজ্ঞেস করছেন লাগল কি না! সকালবেলায় কোথায় ঠাকুর নমস্কার করছি আর আপনি এসে বিনেপয়সায় ধাক্কা! ডান বাঁ জ্ঞান হয়নি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। যান যান মাঠে প্র্যাকটিস করুন গিয়ে। সকালবেলায় মডেল বৃত্তান্ত বলতে এসে সত্যবালাদিদি হেসে কুটিপাটি।

সত্যবালাদিদির গল্প বলতে গেলে ফুরোবার নয়। ওঁর বন্ধুরাও কিন্তু কম যান না। বিশেষ করে প্রাণের বন্ধু নন্দিতাদি। আড়ালে আমরা বলি দুই বুড়ি কুমারী। নন্দিতাদির কাছে কলেজে আমরা ইংরিজি পড়েছি। ইংরিজি ফরাসি দুই বিষয়ে এম এ। বিশ্ব সাহিত্যে ওঁর প্রগাঢ় জ্ঞান তদুপরি মহাশ্বেতা ঘটকের অনুগামিনী। ম্যাকবেথ পড়াতে গিয়ে কোথায় পৌঁছে যেতেন আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে ওঁর সঙ্গে তাল দেওয়া সম্ভব নয়। বুকে পিছনের দরজা দিয়ে কতদিন ক্লাস কেটেছি। অনেককাল আগে একদিন কলকাতা থেকে ট্রেনে ফিরছি। দেখি নন্দিতাদি এককোণে বসে মন দিয়ে একখানা বই পড়ছেন। আমাকে দেখে কাছে ডেকে বইটা দেখতে দিলেন। ফরাসি চিত্রকলার ইতিহাস। দারুণ কাগজে ছাপা দারুণ দারুণ সব ছবি সম্বলিত ঢাউস বই। বইমেলা থেকে কিনেছেন। প্রিন্সিপ্যাল টাকা দিয়েছিলেন লাইব্রেরির বই কেনার জন্য। সে টাকার সিংহভাগ খরচ করে এই বই কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্য কোন বই কেনা হয়নি। আমাকে সাক্ষী মানলেন। বল, এসব বই কলেজ যদি না কেনে বেচারি মেয়েরা কী করে বিশ্ব সংস্কৃতির খবর পাবে? শুধু পড়ার বই পড়লেই হবে? এসব বই নেড়েচেড়ে দেখলেও কত উপকার। মফস্বলের কলেজ ছাত্রীরা কতটা এ বই নেড়ে চেড়ে দেখবে সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ থাকলেও ওঁকে সমর্থন করা ছাড়া আর উপায় কী?

সত্যবালাদিদির বাড়ি বসে আছি। বিকেলবেলা হৈ হৈ করে ঢুকলেন হাতে এক বড় সড় ঠোঙা। সদ্য, শিলিগুরি থেকে গরম গরম সবাইকে ভাগ করে দে। দাদুর দোকান থেকে সিঙ্গাড়া ভাজিয়ে এনেছি। ওঁকেও প্লেটে করে গোটা দুই সাজিয়ে দিতে বলে উঠলেন, না না — এসব আমি খাই না। অম্বল হয়। গরম রসগোল্লা ছিল দাদুর দোকানে। আমি তাই গোটা চারেক খেয়ে এসেছি। এরকম বিশুদ্ধ সারল্য ওঁকেই মানায়।

নন্দিতাদির ছোট বোন আমাদের সঙ্গে পড়ত। আড়ালে আমরা আমাদের ক্লাসের একটি মেয়েকে তার ফাঁচবাজির জন্য ফাল্টুস বলে ডাকতাম। একদিন সে মেয়েটি ওঁদের বাড়ি এসেছে সহপাঠিনীর খোঁজে। নন্দিতাদি তাকে এস ফাল্টুস, বোস ফাল্টুস বলে খুব আপ্যায়ন করেন। স্বভাবতই নন্দিতাদির বোনের সঙ্গে তার মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাপারি যেমন ছিল তেমনি অনেক গুণও ছিল নন্দিতাদির। চমৎকার ছবি আঁকতেন। কলেজের অধ্যাপিকাদের কমনরুমে একটা ঢাউস ছবি এঁকে নিজের খরচে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। ছবিটা হল ঠাকুমার ঝুলি থেকে আঁকা। অরুণ বরুণ কিরণমালার ছবি। কেন যে হঠাৎ টিচার্স রুমে রূপকথার নায়ক নায়িকা শোভাবর্ধন করবেন তার কোন ব্যাখ্যা নেই। রিটায়ার করার আগে আরেকটা কাজ করেছিলেন। প্রিন্সিপ্যালের মাথার পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অমূল্য বাণী কোন অক্ষর শিল্পীকে দিয়ে বড় বড় করে আঁকিয়ে বাঁধিয়ে (এটাও নিজের খরচে) টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাণীটি হল —

"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসাদারদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।"

নব্য লেখকদের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সম্রাটের এই বাণীটি কেন যে প্রিন্সিপ্যালের মাথার ওপর টাঙানো হয়েছিল তা বলতে পারব না। তবে বাণীটি স্মরণে আসার পর এই লেখিকার যে অবিলম্বে কলম সম্বরণ করা উচিত তা জলের মত স্বচ্ছ। ❑

With Best Compliments From :

A PIONEER IN RIVER TRANSPORT

Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd.

4/5, Rishi Bankim Ch. Road,
Howrah Station, Howrah - 711 101

A successful cooperative venture in river transport catering to the need of 1 lakh commuters a day

A successful alternative to road transport in Calcutta Metropolitan direct and suburb introduced in 1980.

Achievement :

Viability & Employment Opportunity in public utility service

Ferry Station :

Kutighat	Howrah Stn.	Jagannath Ghat	Gadiara
Ratanbabu Ghat	Armenian	Matiabruz	Geokhali
Cossipur	Fairlie	Nazirgunj	Nurpoor
Bagbazar	Chandpal	Bouria	Ghusuri
Sovabazar	Garden Reach	Budge Budge	Bandaghat

SPECIAL SERVICE DURING SAGAR MELA IN JANUARY
FROM HOWRAH TO SAGAR ISLAND

HOLIDAY HOMES ON MODERATE CHARGES AT

DARJEELING & PURI.

With Best Compliments From :

474-1399/474-1396

STEEL AUTHORITY OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED

52/1A, BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD
CALCUTTA - 700 019

Financial Position As On 31.03.2000

		(Rs. in Lakhs)	
01.	Share Capital	Rs.	182.27
02.	Reserves & Surplus	Rs.	201.92
03.	Deposits & Borrowings	Rs.	1522.61
04.	Working Capital	Rs.	1872.80
05.	Net Profit	Rs.	65.00
06.	No. of Members		3248

SOCIETY'S HOLIDAY HOMES AT :

PURI ✪ DARJEELING ✪ DIGHA MANALI & PANCHGANI

Available for Members & Guests

With
Best
Compliments
From :

Bansara Colliery Employees'
Co-operative Credit Society Ltd.

P.O. Searsole Rajbari
Raniganj
Dist. : Burdwan

Bankura District Central Cooperative Bank Limited

HEAD OFFICE · MACHANTALA * BANKURA
TELEPHONES - (03242) · 50302/53458/51090
FAX - (03242)-55987

A COOPERATIVE BANK IN OUR STATE WHICH CAN BE REMEMBERED FOR ITS UNTIRING STRUGGLE

A COOPERATIVE BANK IN BANKURA WHICH TERMS IT AS PHOENIX FROM THE ASHES

- Only in the mid-80s the Bank has only Rs. 56 lakhs as outstanding of Agricultural loan.
- Only in the late 80s the Bank has 4% recovery rate.
- Only in the early years of the last decade the Bank could not think of taking care of the credit need of its ultimate clientele – the common people of Bankura.

Now we are in a sound position to serve people through a wide network of grass-root level Cooperative Societies and our 16 Branches. Our Head Office including Main Branch and Evening Branch is fully computerised.

Our Position (As on 31.3.2000)	Rs. in Lakhs
Paid up Share Capital	313.35
Reserves	990
Deposits	11211.74
Borrowings	1052.26
Working Capital	16330.36
Loans & Advances	4964.58

Mohitlal Mandal
Chief Executive Officer

Ajit Kumar Ganguly
Chairman

WITH

BEST

Tel. (0341) 44 8268

Raniganj Cooperative Bank Ltd.

(Regd. No. 5 RCS/98 Licence No UBD/WB - 1605P)

131. P. N. MALIA ROAD, P.O.-RANIGANJ - 713 347

DIST. BURDWAN

Fully Computerised Bank with Locker facility.
In the service of mankind from 25th January, 1999

BOARD OF DIRECTORS

Chairman
Dinesh Chandra Gupta

Vice-Chairman
Arun Kumar Todi

Secretary
Rabi Krishna Gupta

DIRECTORS

Haradhan Roy

Goutam Ghatak

Asim Kanjilal

Kanhaia Singh

Purnendu Singha

Khursheed Alam

Sushil Mondal

Aparna Ganguli

Ashok Bhattacherjee

Amal Kumar Bose

ভাণ্ডার পত্রিকার সৌজন্যে —

RDP

আরডি প্রিন্টার্স

অফসেট এ্যান্ড ডিটিপি

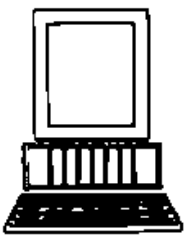

১৮০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট

কলিকাতা - ৭০০ ০১২

ফোন : ২৪১ ৭৫৫০ ॥ ৩৩৭ ৪২৬৫

জেলার জনগণের ব্যাঙ্ক

পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লি.

রাঁচী রোড, পুরুলিয়া - ২

শাখা : পুরুলিয়া — দিবা
ঐ — সান্ধ্য
বান্দোয়ান
বলরামপুর
রঘুনাথপুর
কেন্দ্রীয় কার্যালয় - পুরুলিয়া

দূরভাষ : (০৩২৫২) ২২২০৪
(০৩২৫২) ২২২০৪
(০৩২৫৪) ৫৫২৬৬
(০৩২৫২) ৮০২১৯
———
(০৩২৫২) ২২২০৪
২৫২৯৮
দূরলেখ : (০৩২৫২) ২৫২৯৮

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মতই সবরকম ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এই ব্যাঙ্ক বিগত ১৯৪৭ সাল থেকে ধীর অথচ সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। দিন বদলের পালার সাথে সাথে, ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে — তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে মানুষজনের পরিচিতির পরিসরও বেড়েছে। আমানত বিগত বছরগুলোর তুলনায় ক্রমবর্ধমান। পাশাপাশি বৃদ্ধিশীল ঋণ দাদনের ক্ষেত্র-ও। এরই সঙ্গে তাল রেখে বিনিয়োগের অঙ্কও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষজনের অর্থনৈতিক বিকাশে আমরা সদা আগ্রহী — সেজন্যেই, একদিকে, আমাদের সাহায্যের হাত যেমন দূর প্রত্যন্ত গ্রামের অসহায় মানুষদের নিয়ে তৈরি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর জন্যে প্রসারিত, তেমনই অন্যদিকে সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষদের নিয়ে তৈরি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর, বেঁচে থাকার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাতেও আমরা নিঃসংশয় চিত্তে অকুণ্ঠ আর্থিক সহায়তা দিয়ে চলেছি।

ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা সুচারু গ্রাহক পরিষেবায়, সু-বিন্যস্ত ঋণ দাদনে (সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্যে), সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে, সামাজিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় বিশ্বাসী—অবশ্যই সবাইকে সাথে নিয়ে।

পরিচালক পর্ষদ ও কর্মচারীবৃন্দ

সমবায় সমিতির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ঃ

দি হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট
সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ **উলুবেড়িয়া ❖ হাওড়া**

শাখা অফিস সমূহ

❖ উলুবেড়িয়া ❖ শ্যামপুর ❖ বেলপুকুর ❖ বাগনান
❖ আমতা ❖ ঝিকিরা ❖ বড়গাছিয়া ❖ হাওড়া
❖ উদয়নারায়ণপুর ❖ রাণীহাটি

❖❖❖

☆

❖❖❖

আমানতকারীর সকল আমানতের উপর সুদ বেশি দেওয়া হয়।

হাওড়া শাখা ছাড়া সকল শাখায় লকারের সুব্যবস্থা আছে।

স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ দেওয়া হয়।

আমানতকারীর আমানত আমানত বিমা দ্বারা সুরক্ষিত।

গৃহ নির্মাণ ঋণ ও ভোগ্যপণ্য ঋণ দেওয়া শুরু হইয়াছে।

যোগাযোগ ঃ

হেড অফিস ও নিকটবর্তী শাখা অফিস।

প্রবন্ধ

মেয়েদের মত ছেলে আর ছেলেদের মত মেয়ে

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

অনেকেই একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা ভাবেন ইচ্ছে করলেই বুঝি যে কেউ অপারেশন করে লিঙ্গ বদলাতে পারেন। নাইকেল জ্যাকসন যেমন। খবর কাগজে এরকম ঘটনার কথা মাঝে মাঝে ছাপা হয়, কিন্তু যেহেতু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে না, তাই অনেকে ভুল বোঝেন। যে কোন পুরুষ অপারেশন করে নারী হতে পারেন না, বা যে কোন নারী পুরুষ হতে।

এর আগে খুব ছোট করে নারী পুরুষের ক্রোমোজম-রহস্য বলে দেয়া যাক। যদিও এই ব্যাপারটা মোটামুটি সবাই জানেন। মানুষের দেহকোষে স্বাভাবিকভাবে ক্রোমোজম সংখ্যা হল ২৩ জোড়া, মানে ৪৬টি। ২৩টি আসে শুক্রাণু থেকে, বাকি ২৩টি ডিম্বাণু থেকে। এই ২৩ জোড়ার মধ্যে এক জোড়া হচ্ছে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজম। এই লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজমকে আকৃতি-প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে X এবং Y. মেয়েদের দেহকোষে দুটি X ক্রোমোজম থাকে এবং পুরুষের দেহকোষে একটি X এবং একটি Y ক্রোমোজম থাকে। ডিম্বাণুতে দুটি X ক্রোমোজম থাকে, শুক্রাণুতে একটি X একটি Y থাকে। কন্যাসন্তান মায়ের দুটি X -এর একটি X এবং বাবার একটি X পায়। পুরুষ-সন্তান মায়ের একটি X এবং বাবার একটি Y পেয়ে থাকে।

সুতরাং একটি পুরুষ শুধু দাড়ি গোঁফ উঠেছে বলে পুরুষ নয় কিংবা তার পুরুষ লিঙ্গ চিহ্ন আছে বলেই পুরুষ নয়। সে প্রতিটি কোষে পুরুষ। তার প্রতিটি কোষে রয়েছে XY ক্রোমোজম। একইরকমভাবে নারীও প্রতিটি কোষেই নারী। প্লাস্টিক সার্জারি করে এবং হরমোন প্রয়োগ করে ক্রোমোজম বদলানো যায় না। সুতরাং বলা যায় প্লাস্টিক সার্জারি করে পুরুষের বুকে কৃত্রিম স্তন তৈরি করা যায়, কিংবা লিঙ্গচ্ছেদন করা যায়,বড়জোর কৃত্রিম যোনি ও তৈরি করা যায় কিন্তু পুরুষকে নারী করা যায় না।

তাহলে যে মাঝে মধ্যে শোনা যায় — অশোকবাবু কিংবা অশোকবাবু অশোকা দেবী কিংবা অশোকা দেবী হয়ে গেছেন-সেটা কিভাবে সম্ভব? তাহলে আরও কিছু কথা বলতে হয়।

কিছু কিছু মেয়েকে দেখা যায় পুরুষালি স্বভাবের, আবার কিছু কিছু ছেলেদের আচরণেও মেয়েলি প্রকৃতি দেখা যায়। মেয়েলি প্রকৃতি বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি — তা হল একটু ছেলেদুলে হাঁটা, কথায় একটু সুর থাকা, সাজগোজ প্রিয়তা ইত্যাদি। এই ধরনের পুরুষরা অনেক সময় মেয়েদের মত পোশাক-আশাক পরতে পছন্দ করেন। কেউ কেউ ঘরে কেউ না থাকলে শাড়িটাড়ি পরে চুপচাপ বসে থাকেন। আগেকার দিনে এই ধরনের অনেক পুরুষকে যাত্রাদলে পাওয়া যেত, ওরা নারী চরিত্র অভিনয় করতেন খুব ভালভাবে। এঁরা নিজেরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের মেয়ে মনে করেন। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সঙ্গেই সহজভাবে মেশেন কিন্তু যৌবন প্রাপ্তির পর এরা সাধারণত যৌনসঙ্গী হিসেবে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই বেশি পছন্দ করেন। অর্থাৎ এঁরা সমকামী। এঁদের মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় ট্রান্সভেস্টাইট বা বিপরীত সাজসজ্জাকামী, [illegible] বিপরীত সাজসজ্জাকামী,

মেয়েলি পোশাক-টোশাক পরেই সন্তুষ্ট হন একটু লিপস্টিক লাগান। ছেলেরা কখনও প্রকাশ্যে বেশি ঘুরি হন যৌন পরিবর্তনের মত এতদূরে এঁরা যেতে চান না Eon নামের একজন সৈনিক তাঁর জীবনের ৪১ বছর পুরুষ হিসেবে এবং বাকি ৩৪ বছর নারী হিসেবে কাটিয়েছিলেন নারীদের মতই পোশাক পরতেন মৃত্যুর পর তার দেহকোষ টেস্ট করে জানা যায় যে তিনি প্রকৃতই পুরুষ ছিলেন তাই এর নাম অনুসারে বিপরীত সাজসজ্জাকামী পুরুষদের Eonstও বলা হয় এবং এই মনস্তাত্ত্বিকতাকে Eonism বলা হয় আমাদের মধ্যেই অনেক Eonist আছেন, তাঁদের কেউ কেউ অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন এবং মনস্তাত্ত্বিক এঁদের বাহ্য আচরণে কিছু নেই। আমরা এঁদের ক্রেডিট ক্রেডিট বলে চিহ্নিত করি, এটা আমাদের পক্ষে যৌনরোগের মত নিম্ন পরিবর্তনকামী পুরুষরা নারী মনস্তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে আরও নারী এঁরা তাঁদের পুরুষ পরিচয়কে অস্বীকার করতে চান শুধু নারীর পোশাক পরিচ্ছদই নয়, আরও বেশি নারী হতে চান এঁরা অনেক সময় প্যাড দেয়া ব্রেসিয়ার পরেন, লিপস্টিক মাখেন, পুরুষদের সঙ্গে যৌনভাবে মিশতে চান, নিজের লিঙ্গটিকে অবাঞ্ছিত মনে করেন, এঁরাই অপারেশন করে লিঙ্গচ্ছেদ করেন যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা সিলিকন প্রয়োগ করে কৃত্রিম স্তন তৈরি

করান, বা প্লাস্টিক সার্জারি করে কৃত্রিম স্ত্রীলিঙ্গ তৈরি করান। কিন্তু জরায়ু তৈরি করাতে পারেন না; ডিম্বকোষও নয়। এই মানসিকতায় অনেকেই হিজড়ায় পরিণত হন।

আমরা হিজড়া বলে যাদের জানি বা দেখি তাদের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে হিজড়ার সংখ্যা খুবই কম। প্রকৃত হিজড়াদের শরীরে শুক্রকণা ও ডিম্বাণু দুটোই থাকে, কিন্তু কোনটাই ঠিকমত কাজ করে না। পুরুষাঙ্গ অপুষ্ট বা প্রায় অদৃশ্য, শুধু ছিদ্র থাকে। প্রকৃত হিজড়াদের ক্রোমোজমও ত্রুটিপূর্ণ। ৪৬টির পরিবর্তে ৪৭টি ক্রোমোজম দেখা যায়। কখনও ৪৮টিও। কোন কোন হিজড়া হরমোনের ত্রুটির শিকার। হরমোনের ত্রুটি সু-চিকিৎসায় সেরে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের অশিক্ষা এবং কুসংস্কার, সর্বোপরি দারিদ্র্য এই ধরনের হিজড়াদের চিকিৎসিত হবার পথে বাধা। জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী হিজড়ার শতকরা অংশ হল মাত্র ৫ ভাগ। অর্থাৎ যত হিজড়া আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে ৫% জন্ম-হিজড়া। ৫০% লিঙ্গচ্ছেদন করে হিজড়ে হয়েছে। বাকিরা বিপরীত সাজসজ্জাকামী। এঁরা এই বিপরীত সাজসজ্জাকামীরা হিজড়ে সমাজে হয়েছেন নানাবিধ কারণে। কিন্তু লিঙ্গচ্ছেদ করাননি। এই বিপরীত সাজসজ্জাকামীরা সমাজে, বন্ধুমহলে অপমানিত হন। হিজড়া সমাজ এদের আপন করে নেয়। এছাড়া হিজড়া সমাজে এরা খাওয়া থাকার একটা গ্যারান্টি পেয়ে যান। আর যৌন পরিবর্তনকামী পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের ইচ্ছায় লিঙ্গচ্ছেদ করান, কখনও কখনও ওদের ছেঁড়া করা হয়।

১৯৭৪ সালে ডা. জে বি মুখোপাধ্যায়, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময় পুলিশ ৪০ জন হিজড়াকে গ্রেপ্তার করেছিল। ডা. মুখার্জি তখন ঐ হিজড়াদের উপর পরীক্ষা চালান। তিনি হিজড়াদের অনেক কথাবার্তা রেকর্ড করেছিলেন, ওদের রক্ত পরীক্ষা করেছিলেন, হরমোন টেস্ট করেছিলেন। কিন্তু অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐসব মূল্যবান ফটোগ্রাফ এবং ক্যাসেট নষ্ট হয়ে গেছে। তবে তাঁর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল আমেরিকার একটি বিখ্যাত পত্রিকায়। সেই লেখাটি থেকে জানা যায় — ঐ ৪০ জনের মধ্যে ২০ জন লিঙ্গচ্ছেদ করেছে, বাকি ২০ জন যৌন পরিবর্তনকামী। ছুড়ি জন যৌন-পরিবর্তনকামীর মধ্যে তিন জনের শরীরে স্ত্রী হরমোনের অধিক্য আছে বলে ইস্ট্রোজেন। এদের কিছুটা স্তনও আছে। কিন্তু মোটের উপর থেকে টিস্যু নিয়ে ক্রোমোজম পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, চল্লিশ জনই পুরুষ। অর্থাৎ ঐ ৪০ জন হিজড়ার মধ্যে একজনও প্রকৃতিগত/জন্মগত উভলিঙ্গ নয়। কেন পুরুষ হয়েও নারীর মত আচরণ করেন বা মানসিকভাবে নারী থাকেন বা নারী হয়ে উঠতে চান এর কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। আমরা পুরাণে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা দেখেছি। বৈষ্ণবদের এক অংশ সখীভাবে কৃষ্ণ ভজনা করেন। এর একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সামাজিকভাবে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আমরা এটা দেখেছি: ছোটবেলায় তফাৎটা বোঝা যায় না, কিন্তু কৈশোরের পর থেকেই লক্ষণগুলি দেখা যায়। ফলে বাড়ির লোক ধন্দে পড়েন। অনেক সময় মারধোরও করেন। কিন্তু মারধোরে কিছু ফল হয় না। ছেলেটি হীনম্মন্য হয়ে যায়। মানসিক ব্যবহারে তার প্রতিফলন ঘটে। হীনম্মন্যতা থেকেই বিক্ষেপ এবং বিষাদ ঘটে। এরা বন্ধুবান্ধব পায় না। মেয়েরাও ঠিকমত মেশে না!

কিছু কিছু মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে এরকম স্বভাবের। যেমন কেউ বলেন শিশুপুত্র শৈশবে মায়ের প্রতি অসম্ভব টান অনুভব করে এবং বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। মনে করে সে যদি মেয়ে হয়ে যায় তাহলে বাবা তাকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেই ভেবেই তার মেয়েদের মত পোশাক পরার বাসনা জাগে। কিন্তু হরমোন বিশেষজ্ঞরা এই কারণ মানতে রাজি নন। তাঁরা হরমোনকেই দায়ী করেন। কিন্তু অনেক মেয়েলি পুরুষকে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরন ইনজেকশন দিয়েও কিছু লাভ হয়নি। একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সাইমন ডি-লিভে মানব মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অবস্থাকে এ জন্য দায়ী করতে চান। আজকাল জিন বিশেষজ্ঞরা জিন দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায় কিনা ভাবছেন। মেয়েলি ছেলেদের অনেকের ক্রোমোজম বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাদের Y ক্রোমোজমের ছোট বাহুর একটা অংশ নষ্ট হয়ে গেছে অথবা বড় বাহুর কিছুটা ছিন্ন হয়ে অন্যকোন ক্রোমোজমে লেগে আছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছেলেদের শুক্রকণার উৎপাদন সংখ্যামত দিক দিয়ে কম হয়। অনেক সময়েই এদের পুরুষাঙ্গ অপুষ্ট হয়। অনেক অভিভাবক ভাবেন বিয়ে দিলেই এরা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়।

মেয়েলি পুরুষের মত পুরুষালি মেয়েও হয়। তবে কম দেখা যায়। আমাদের মহাভারতের চরিত্র চিত্রাঙ্গদাকে মনে পড়ে? তিনি রাজকন্যা হয়েও পুরুষের পোশাক পরতেন, যুদ্ধ করতেন।

আমাদের সমাজেও অনেক মেয়েকে দেখা যায় ছেলেদের মত। কিন্তু মেয়েলি পুরুষের তুলনায় পুরুষালি মেয়ের সংখ্যা অনেক কম। এই ধরনের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব মতই মেশে, কিন্তু যৌন আকর্ষণ বোধ করে না। অনেকেই মেয়েদের সঙ্গেই সমকামীতার সম্পর্ক করে থাকে। কিন্তু প্লাস্টিক সার্জারি করে পুরুষ হবার প্রবণতা এদের মধ্যে খুবই কম থাকে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা বিদেশে, সার্জারি করে স্তন বাদ দিয়েছে, এবং কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ লাগিয়েছে। তবে পুরুষালি মেয়েদের অনেকেরই সামান্য গোঁফ ওঠে, স্তন অপুষ্ট হয়। বংশতালিকা পরীক্ষা করে দেখা যায় এদের মাসি বা পিসির মধ্যে এরকম প্রবণতা ছিল। এদের অনেকেরই হয় হরমোনের গন্ডগোল থাকে কিংবা X ক্রোমোজম ভাঙা অবস্থায় থাকে। হরমোনের গন্ডগোল থাকলে সুচিকিৎসায় তা সেরে যায়।

গোলাপ ফুল গোলাপী। কিন্তু হলুদ গোলাপও তো গোলাপ। এই ধরনের ছেলেমেয়ে আমাদের সমাজেই জন্মায়, এতে ওদের কোন দোষ বা দায় নেই। এরা হলুদ গোলাপ। এদের টিটকিরি দিয়ে অবজ্ঞা করে মূলস্রোত থেকে সরিয়ে দেয়া ঠিক নয়। মারধোর করেও লাভ নেই। মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নেয়া এবং দরকার হলে হরমোন চিকিৎসা করালে ফল পাওয়া যায়। ফল না পাওয়া গেলেও মন খারাপের কিছু নেই। এরা আর পাঁচ জনের মতই সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারেন — যদি আমরা এদের প্রতি দায়িত্বশীল হই। একটা পুরুষ যদি সালোয়ার কামিজ পরেই কম্পিউটার চালান কিংবা চিত্রশিল্পিচালনা করেন, তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল! ❑

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক —

ধূপগুড়ি হেল্‌থ এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি

ডা. বিক্রম সিং বসুমাতা
সভাপতি

সম্পাদক
সুকেশ চক্রবর্তী
ক্যাশিয়ার

খাগড়াবাড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.
(মিনি ব্যাঙ্ক)

পোঃ ময়নাগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি

* আমরা সঠিক সময়ে সদস্যদের স্বল্প সুদে কৃষিঋণ দান করি।
* সদস্য ও সদস্য নয় এরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাঙ্কিং নিয়মে আমানত সংগ্রহ করি।
* স্থায়ী আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত স্বল্প সুদে ঋণ দান করি।
* এছাড়া কে ভি পি, এন এস সি, টি ডি পি সরকারি আমানতের সার্টিফিকেট জমা রাখিয়াও স্বল্প সুদে ঋণ দান করি।

রণজিৎ সরকার
সম্পাদক
গিরিন্দ্রনাথ রায়
ম্যানেজার

পর্যটকদের জন্য আনন্দ সংবাদ

সি আই ডব্লিউ টি সি এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড-এর

পুরী, শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং এবং দিঘায় হলিডে হোম
'আনন্দমেলায়' আসার জন্য রইলো সাদর আমন্ত্রণ

যোগাযোগ কেন্দ্র
সি আই ডব্লিউ টি সি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি লি.
৪ ফেয়ারলি প্লেস (তৃতীয় তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১, দূরভাষ : ২২০ ২৩২১

শারদীয়া ও দীপাবলি উৎসব হোক আনন্দমুখর

নলে ফতেপুর
সমবায়
কৃষি উন্নয়ন
সমিতি লি.

গ্রাম : কোহাই, পোঃ নলে, জেলা : বর্ধমান
রায়না ২ নং ব্লক

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

DURGAPUR PROJECTS EMPLOYEES' COOPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(Town Administration Building)
D.P.L. Township
Durgapur - 713202
(Regd. No. 3417)
Phone No. Durgapur - 55-5526

বারওম পায়রাগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজিঃ নং ৪০৬/৬৪/২৪ পরগণা

গ্রাম ও পোঃ বারওম, ২৪ পরগণা (উত্তর)

ব্যাঙ্কিং বিভাগ রয়েছে (এফ ডি, আর ডি, সেভিংস)।
আকর্ষণীয় সুদে বিভিন্ন খাতে ঋণ দেওয়া হয়।

পঞ্চানন ঘোষ — সভাপতি
চিত্তরঞ্জন দাস — সম্পাদক
সুবরণ চ্যাটার্জি — ম্যানেজার

শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই —

বীরভূম কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

সিউড়ি ● বীরভূম

মূল ব্যবসা

ডেল-মিল, সার, ট্রাক্টর, বন্ধকি

প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পথে

কয়থা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

কয়থা, বীরভূম

সেক্রেটারি — চেয়ারম্যান

শুভেচ্ছা সহ

"সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক"

ধূপগুড়ি হাইস্কুল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

পোঃ ধূপগুড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি

THE 'IISCO' EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Burnpur Works

ESTD. 9th Sept '74

The largest successful Co-operative Credit Organisation in this Zone, by serving the people of Burnpur.

In the changing scenario and whirlpool of Liberalization insecurity prevails, only co-operation gives you safety and security.

Wish a warm welcome to its Members and well-wishers on the completion of Silver Jubilee year of 1974-1999, 25th years of service.

DATA AS ON 31.03.1998

No. of Members as on	
31st March 1998 (97-98)	12028
Share Capital	Rs. 2,50,00,000.00
Working Capital	Rs. 18,64,20,775.00
No. of Directors	13
No. of Elected Delegates	47

Aloke Baran Roy
Chairman

Probodh Kumar Ghatak
Vice-Chairman

Ganesh Mishra
Hony. Secretary

গল্প

বৈধব্যপুরাণ

সনৎ বসু

বাড়ির সামনে ধরাধরি করে খাটটা নামাতেই পড়শিদের ভিড় উপচে পড়ে। মুখটুকু বাদ দিয়ে রাম চক্রবর্তীর সারা শরীর কাপড়ে ঢেকা যেন গভীর নিদ্রামগ্ন।

একটু চোখে দেখার জন্য সবাই সামনে আসতে চায়। রামের অকাল মৃত্যুর আকস্মিকতায় সকলেই স্তব্ধবাক্ বিমূঢ়। মাত্র সাতদিনেই শেষ হয়ে গেল ভরভাজা ছেলেটা।

— আহারে, অমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত বৌ, ফুলের মত দুটো মেয়ে বৃদ্ধা তারাসুন্দরীর বুক ফাটে কথাগুলি বলতে।

— শুনেছি আপনার কেউ নেই, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল বৌটার।

পাশের বাড়ির মাশ্পির মা চোখ মুছতে মুছতে বলে।

পাড়ার ইউনাইটেড ক্লাবের অনেকের চোখে জল। রামদা যে তাদের খুব কাছের মানুষ ছিল। ক্লাবের প্রোগ্রামে বা পাড়ার লোকের বিপদে আপদে রামদা থাকত সবার আগে। মুখে সবসময় হাসি। রাগ নেই, ঝগড়া-বিবাদ নেই। ইয়ারকি ফাজলামি ছাড়া কথাই বলত না।

আর সবসময় ফিটফাট থাকত। গায়ের রং টকটকে ফরসা। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল, টিকালো নাক। রামদাকে সিনেমার হিরোর মত লাগত।

সেই লোকের এভাবে মৃত্যু!

সাতদিনে যেন সত্তর বছরের বুড়ো হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া পুড়ে কালো বিবর্ণ, কোটরে ঢোকা চোখ, কুঁচকানো গাল। হঠাৎ দেখলে চেনাই যায় না।

পাড়া উন্নয়ন কমিটির সেক্রেটারি সুনন্দ বোস ফুলমালা আর দাহকাজের সামগ্রী নিয়ে রিক্সা থেকে নামতেই যুবকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পাড়ার অধিবাসীদের পক্ষে রামের শব দেহে মালা দেন কমিটির সভাপতি বিনয় ভট্টাচার্য। এরপর ক্লাবের পক্ষ থেকে মাল্যদান পর্ব। প্রথমে সেক্রেটারি অচিন্ত্য, তারপর একে একে অন্যরা।

সেই ফাঁকে সুনন্দ আর বিনয়কে একান্তে কথা বলতে দেখা যায়।

— রোগটা ধরা পড়ল?

— হ্যাঁ, লিভার ক্যানসার।

— সে কি, রাম তো এই সেদিনও পাড়ায় স্পোর্টসে দৌড়ল!

— সেটাই তো আশ্চর্যের। এই মারণ রোগ নিয়ে কি করে যে অমন প্রাণবন্ত থাকতে পারে!

— বোধ হয় জানতো না।

— জানতো। এক বন্ধুর আগে ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছিল। রাম শোনেনি। কাউকে বলেনি। নিজের স্ত্রীকেও না।

মুহূর্তে কথাটা ছড়িয়ে যায় ভিড়ের ভেতর ক্যানসার ক্যানসার একটা হিম অনুভূতি। অস্তিত্বের গোপন টানাপোড়েন। আক্রান্ত হলে যার হাত থেকে কোন নিস্তার নেই।

বাড়ির ভিতরে অন্য দৃশ্য। রামের যুবতী স্ত্রী রেণুকার বুক নিঙড়ানো বিলাপ। আট বছরের মৌটুসি মায়ের চোখে নিষ্পলক। ছল ছল চোখ। তিন পেরিয়ে সদ্য গায়ে পড়া ফুলটুসির সবকিছুতে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা। বাবার কিনে দেওয়া জাপানি পুতুল কোলে নিয়ে আনমনে এধার-ওধার করে। মাঝে মাঝে আড়চোখে মাকে দেখে। মুখের সেই বকবকানি উধাও। এক সময়ে রেণুকাকে ধরাধরি করে রামের পায়ের কাছে বসানো হয়। পোহনে দুই মেয়ে। স্বামীর পা দুটো ধরে রেণুকা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে নীচে। মৌটুসি 'বাবা ও বাবা' বলে চিৎকার করে কাঁদে। ফুলটুসির যেন এতক্ষণ পরে খেয়াল হয়। বাবার মুখের কাছে ছুটে আসে। টেনে খুলতে চায় চোখের পাতা। পুতুলে দম দিতে ভুলে।

তা দেখে মহিলামহলে কান্নার রোল, পুরুষদের অনেকে রুমালে চোখ মোছে।

দৃশ্যটি সহ্য করতে না পেরে অচিন্ত্য তাড়া লাগায়। সুনন্দ বোস ইশারা করতে ছেলেরা কাঁধে তুলে নেয় খাট।

'বলহরি ... হরিবোল... বলহরি হরিবোল' ...

ম্যাটাডোর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় শ্মশানের উদ্দেশে।

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়। রেণুকার পরনে সাদা থান। আলুথালু চুল। ফুলটুসি ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। মৌটুসি মেঝেয় বসে ঢুলছে। নিকট আত্মীয় কেউ আসেনি। খবর পেয়ে বারাসাত থেকে রামের দুই দূরসম্পর্কের ভাই এসেছিল। শ্মশান থেকেই চলে গেছে।

সারাবাড়ি নিস্তব্ধ। কেবল রান্নাঘরে স্টোভের শব্দ। সীমান্তি ব্যস্ত মেয়ে দুটোর মুখে কিছু তুলে দেওয়ার জন্য। প্রতিবেশী দত্ত- মিত্তির রেণুকার পাশে বসে সান্ত্বনা দেয়। রেণুকার স্থির দৃষ্টি দরজার উপরের দেওয়ালে রামের ফটোর উপর।

বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সীমান্দি রেণুকার পাশে বসে। দত্ত-গিন্নি অনেক আগেই চলে গেছে। দশটা নাগাদ সুনন্দ ঘোষ এসেছিল সীমান্দির সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেছে।

সবাই চলে গেলে সীমান্দিকে জড়িয়ে কাঁদে রেণুকা, 'আমাকে ফেলে যেও না দিদি। আমার যে কেউ নেই।'

— দূর পাগলি। তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারি? কিন্তু ভাবিস না। আমরা সবাই তোর পাশে আছি।

সীমান্দির আশ্বাসে রেণুকার শোক যেন আরও উথলে ওঠে, 'ও ছাড়া আমি কি করে বাঁচবো দিদি, আমি যে কিছুই জানি না'

— সব ঠিক হয়ে যাবে বোন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বলতে গিয়ে সীমান্দির চোখের কোলটা হঠাৎ সিক্ত। মনে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর দিনটা। বোমায় ছিন্ন ভিন্ন অজস্র দেহ। বাড়ির সামনের রাস্তায় খুন হয়ে গেল ওভাদের হাতে। বাহাত্তরের সেই অন্ধকার সময়। মাত্র এক বছর ওদের বিবাহিত জীবন। সেদিন তিনিও রেণুকার মত কেঁদেছিলেন অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে। আজ পঁচিশ বছর পর সবকিছু কেন অদ্ভুত মনে হয়। এখন তিনি মহিলা সমিতির ব্যস্ত নেত্রী। সারাদিন কেটে যায় সংগঠনের কাজে।

এই সংগঠনের চাঁদা কাটতে এসেই বছর তিনেক আগে রেণুকার সঙ্গে আলাপ। রেণুকারা তখন সবে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে এসে উঠেছে। ফুলটুসি মাত্র ন'মাসের। কথা বললেই খিলখিল করে হাসে। সেই হাসির টানে রোজই আসতেন মেয়েটাকে আদর করতে। তারপর কখন যে তাদের আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন সীমান্দি নিজেও জানেন না।

সীমান্দি, সুনন্দ ঘোষ আর অচিন্ত্যর তত্ত্বাবধানে অনেক অবস্থা কাটিয়ে ওঠে রেণুকা। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার দুদিন পর বাংলাদেশ থেকে ছোট ছেলে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন রামের মা কাননবালা।

বিয়ের দশ বছর পর প্রথম ছেলের সংসারে আসা কাননবালার, নাতনিদের মুখ দেখা। কুচ্ছিত মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি তিনি। কিন্তু রামের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি।

রামের সাজানো-গোছানো বাড়ি, ভরন্ত সংসার আর পরির মত নাতনিদের দেখে পুত্রশোক চতুর্গুণ বেড়ে ওঠে বৃদ্ধার। বারান্দায় হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেন।

ব্যবসা বন্ধ রাম হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে। ঘরে মালের পাহাড়। সংসারেও অর্থের টান। উদ্বেগ আশঙ্কায় রেণুকা অস্থির। কাননবালাকে সব খুলে বলে, পরামর্শ চায়। কাননবালার বিশ্বাস হয় না রেণুকার কথা। উল্টে রেণুকার বিরুদ্ধে রামের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনেন।

বিশ্মিত রেণুকা দুঃখে অপমানে কাঁপতে থাকে।

— কি যা তা বলছেন মা?

— ঠিকই কই। ভালমতন চিকিচ্ছা হইলে মরতে না পোদায়।

— তার মানে, আপনার ছেলের চিকিৎসায় গাফিলতি করেছি?

— আমি আর কি কমু। পাড়াপড়শিগো মুখ তো বন্ধ করোন যায় না। তহনি কইছিলাম পোলারে, অবস্থের কাম করিস না রাম। কিন্তু পোলার তহোন তোমার রূপে পাগল। কথাডা শুনলে ...।

— বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। রেণুকা চিৎকার করে ওঠে।

— কান যামু? এইডা কি তোর [illegible]? তুমি করং আমার পোলার বাড়ি ছাইড়া যাওগা। কাননবালার চোখে সাপের শীতলতা। রেণুকার আর কথা বলতে কষ্ট হয় না। দাওড়ির [illegible] ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে।

দিন কয়েক পরে ছাদে কাপড় মেলতে গিয়ে রাস্তায় লক্ষ্মণকে পিন্টুর সঙ্গে কথা বলতে দেখে শিউরে ওঠে রেণুকা। পিন্টু একটা আস্ত শয়তান। পাড়ে না এমন কোন খারাপ কাজ নেই। জমিটা কেনার সময় পার্টির নাম করে রামের থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছে। রসিদ চাইতে গেলে জানে মারার ভয় দেখিয়েছে। পিন্টুকে হাত করে লক্ষ্মণ কি [illegible] ভরাডুবি করতে চায়?

সুনন্দ ঘোষের কাছে ছুটে যায় রেণুকা। সব শুনে তাকে আশ্বস্ত করে সুনন্দ। নিশ্চিন্তে সংসার করতে বলে। [illegible] যত্ন নিতে বলে। কোন অসুবিধা হলে সীমান্দির মাধ্যমে জানাতে বলে।

সুনন্দ'র ব্যবহারে রেণুকা মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ। অসুস্থ রামকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা, দেখভালের জন্য রোজ লোক পাঠানো—সব [illegible] করেছে নিখুঁতভাবে। রেণুকাকে কোন কিছুই পোহাতে হয়নি। রামের মৃত্যুর জন্য দারুণ আপশোস করেছে সুনন্দ। রাম ঠিকই বলতো, 'এ পাড়ার সত্যিকারের মানুষ আছে একজনই — সুনন্দদা। এরকম ভোট পার্টিতে খুব কম দেখা যায়।'

রেণুকার এখন প্রধান চিন্তা কারবারটা চালু করা। সেরকম হলে নিজেই হাটে যাবার ব্যাপারে মন স্থির করে। না গিয়ে উপায় কি? চোখের সামনে মেয়েদের তো অনাহারে মরতে দেওয়া যায় না!

একনাগাড় ন-দিনের মাথায় বাংলাদেশ ফিরে যান কাননবালা। লক্ষ্মণ থেকে যায় দাদার সংসারে।

শাওড়ির খোঁচা থেকে বাঁচতে পেরে রেণুকা মনে মনে খুশি। কিন্তু লক্ষ্মণের থেকে যাওয়াটার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না।

কিছুদিন যেতে লক্ষ্মণের ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন। রেণুকাকে পাশে বসিয়ে সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে। যেচেই বড়বাজার আর হাটের দায়িত্ব নিতে চায়। রেণুকাকে সাহস যোগায়।

রামের মত লক্ষ্মণও খুব আমোদ প্রিয়। সবসময় হৈ হৈ-এর মধ্যে থাকে। বৌদিকে গম্ভীর দেখলেই হাসিঠাট্টা করে। ভাইঝিদের সঙ্গে ফুলঝুরি করে। প্রথম প্রথম দ্বিধা থাকলেও রেণুকাও মিশে যায় এক সময়।

লক্ষ্মণের ব্রত আর রেণুকার আন্তরিকতায় মাস দুয়েকের মধ্যে থেমে যাওয়া ব্যবসাটা মোটামুটি চালু হয়।

রামের সঙ্গে অদ্ভুত মিল লক্ষ্মণের। ব্যবহারে, কণ্ঠস্বরে, কাজ করার ধরনে। সবচেয়ে বড় মিল চেহারায়।

কতবার রান্নাঘর থেকে রামের গলা মনে করে কাপড় কাটার ঘরে ছুটে গেছে রেণুকা। লক্ষ্মণ যখন যান কাপড় মেঝেতে ফেলে উবু হয়ে কাটে-রেণুকা তন্ময় হয়ে দেখে। অবিকল সেই ভঙ্গি।

একদিন চা দিতে গিয়ে লক্ষ্মণের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছে রেণুকা। সেই সম্মোহন। নিজেকে সামলে ছুটে গেছে ঘরে। সাময়িক দুর্বলতার জন্য তিরস্কার করেছে নিজেকে।

সংসারে কতরকমের কাজ। লোকটা বেঁচে থাকতে কিছুই ভাবতে হয়নি। প্রয়োজনের আগেই সব হাতের কাছে হাজির। পাড়ার লোকেরা বলত রাম চক্কোত্তির মত সংসারী মানুষ এ তল্লাটে কেউ নেই।

সেই লোক এমন ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। একা থাকলেই রেণুকা অন্যমনস্ক। কত স্মৃতি। কত রোমান্স। সব শেষ। বাকি জীবনে শুধু মরুভূমির ধু ধু বালি। রামকে ছাড়া সে কি করে কাটাবে। তার দেহেও যে প্রবণের ভরা বন্যা।

রাতে ঘুমন্ত ফুলটুসিকে বুকে চেপে নিঃশব্দে কাঁদে। 'এ আমাকে কোথায় রেখে গেলে তুমি। আমি কি পাপ করেছি ঠাকুর। চরম শাস্তি কেন দিলে।' অশ্রুধারায় বালিশ ভিজে যায়। রেণুকা পাশ ফিরে শোয়। স্মৃতিপটে ভাসে রামের সঙ্গে প্রথম অভিসারের দিনটি। নদীর ধারে কষ্ট মন্দিরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল রেণুকা। সন্ধ্যা হয় হয়। রামের পাত্তা নেই। একরাশ অভিমান আর রাগ নিয়ে বাড়ির পথে সবে দু'পা বাড়িয়েছে হঠাৎ পেছন থেকে চোখ চেপে ধরেছিল রাম। তারপর রেণুকাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছিল ঠোঁট।

সেই শুরু। রামের উদ্দাম ভালোবাসার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল রেণুকা। আর ফিরে তাকায়নি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রামের সেই উদ্দামতায় কোন ভাটা পড়েনি।

রেণুকা ছটফট করে বিছানায়। রামের জ্বালানো আগুন তার রক্তের ভেতর। বিশেষ করে রাতের নিথর অন্ধকারে। সাতাশ বছরের যৌবনবতীর চাপা কান্নায় ঘরের রুদ্ধ বাতাসও বুঝি চমকে চমকে ওঠে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ, খট্‌খট্ _ খট্‌খট্ _। আধোতন্দ্রার ভেতরেও রেণুকা উৎকর্ণ। তবে কি ফিরে এল রাম। রাম কি তবে

রেণুকা ছিটকে নামে বিছানা থেকে। দরজা খুলে দাঁড়ায়। চাদরে মুখ ঢেকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত রেণুকা আছড়ে পড়ে বুকে। 'কোথায় ছিলে তুমি, বলো ... আমাকে একা ফেলে _ বলো বলো বলো _' রুদ্ধ আবেগে গলা বুজে যায়।

— বৌদি, কেঁদো না বৌদি ...

লক্ষ্মণের গলা শুনে শিউরে ওঠে রেণুকা। দৌড়ে ঘরে ঢুকতে যায়। পেছন থেকে আঁচল টেনে ধরে লক্ষ্মণ, 'যেও না' —

হ্যাঁচকা টানে আঁচল গায়ে জড়িয়ে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে রেণুকা, 'তুমি এত রাতে এখানে কেন।'

— তোমার দুঃখের ভাগীদার হবার জন্য। কতই বা বয়েস তোমার! সম্পর্কে বড় হলেও বয়েসে তুমি আমার থেকে অনেক ছোট। তোমার রূপ যৌবনকে শুকিয়ে মেরো না বৌদি

— ঠাকুরপো। আর একটি কথাও শুনতে চাই না আমি। ঘরে যাও। কি যে ছিল রেণুকার কণ্ঠে। লক্ষ্মণ চোরের মতন ঢুকে যায় ঘরে। দরজা বন্ধ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রেণুকা। গুমরে গুমরে কাঁদে।

লক্ষ্মণ কথা শোনে না। প্রায় রাতে টোকা মারে দরজায়। রেণুকার দিক থেকে সাড়া না পেয়ে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়। অষ্ট দিনের আলোয় লক্ষ্মণের সম্পূর্ণ অন্য রূপ। ব্যবসার উন্নতির জন্য প্রাণপাত করে খাটে।

ইদানীং সময় পেলেই পাশের বাড়ির সুকুমার দত্ত আসেন। সদ্য রিটায়ার করেছেন। হাতে প্রচুর অবসর। সুকুমারবাবু খুব রসিক মানুষ। কথায় কথায় লোক হাসাতে ওস্তাদ। তার মজার মজার কথা শুনে রেণুকা হাসে, মেয়েরা হাসে। রেণুকার বাইরের অনেক কাজ দত্তবাবু যেচেই করে দেন। ভদ্রলোককে রেণুকার বেশ ভালো লেগে যায়।

সেই দত্তবাবুই একদিন কথাচ্ছলে রেণুকার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে যান। ছিটকে যায় রেণুকা।

দিন কয়েক পর। সন্ধ্যে নাগাদ দুই মেয়েকে নিয়ে বাজারে যাবার পথে অচিন্ত্যর সঙ্গে দেখা। রামের মৃত্যুর ছ'মাস পর সীমান্তির পীড়াপীড়িতে সেদিনই প্রথম সাদা শাড়ি ছেড়ে রঙিন ছাপা শাড়ি পড়েছিল রেণুকা।

অফিস ফেরত অচিন্ত্য ওদের দাঁড় করিয়ে নানা খোঁজ-খবর নেয়। কথার ফাঁকে রেণুকার চোখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। রেণুকা অস্বস্তিতে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। তখন কানের কাছে মুখ এনে অচিন্ত্য বলে ওঠে, 'তোমাকে দারুণ লাগছে বৌদি! সত্যিই আমি উত্তেজিত বোধ করছি।'

প্রকাশ্য রাস্তায় মেয়েদের সামনে অচিন্ত্যর এহেন আদিখ্যেতায় চোখ মুখ লাল হয়ে যায় রেণুকার।

স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকী পেরোতে না পেরোতেই রেণুকা বুঝে যায় তার উপর পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি। সেখানে আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বামীর বন্ধু বা বৃদ্ধ পড়শি-সকলেই সমান। একটু অসাবধান হলেই বিপদ। সে যে সহায়-সম্বলহীনা বিধবা!

এর মধ্যেই বাঁচতে হবে। দুই মেয়েকে মানুষ করতে হবে। বিয়ে দিতে হবে। ব্যবসা চালু রাখতে হবে।

মাথায় কেবল দারিদ্রের বোঝা। আশেপাশে কেউ নেই যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। ভরসা করা যায়।

রেণুকা তীব্রভাবে অনুভব করে এক বিশ্বস্ত সঙ্গীর। যে তাকে বুঝবে, ভালোবাসবে। যার সাহচর্যে শুষ্ক পৃথিবীটা আবার তার কাছে রূপে-রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কোথায় সেই মানুষ! রামের মত সরাজ হৃদয় যার। সেই মানুষকে নিয়েও কি নতুন ঘর বাঁধা যাবে? সমাজ কি তা খোলা মনে গ্রহণ করবে? অথচ বিপত্নীক পুরুষের বিয়ে দোষের নয়। কেউ তা নিয়ে কথা বলবে না। যত নিয়ম যত বিধি কি কেবল মেয়েদের বেলায়?

একমাত্র সীমান্তিই বোঝে তার যন্ত্রণা। সীমাদি নিজেও যে অকাল বিধবা। বলি বলি করেও লজ্জায় মনের কথাটি বলতে পারেনি সীমাদিকে। স্বামীর মৃত্যুর পর কি করে নিজেকে ধরে রাখতে পেরেছিল সীমান্তি। কি সেই অব্যর্থ উপায়।

রাতে দুই মেয়েকে পড়াতে বসিয়ে সজল চোখে রামের কথা ভাবছিল রেণুকা। বাইরে সীমান্তির গলা, 'মৌ, ফুল

বই ফেলে 'মাসি, মাসি' বলতে বলতে বারান্দায় ছুটে যায় দু'বোন আঁচলে চোখ মুছে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে রেণুকা।

দু'বগলে দু'জনকে চেপে ঘরে ঢোকে সীমান্তি। রেণুকার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই গলায় কমনীয়তা এনে বলেন, 'একটু চা কর তো বোন। সারা বিকেল ছোটন দিতে দিতে গলাটা বসে গেছে।'

রান্নাঘরে চা করতে ঢুকে মেয়েদের হাসির ফোয়ারা কানে আসে। সীমান্তির প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে যায়। রামের মৃত্যুর পর একদিনও মনে পড়ে না, কেন সে দুই মেয়েকে নিয়ে হাসি মস্করায় মেতেছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সীমান্তি রেণুকার হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে বসেন।

— ক দিন ধরেই কথাটা তোকে বলব বলব ভাবছি। জানি না কি ভাবে নিবি তুই। সীমান্তির গলা নিচু।

— বলুন। রেণুকার স্তিমিত কণ্ঠ।

— তুই আবার বিয়ে কর রেণু। তোর অল্প বয়েস। শরীরে যৌবন। সারাজীবন বঞ্চিত হয়ে থাকবি? তোর নিজের বলতে কে আছে বল?

— কিন্তু

— কোন কিন্তু নয়। যে গেছে তাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অল্পবয়সী মেয়ে দুটোরও একজন গার্জেন দরকার।

— মৌ, ফুল বড় হয়ে যদি _

— ওদের এখনও বোঝার বয়স হয়নি। আর ওদের চেনাজানার মধ্যেই কেউ যদি

— মানে? রেণুকার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

— লক্ষ্মণকে বিয়ে কর তুই। তাতে ঘর সংসার, মেয়েদের ভবিষ্যৎ- সব দিক থেকেই ভালো হবে।

— না-না, তা হয় না, তা হয় না — প্রতিবাদ করে রেণুকা। স্বরগ্রাম হঠাৎ উঁচুতে উঠে যায়।

সীমান্তি অবাক। রেণুকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

— ঠিক আছে তুই যা ভালো বুঝিস — বলে চুপ হয়ে যান।

রাত গভীর। মেয়েরা ঘুমে বিভোর। রেণুকার চোখে ঘুম নেই। সারা শরীরে জ্বালা। সীমান্তির কথাগুলো, সমাজ, লোকনিন্দা, মেয়েদের ভবিষ্যৎ ব্যবসার ভালোমন্দ ...। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চায়। না, কোন পথ নেই। কষ্ট কষ্ট, ভীষণ কষ্ট ...

দরজা খুলে বাথরুমে ঢোকে রেণুকা। ঘাড়ে মাথায় ঠান্ডা জল ঢালে। চোখে মুখে জল দেয়।

বাথরুম থেকে ঘরে ঢোকার মুখে রেণুকা থমকে দাঁড়ায়, সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ।

— বৌদি।

রেণুকা এই প্রথম ভয় পায় না, বিচলিত হয় না। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা।

— তুমি আমাকে ভালোবাসো ঠাকুরপো?

— কেন, তুমি কি বোঝ না? তোমার জন্য আমি ... উৎসাহে গলা কেঁপে ওঠে লক্ষ্মণের।

— আমিও তোমায় ভালোবাসবো, দেহ-মন উজাড় করে দেবো, তবে একটি শর্তে?

— বলো, আমি এক্ষুণি রাজি।

— আমায় বিয়ে করতে হবে। রেণুকার অকম্পিত কণ্ঠ।

— বিয়ে? কাটা বেলুনের মতো চুপসে যায় লক্ষ্মণ। কি করে সম্ভব! তোমার মেয়েরা আছে। মা বেঁচে আছে। এছাড়া আত্মীয় স্বজনে পাড়া-পড়শি ...

— ভালোবাসার জন্য কিছু তো ছাড়তে হয়। আমার জন্য তোমার দাদা সবাইকে ছেড়ে চলে এসেছিল এ বাড়ীতে।

— অন্য কোন শর্ত দাও বৌদি। এ তো তোমার আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীর মত থাকবো আমরা। কেউ জানতে পারবে না। লক্ষ্মণ অনুনয় করে।

— আমি বাজারের মেয়ে নই ঠাকুরপো। যদি বিয়ে করতে না পারো বাড়ির মধ্যে নোংরামির খেলায় মেতো না — রেণুকা ফুঁসে ওঠে।

— ভয় দেখাচ্ছো? লক্ষ্মণের চোখে ক্রোধের ঝিলিক।

— সে তুমি যা ভাবো। আমি সাবধান করে দিলাম। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেয় রেণুকা।

লক্ষ্মণ ব্যবসায় ঢিল দেয়। ঠিকমত হাটে যায় না। মাল আনতে বড়-বাজার যায় না। মুরগির মেয়েরা কাজ না পেয়ে ফিরে যায়।

রেণুকা কি করবে ভেবে পায় না। সীমান্তিকে সব খুলে বলে। লক্ষ্মণকে ডেকে কথা বলেছে সীমান্তি। অনেক বুঝিয়েছে, লক্ষ্মণ সাড়া দেয়নি। সংসারে অভাবের দৈত্যটা উঁকি মারতেই দেরি করে না রেণুকা, ছুটে যায় সুনন্দ বোসের কাছে। সব জানিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

রেণুকার কান্না দেখে সুনন্দ বিচলিত।

— ভাবছেন কেন? মনে সাহস আনুন।

— কি করে আনবো দাদা। আমার যে কেউ নেই। আমি যে একেবারে একা।

— কে বলল আপনি একা? আর কেউ না থাকুক আমি আপনার পাশে আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো। কথাটা এভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে সুনন্দ স্মিত বোধ করে।

রেণুকার চকিত চাহনি সুনন্দর চোখে। মুগ্ধ চোখের ভাষায় সমর্পণের আকুল আকিলতা। সেই অবোধ আকর্ষণে আকর্ণবাসী সুনন্দর চোখেও অস্থির চঞ্চলতা।

— আপনাকে আমি ভুলবো না। আপনার জন্যই বোধ হয় এ জীবনে ... রেণুকার কম্পিত কণ্ঠ।

— না না এভাবে বলবেন না। আপনার সমূহ বিপদ। বিপদের পাশে দাঁড়ানোই তো আমাদের কর্তব্য, আমাদের পার্টির-শিক্ষা। রেণুকা মাথা নিচু করে শোনে। মনের মধ্যে তীব্র আলোড়ন। কিছু না-বলা কথা বলতে ইচ্ছে হয় সুনন্দদাকে। বলা আর হয়ে ওঠে না।

— আপনি নিশ্চিন্তে ঘরে যান। পার্টি অফিস থেকে ফেরার পথে দুটো ছেলেকে নিয়ে আপনার বাড়ি যাব। ব্যবসা আবার চালু হবে। সুনন্দর হস্তক্ষেপে রেণুকার সংসার আবার প্রাণ ফিরে পায়। ব্যবসা পুরোদমে চলতে থাকে। লক্ষ্মণকে সব দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

রেণুকার উপর কাজের অতিরিক্ত চাপ, দিনের মধ্যে দু তিনবার বাইরে বেরোতে হয়। রেশন-বাজার, কেনাকাটা, ব্যবসা দেখা। কাজ করতে করতেই নিজের ওপর আস্থা বাড়ে, সাহস বাড়ে।

তবু অস্বস্তিটা যায় না। পথেঘাটে হাটে বাজারে শরীরে বিঁধে থাকে পুরুষের কামার্ত নিঃশ্বাস। সে সুন্দরী, তার ওপর বিধবা-বেওয়ারিশ মাল। চারপাশে পুরুষদের সন্দেহজনক লালসার নীচে নিজেকে অসহায় শিকার বলে মনে হয়।

এত মানুষজনের মধ্যে মাত্র একজনকেই অন্যরকম লাগে। সংসার-সন্ন্যাসী এই আত্মভোলা মানুষটার কথা ভাবলে কেমন বিবশ হয়ে পড়ে রেণুকা। সারাদিন পার্টির কাজে ডুবে আছে। এই সেদিন বাজারের রাস্তায় সুনন্দদার মায়ের সঙ্গে দেখা। মাসিমা দুঃখ করছিল, 'ছেলেটাকে বিয়ে আ দিয়ে সংসারী করে না গেলে মরেও যে শান্তি পাবো না মা।'

রেণুকা মাঝে মাঝে ভাবে গোপন ইচ্ছের কথাটা সীমাদিকে বলে। একই পার্টির লোক। কতদিন লাল কাজ নিয়ে একসঙ্গে মিছিল করে গেছে পাড়ার রাস্তা দিয়ে। সীমাদিই পারে সুলতাদার কাছে কথাটা পৌঁছে দিতে। কিন্তু বলা আর হয়ে ওঠেনি।

মনে পড়তেই কর্তব্যনতী হয় মৌটুসির। রেণুকার ভেতরে ঘুঙ্ক, এবারে নারী অঙ্গের বিকাশ ঘটবে। মৌটুসির পেছনে দাঁড়িয়ে ফুলটুসি। বাবা মার রক্তরূপ সার্থকভাবে ফুটেছে দুজনের শরীরে। ফুটবে নাই বা কেন। গ্রাম আর রেণুকার পবিত্র কামনার ফসল যে ওরা।

সেদিন সন্ধ্যায় টুকিটাকি কিছু কিনতে স্টেশনের কাছে গিয়েছিল রেণুকা। ফেরার পথে দাঁড়িয়ে পড়ে নবীন সংঘের মাঠের ধারে। ফ্লাড লাইটের আলোয় ক্যারাটে শিখছে এক ঝাঁক মেয়ে। দশ থেকে বড়জোর কুড়ি বছরের মধ্যে সবাই। চোখের পলকে হাত পা চালাচ্ছে মেয়েগুলো। লাথি খেয়ে মাটিতে আছড় খেয়ে পড়ছে, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। পরনে সাদা টিলে জামা-প্যান্ট, কোমরে বেল্ট, চুলে লাল রিবন। মুখ দিয়ে কেমন শব্দ করছে মেয়েগুলো? প্রায় একঘণ্টা দাঁড়িয়ে ক্যারাটে খেলা দেখে রেণুকা। মনের ভেতর আলোড়ন।

পরের মাসেই দুই মেয়েকে নবীন সংঘের ক্যারাটে কোর্সে ভর্তি করে দেয় রেণুকা।

মৌটুসি একটু আপত্তি করেছিল, 'আমরা মারপিট শিখবো কেন মা, ভীষণ ভয় করে আমার।'

— প্রথম প্রথম করবে। তারপর আর করবে না। এটাই তোদের বাঁচার পথ মা। বড় হলে বুঝবি। দুই মেয়েকে বুকে চেপে রেণুকা বলেছিল।

মায়ের দুঃখ বুঝবার বয়স হয়েছে মৌটুসির। রেণুকার গলা জড়িয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে মা, তুমি একটুও ভেবো না, আমরা শিগগির বড় হয়ে যাবো।'

লক্ষ্মণ রেণুকার সংসারেই আছে। বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ থেকে চিঠি এসেছে। লক্ষ্মণ যায়নি। রেণুকার সঙ্গে অসভ্যতাও করেনি। রেণুকাও ভাই বলে ডাকতে বলেনি। হাজার হোক স্বামীর আপন ছোট ভাই।

ঘরে বাইরে কাজ করতে করতে রেণুকাও অনেক পাল্টেছে। আগের সেই জড়তা, দ্বিধা থেকে অনেকটাই মুক্ত। ভদ্রবেশী শয়তান পুরুষদের সে এখন সহজেই চিনতে পারে। যার জন্য অতিরিক্ত আর সুকুমার বৃত্তির ছদ্মবেশী মানুষগুলো তার কাছে আর ঘেঁষতে সাহস পায় না। তা সত্ত্বেও একটা অদৃশ্য নিরাপত্তাহীনতার ভাঁতি তাকে সবসময়ই ঘিরে থাকে। সে তো একজন নারী! পুরো সমাজটাই যে পুরুষশাসিত, পুরুষচালিত। নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা সেখানে কোথায়!

সেদিন বিকেল থাকতে রেণুকা বাইরে বেরোয় অনেকগুলো কাজ নিয়ে। পাড়া থেকে বড় রাস্তায় পড়তেই সীমাদির সঙ্গে দেখা। সীমাদি তাকে টানতে টানতে নিয়ে যান স্টেশনের পেছনে মহিলা সমিতির অফিসে। আসলে সেটা পার্টি অফিস। একটা ঘর মহিলা সমিতির জন্য। সীমাদির মাধ্যমেই পরিচয় হয় মহিলা কর্মীদের সঙ্গে, রেণুকার ভীষণ ভালো লাগে। এ যে সম্পূর্ণ অন্য জগৎ, কত কাজ, কত কর্মসূচি!

— আমাদেরও তোমাদের একজন করে নাও দিদি। রেণুকা উৎসাহিত।

— একজন তো তুই হয়েই আছিস। বাচ্চা বাচ্চা তোর থেকে চাঁদা নিই না?

— আমি কাজ করতে চাই তোমাদের মতন। রেণুকার দীপ্ত কণ্ঠে সীমা শিহরিত।

— কিন্তু তোর সংসার, দুই মেয়ে, ব্যবসা

— সে সব করেই বাকি সময়টা তোমাদের সঙ্গে থাকবো, আমি যে একেবারে বন্দী হয়ে আছি! রেণুকার চোখে জল।

— কে কাকে বন্দী? তোর চোখে যে আগুনের ঝলক দেখলাম, তুই পারবি বোন, তুই-ই পারবি _ সীমালি বুকে টেনে নেন রেণুকাকে। পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে বেশকাটা সারতে রাত হয়। রেণুকা দ্রুত পা চালায় বাড়ির দিকে।

দরজার কড়া নাড়তেই কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৌটুসি। রেণুকা বিমূঢ় হতবাক। একটু ধাতস্থ হয়ে মেয়েকে একান্তে ডেকে জানতে চায় কান্নার কারণ।

লজ্জা রাঙা হয়ে মৌটুসি বলে তার ওপর কাকার অসভ্যতার কথা। রেণুকার রক্তে যেন একশ ভোল্ট ছলে ওঠে। দরজার কোণ থেকে সব্জি কাটার বাঁটি হাতে ঢুকে ঘর কাঁপানো ঘরে।

শপাং শপাং বাঁটার বাড়ি পড়ে লক্ষ্মণের ওপর। কয়েকটা বাড়ি খেয়েই ছিটকে সরে যায় লক্ষ্মণ। চৌকিতে লাফিয়ে উঠে ধরে নেয় রেণুকার বাঁটাশুদ্ধ হাত। তারপর রেণুকাকে মেঝেতে ফেলে কেলতে চায়। শক্ত সমর্থ লক্ষ্মণের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে মরিয়া প্রতিরোধ করে রেণুকা। কিন্তু এ যে অসম লড়াই!

লক্ষ্মণ চেপে বসেছে রেণুকার বুকে। দু'হাতে চেপে ধরেছে রেণুকার হাত।

হঠাৎ বিকট চিৎকার করে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে লক্ষ্মণ। কাটাপাঁঠার মত ছটফটায়।

রেণুকার স্তম্ভিত চোখের সামনে দরজার খিল হাতে ব্যাঘ্রীর ভঙ্গি -মার দাঁড়িয়ে মৌটুসি। পেছনে ফুলটুসি। খেলনা ক্রিকেট ব্যাটটা বাগিয়ে ধরা দু'হাতে।

কাপসা কুয়াশার অন্ধকার সরিয়ে রেণুকার চোখে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দেয়ালে ঝোলানো রামের মুখ। ঠোঁটের কোণে সেই মুক্ত হাসি। যেন বলে, 'ভয় কি রেণু, ভয় কি!' ❑

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণে যা করেছে, তা একটা দৃষ্টান্ত "

—ইউ এন পভার্টি রিপোর্ট, ২০০০

ত্যালাড়ু সমবায় সেচ ও কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং ৬০, তাং ২৬/১২/৯৩
গ্রাম ও পোঃ ত্যালাড়ু, জেলা - হুগলি
দূরভাষ : ৬৮৪-৯৪৩৯

সুলভে মিনি ডিপটিউবওয়েলে চাষের জল, ন্যায্য মূল্যে সার, কীটনাশক ও বীজ সরবরাহ, স্বল্প সুদে কৃষিঋণ, সহজে সঞ্চয়ের বিভিন্ন সুযোগ, দরিদ্রের উন্নয়নে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও সামাজিক পরিষেবার ব্যবস্থা আছে।

প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

ডা. বিমলকুমার সরকার
সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ
ম্যানেজার

অসীমকুমার মণ্ডল
সহ-ম্যানেজার

শারদ শুভেচ্ছা সহ —

জগৎবল্লভপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং - ১৪
তাং ১৩/১১/৭৫
জগৎবল্লভপুর
হাওড়া

With
Best
Compliments
of :

MSTC Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

Regd. Office :
225-F, A. J. C. Bose Road
Calcutta - 700 020

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই —

সাঁপাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ - সাঁপাড়
বর্ধমান সদর ১নং ব্লক, বর্ধমান

উল্লাসকর চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

রবীন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক

GHATAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

P.O. : GHATAL ● DIST. MIDNAPORE
PIN - 721212
PHONE : CHAIRMAN 55-101, C.E.O. 55-202

ঘাটাল মহকুমার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দাদনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান

ঘাটাল কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

ঘাটাল ● মেদিনীপুর (শাখা : ক্ষীরপাই)
ফোন : ৫৫-১০১ / ৫৫-২০২

- সমস্ত প্রকার দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ঋণ দাদন।
- মহকুমায় নতুন পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ দাদন।
- ডি সি এম, টাটা ৪০৭ / ৬০৯ ও ক্যান্টার সহ শস্য পরিবহণের ও যাত্রীবাহী সমস্ত রকমের গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয়।
- অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় ১% বেশি সুদে আমানত সংগ্রহ করা হয়।
- এন.এস.সি / কিষান বিকাশ পত্র / ক্যাশ সার্টিফিকেট আবদ্ধ রেখে ঋণ দেওয়া হয়।
- সার্ভিস সিকিউরিটি রেখে বাড়ি মেরামত / মোটর সাইকেল / স্কুটার / টিভি / ভি সি পি / ভি সি আর কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হয়।
- ক্যাশ ক্রেডিট লোন চালু হইয়াছে।

জগন্নাথ গোস্বামী
সভাপতি

মহম্মদ মহসীন
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

সমুদ্র সৈকত পুরী ও দীঘায়

ভ্রমণ আনন্দ উপভোগ করতে

সমুদ্রের কাছে মনোরম পরিবেশে রান্নার সরঞ্জাম ও

আসবাবপত্রে সুসজ্জিত আমাদের

'হলিডে হোম'

জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ।

বুকিং ও আরো জানতে যোগাযোগ করুন :-

দি ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ্

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

১৫, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২২০ ৩৪৫১

(এক্সটেনশন - ২৯৪/২৯৫/২৯৬)

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর জনসেবায় নিয়োজিত —

হাটখুবা এস কে ইউ এস লি.

রেজি. নং - ৪৫৫ তারিখ - ২১/৪/৬০

গ্রাম ও পোঃ - হাটখুবা

উত্তর ২৪ পরগনা

স্বল্প সুদে কৃষিঋণ, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা তৎসহ সার,
বস্ত্র, অফিস স্টেশনারি সরবরাহ ইত্যাদি
ব্যবসা চালু আছে।

সলিলকুমার মুখার্জি — *সভাপতি*

নীলরতন বালা — *সম্পাদক*

দুলাল গুহ — *সহ-সভাপতি*

বিদ্যুৎকুমার মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন।
'সমবায়িকা' হইতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করুন।

বারাসাত হোলসেল কনজিউমার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

স্টেশন রোড, বারাসাত

উঃ ২৪ পরগনা

ফোন নং ঃ ৫৫২-৩৭২৫

জনমুখী সমবায়

জনমুখী কল্যাণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দুর্বার
গতিতে এগিয়ে চলেছে —

আমাদপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

আমাদপুর, ফোন : ২৫-২৬৫

শাখা অফিস :

মেমারি

নিউমার্কেট, মেমারি

বর্ধমান - ফোন : ২৫-৮৯৬

বর্ধমান

ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স , ফোন : ৫০২৭৮

জি টি রোড, বর্ধমান

বিশেষ সুবিধা : এখানে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক পরিষেবার চেয়ে ১/২ শতাংশ সুদ বেশি। এছাড়াও স্বল্প জমার জন্যও সুযোগ।

মহাদেবপ্রসাদ চন্দ্র — *সভাপতি*

গৌরপদ দে — *সম্পাদক*

ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতি

ইলামবাজার, বীরভূম

যদিও আকাশে কালো মেঘ, বজ্র নির্ঘোষ বিদ্যুৎকন্যা। তবুও টিউলিপ পাতা নিয়ে শ্বেত কপোত উড়ে যায় উপেক্ষিত ভরে। শত শত বরাভয় উত্থিত হয় কালো প্রেক্ষাপটে তীক্ষ্ণ ফলার মতো। হাতে হাত রেখে পক্ষ কাটাকুটির ঊর্ধ্বে উঠি তবুও আমরা।

অশোককুমার দাস
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
ইলামবাজার, বীরভূম

মোঃ রোকেয়া খাতুন
সভাপতি
ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতি
ইলামবাজার, বীরভূম

পুরী, দার্জিলিং, দীঘা, গ্যাংটক ও হরিদ্বারে
আমাদের ঘরোয়া এবং নির্ঝঞ্ঝাট
হলিডে হোমের
সুযোগ নিন।

যোগাযোগের ঠিকানা

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

পি-৩৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলিকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : (০৩৩) ২২৫-৪০৫৫/৫৬/৫৮

∬ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান যখন অবলুপ্তির পথে, বহুজাতিক, যৌথ বা ব্যক্তি মালিকানা যখন জন-কল্যাণে ব্রতী হওয়ার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তখন একমাত্র সমবায়ই পারে সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় বিকল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে ∬

- সমবায়ের সদস্য হোন ।।
- সমবায়ের অগ্রগতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন ।।
- সমবায়ের সবচেয়ে বড় বন্ধু হোন ।।

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড,

৮, শ্রীধর চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,

উত্তরপাড়া, হুগলী।

ফোন : ০৩৪-২৫৪৮ : ০৩৪-২৪১০

আমাদের শাখা সমূহ : পাঁচা, পুরী, দার্জিলিং, গ্যাংটক ও আগরতলা।

রঙ্গকৌতুক

একটি বাংরেজি চিঠি

বাসুদেব মুখার্জি

২১, লেক রোড, চতুর্থ তল,
কলিকাতা - ৭০০ ০২৬
৩-২-২০০০

প্রিয় অমল,

অনেকদিন পত্রে তোকে চিঠি লিখছি। আমি জানতাম তুই মালদাতেই আছিস — তুই যে 'ট্রান্সফার' নিয়ে বর্ধমানে বদলি হয়ে এসেছিস জানতাম না। সেদিন হঠাৎ 'অ্যাম্বিডেক্টালি' তোর দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বলেই তোর খবরাখবর পেলাম। অনন্তজনে 'বাই দ্য বাই' বলে রাখি আমরাও পুরনো ভাড়া-বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন লেক রোডে ঠিক 'ইউ বি আই' ব্যাঙ্কের পাশে একটা 'ফ্লাট' বাড়ি কিনেছি। ঠিকানা তো লিখেছি, বাড়িটা চিনতে তোর কোন অসুবিধা হবে না। একটা রবিবার দেখে চলে আয় — একসাথে 'কন্টিনিউয়াসলি' গুপ্ত আড্ডা মারব।

তোর দাদা বলেছিলেন বন্ধু-বান্ধবদের সকলের খবর জানিয়ে চিঠি দিতে। আমার সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে তাদের সকলের খবর 'ওভার-বাই ওয়ান' তোকে পরপর লিখছি। ওরতে আমার খবর দিয়েই স্টার্ট করি। আমি এখন [illegible] আছি তবে থাকি না। বাড়ি থেকে রোজ 'ডেইলি' প্যাসেঞ্জারি করি। যাতায়াতের কষ্টটা বুঝতে পারছিস? দূরত্ব তো কম নয় — বোজ রোজ 'আপ-ডাউন' বাড়তাম পর্যন্ত 'ডেইলি' প্যাসেঞ্জারি করা কি মুখের কথা? তবে আমি একা নই — অনেক মিলে দল বেঁধে যাই। আমাদের দলে পি ডব্লিউ ডি ডিপার্টমেন্টের একটা ছেলে আছে। সে খুব মজার মজার 'ইন্টারেস্টিং' গল্প বলে। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে যাতায়াত করি বলে সময়টা কোনওরকমে 'এনিহাউ' কেটে যায় — এই আর কি। আমার একটা খবর দিই — শুনলে তোর হয়তো ভাল লাগবে। আজ আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক 'আনুয়াল জেনারেল মিটিং' ছিল। আমি সেক্রেটারি হিসাবে আবার 'রি-ইলেক্টেড' হয়েছি।

তোর সুভাষকে মনে আছে? গত রবিবার ওর দিদির বিয়ে হল। আমরা (ক্লাবের কয়েকজন বন্ধু) গিয়েছিলাম খুব ভাল বিয়ে হয়েছে — পাত্র খুবই ভাল। খাইয়েছে দারুণ ভাল — প্রত্যেকটা 'আইটেম' বারবার 'রিপিট' করেছে। কোন 'ক্যাটারার' যে এত ভাল [illegible] কেমন করে তা জানতাম না। উপহার হিসাবে আমরা একটা কানের 'ইয়ারিং প্রেজেন্ট' করলাম।

এবার ঘনি গৌতমের কথা। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে গৌতমই বোধহয় এখন সবচেয়ে বড়লোক। এই বয়সে, এখনই ও ৪/৫খানা 'পাবলিক বাস'-এর মালিক। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় থাকে বলে আমি কখনও 'ওভারব্রিজ'-এর ওপর দিয়ে যাই না — অফিস সময়ে সাবওয়ের নীচ দিয়ে যাতায়াত করি। সেদিন নিয়ালদার 'সাবওয়ের নীচ দিয়ে 'টুওয়ার্ডস' স্টেশনের দিকে যখন যাচ্ছি তখন গৌতম আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকল — সব কথা বলল। তবে একটা কথা কি জানিস, ছেলেটার এতটুকু সাধারণ 'কমন সেন্স' নেই। সারাক্ষণ [illegible] নিজের কথাই বলে গেল — একবারও আমার কথা জিজ্ঞাসা করল না।

আচ্ছা, তোর বিকাশের কথা মনে পড়ে? জানিস তো, বিকাশ এখন একদম বিছানায় 'বেডরিডেন' হয়ে পড়ে আছে। ও বাসে চেপে অফিস যাচ্ছিল, বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেই সময় হঠাৎ 'কন্ট্রাকটর'-এর 'জিপিও পোস্ট অফিস' হাঁক শুনে হড়মড়িয়ে উঠে চলন্ত বাস থেকে 'রানিং'-এ নামতে গিয়ে পা ফেঁসে গেছে। অসীমের অবস্থাও প্রায় একই। কোরি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল বাস ধরার জন্য। এমন সময় একটা মারুতি পিছন দিকে 'ব্যাক' করার সময় ওকে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। অসীমেরও পায়ের হাড় ভেঙে 'ফ্র্যাকচার' হয়ে গেছে। তবু ওদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। 'ইন কেস' যদি ঐ সময়ে আর একটা গাড়ি এসে যেত, তাহলে কি হত বল তো?

শোন, এবার তোকে একটা বিশেষ কথা বলি। এবার পূজায় আমি, রমেন আর শ্যামল নুরুটমলিপুর-জিলিমিলি বেড়াতে যাব বলে ঠিক করেছি, ২/৩ দিন থাকব। ওখানে 'বিডিও' অফিসের পাশেই বন দপ্তরের একটা 'ফরেস্ট বাংলো' আছে — সেখানেই থাকব। তোকে কিছুই করতে হবে না, শ্যামলের দাদা থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থাই 'অ্যারেঞ্জ' করে রেখে — তুই শুধু চল আমাদের সঙ্গে। একটাই ব্যাপার, আগাম 'অ্যাডভান্স' টাকা জমা দিয়ে 'বুকিং' করতে হয়। কিন্তু সুবিধা কি জানিস? 'সাপোজ', ওর টাকা জমা দিয়েও তুই যেতে পারলি না। তিনদিন আগেও তুই যদি জানাতে পারিস তাহলে টাকাটা মার যাবে না। ওরা শতকরা 'টেন পার্সেন্ট' টাকা কেটে বাকি 'ব্যালান্স' টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। আমার দাদা-বৌদি গত বছর ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল (শ্যামলের দাদাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল)। ওদের কাছে শুনেছি জায়গাটা 'এক্সেলেন্ট', খুব সুন্দর। লেকের ধারে সকালে 'মর্নিং ওয়াক' আর সন্ধ্যায় নৌকোয় চেপে 'বোটিং' করতে নাকি দারুণ ভাল লাগে। আমরা যাবই, তুইও চল আমাদের সঙ্গে। পূজোর তো আর দেরি নেই। তাই এখনই 'ইমিডিয়েটলি' ওর 'বুক' করা দরকার। তুই গেলে চারজন হলেও একটা 'ফোর-বেড রুম' নিতে বলব। 'মানিঅর্ডার' করে টাকা পাঠাতে হবে না। তুই ঘাবড়িস এই পাকা খবরটা শুধু 'কনফার্ম' কর। সবচেয়ে 'বেস্ট' হয় তুই যদি একটা 'টেলিফোন' করতে পারিস। (বাড়ির টেলিফোন নং ৩৪৫-৬৭৮৯)। তোর 'টেলিফোন'-এর অপেক্ষায় 'ওয়েট' করতে থাকব। যেভাবে হোক 'এনি হাউ' তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করিস। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিস।

ইতি,
বিমল।

সমবায় শোষিত নিপীড়িত মানুষের রুটি-রুজির সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠুক। সমতা, একতা, সততার ভিত্তিতে গড়ে উঠুক সমবায় আন্দোলন।

বহরমপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

১৭১/এ, বি বি সেন রোড
পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ব্রজগোপাল মণ্ডল
চেয়ারম্যান

সমীরবরণ দত্ত
সেক্রেটারি

- নিজস্ব হিমঘরে চাষিদের আলু সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আছে।
- সার বিক্রয় কেন্দ্র আছে।
- ন্যায্য দামে চাষিদের কাছ হতে পাট ও অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয় করে থাকে।
- সঞ্চয় প্রকল্পের ২টি শাখা আছে।
- যার মাধ্যমে সমবায়ের সুফল চাষিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।
- ৩৩টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে এলাকার মহিলা ও পুরুষ গোষ্ঠীকে ঋণ দান দেওয়া হচ্ছে।

অজয় সরকার
সভাপতি

তড়িৎ ব্রহ্মচারী
সহ-সভাপতি

জগবন্ধু সরকার
ব্যবস্থাপক অধিকর্তা

বহরমপুর সি এ ডি পি এফ এস সি এস লি.

গ্রাম : ভাকুড়ি
পোঃ চালতিয়া
জেলা : মুর্শিদাবাদ

সমবায় দেশকে স্বয়ম্ভর করতে পারে —

বেলডাঙ্গা ব্লক - ১ কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লি.

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৬৪০৮৮

সমিতির একটি শাখা —

বেলডাঙ্গা কো-অপারেটিভ ফিলিং স্টেশন

(ডিলার : হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লি.)

ভাবতা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ৩২২৭০

চন্দনবাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

সাং - চন্দনবাটি, পোঃ আহেরিপাড়া
জেলা - মুর্শিদাবাদ

রেজি. নং - ১১

এখানে সকল প্রকার রাসায়নিক সার পাওয়া যায়

নন-কন্ট্রোল কাপড় বিক্রয় করা হয়

মিনি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করা হয়

দেবমাল্য মজুমদার
সদস্য

মোস্তাফা কামাল
কনভেনার

অতনু দত্ত
সভাপতি

মাইনুদ্দিন দেওয়ান
ম্যানেজার

দি নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেটলমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রেজিঃ নং - ২২৮/৭৬

ফোন নং : ৫৬০৫৯

১৯৯৭-৯৮ সালে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কর্মচারী ঋণদান সমিতি হিসাবে পুরস্কৃত এবং জেলার একক বৃহত্তম সমবায় সমিতি হিসাবে জেলার সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

১৯৯৮-৯৯ সালের সমিতির আর্থিক চিত্র :-

● Paid up Share	Rs.	23,35,760.00
● Member Deposit	Rs.	98,84,732.00
● Member Welfare fund	Rs.	1,55,112.00
● Loan due by member	Rs.	1,69,39,720.00
● Net Profit	Rs.	6,83,163.65

রজতজয়ন্তী বর্ষে গৃহীত কর্মসূচী

- ১০.১২.২০০০ তারিখে কৃষ্ণনগর জেলা স্টেডিয়ামে সদস্য ও সদস্যা এবং তাদের পরিবারবর্গদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা।
- ১৫ই ডিসেম্বর, ২০০০ রক্তদান শিবির ও সাধারণ সভা।
- ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০০ অঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, গান প্রতিযোগিতা, শঙ্খ বাদন প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যায় কবিতার আসর এবং নাটক।
- ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০০ প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ। সমস্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী। সদস্যদের পুত্র কন্যাদের যারা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে ৬০০ নম্বরের বেশি পেয়েছে তাদের পুরস্কার প্রদান। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শ্রুতিনাটক।

জিয়াউল হক	**এস কে চন্দ**	**জহরলাল সাহা**
সভাপতি	*সহ-সভাপতি*	*সম্পাদক*

এলাকার ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক এবং দারিদ্র্যসীমার নিম্নে বসবাসকারী জনগণের সেবায় একমাত্র নির্ভরযোগ্য সমবায় সমিতি —

সাগরদীঘি থানা এগ্রি. মার্কেটিং কো-অপঃ সোসাইটি লি.

রেজি. নং - ৮৪ :: তাং - ২৫/৪/৭৫
পোঃ সাগরদীঘি
জেলা - মুর্শিদাবাদ

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

JAYCHANDRAPUR SKUS Ltd.

Vill+P.O. : Nabagram
Dist. : Murshidabad

হরহরি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

(মিনি ব্যাঙ্ক)

রেজি. নং - ১০২ তাং : ৯/২/৬৭

ফোন নং : ৬৮-১৬৬
গ্রাম ও পোস্ট - হরহরি
জেলা - মুর্শিদাবাদ

কৃষকদের চাষের জন্য স্বল্প মেয়াদি ঋণদান ও চাষের উপযোগী সার ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এখানে সভ্যগণকে মিনি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পিতল, কাঁসা ও শস্য বন্ধকি ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অ-কৃষি ঋণ দাদন করা হয়। চেক ভাঙানোর সু-ব্যবস্থা আছে।

এই মিনি ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রেখে অধিক মুনাফা লাভ করুন। আপনার আমানত সম্পূর্ণ গোপনীয় ও বিমা দ্বারা সুরক্ষিত।

মহঃ গোলাম সাদেক	শাজাহান সেখ	সেখ ফরিদউদ্দিন
সেক্রেটারি	সভাপতি	ম্যানেজার

ব্যাঙ্কিং শাখা, সার, কীটনাশক, ঔষধ, কাপড় ব্যবসা, পিতল, কাঁসা ও সার্টিফিকেট মর্টগেজ রাখিয়া ঋণ দাদন। স্বল্প মেয়াদি ও মধ্যম মেয়াদি ঋণ দাদন করা হয়।

কাইতি উত্তরপুর চকড়ুরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ কাইতি
জেলা - বর্ধমান
রায়না ২ নং ব্লক

With Best Compliments From :

EASTEAN & NORTH-EAST FRONTIER RAILWAY CO-OPERATIVE BANK LIMITED

34-A&B, SASHI BHUSAN DEY STREET, CALCUTTA - 700 012

Telegram Enercopr
Fax 225-7068

Phone 237-4733
225-2906

- ☆ A premier Railway Urban Co-operative Bank functioning under Banking Regulation Act.
- ☆ Provides Banking facilities for Members and general public also.
- ☆ All Deposits covered under Deposit Insurance Act.
- ☆ We have Branches at Eastern Railway, Sealdah Main Station, 1st Floor near Reservation Counter and Kanchrapara Railway Workshops.
- ☆ We have Camp Offices at Maligaon, Alipurduar Jn., Katihar, Tinsukia & Lumding of N. F. Railway Zone.
- ☆ We are functioning as a full-fledged Banking Institution and are accepting the following Deposits :

1. Savings Bank 2. Fixed/Term Deposit 3. Recurring Deposit 4. Monthly Savings Scheme 5. Monthly Income Scheme	The rate of interest is 0.5% more than the Rate of Interest paid by Nationalised and Scheduled Banks as regulated by RBI from time to time.

CHIEF EXECUTIVE

স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা

[SGSY]

গ্রাম বাংলার দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সৃষ্টি করতে আর এক ধাপ নতুন পদক্ষেপ : প্রচলিত গ্রামোন্নয়নের আই আর ডি পি ট্রাইসেম, ডোকরা, গঙ্গা কল্যাণ যোজনা, মিলিয়ন ওয়েলস, ইত্যাদি প্রকল্পের একীভূত রূপ — ১৯৯৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সারা ভারতের ন্যায় আমাদের জেলাতেও চালু হয়েছে — 'স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' (SGSY)।

(ক) ব্যক্তি প্রকল্পের পরিবর্তে গুচ্ছ প্রকল্প

(খ) ৫০ শতাংশ মহিলা, ৪০ শতাংশ তপসিলি জাতি ও উপজাতি এবং ৩ শতাংশ অসহায়ী মানুষদের অগ্রাধিকার।

(গ) (আবর্তনী তহবিল ১০,০০০/- এবং ব্যাঙ্ক ক্যাশ ক্রেডিট ১৫,০০০/-) মোট ২৫,০০০/- পর্যন্ত আবর্তন তহবিল এবং ব্যাঙ্ক ঋণের ৫০ শতাংশ (সর্বোচ্চ ১,২৫,০০০/- পর্যন্ত) অনুদান দেবার ব্যবস্থা এবং অর্থকরী প্রয়াসে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

এ পর্যন্ত এই জেলায় পুরোনো ডোকরা গ্রুপ সহ ১০০টি গ্রুপ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এবং ২১টি ক্লাবকে ২.১০ লক্ষ টাকা আবর্তনী তহবিল দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

প্রকল্প অধিকর্তা
জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন শাখা
'উন্নয়ন ভবন'
জলপাইগুড়ি

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও এয়ার ইন্ডিয়া কর্মচারীদের সেবায়

এবং

সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনের প্রসারে নিয়োজিত

এয়ার কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

এন টি এ, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কমপ্লেক্স
কলকাতা - ৭০০ ০৫২
ফোন নং - ৫১১-৯৭২১ (এক্স : ৩২৭৮)

আমাদের দীঘা হলিডে হোমের জন্য উপরোক্ত অফিস এবং
এয়ারলাইন্স হাউসের চতুর্থ তলে সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মৃন্ময় সাহা
সভাপতি

কিরিট সেনগুপ্ত
সম্পাদক

খুশির খেয়াল (সমাধান)

সমাধান - ১

সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী সমস্যা

দার্শনিক একটি রাস্তার দিকে আঙুল দেখিয়ে এই প্রশ্ন করেছেন : "আমি যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি এই রাস্তা ওই গ্রামের দিকে গিয়েছে কি না, তুমি কি হ্যাঁ বলবে?" এই প্রশ্ন করলে ওই লোকটি যদি সত্যবাদী হয় এবং রাস্তাটি যদি গ্রামের দিকে গিয়ে থাকে, তা হলে সে এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বলবে। আবার যদি লোকটি মিথ্যাবাদী হয় এবং রাস্তাটি যদি গ্রামের দিকেই গিয়ে থাকে, তা হলেও সে এ-প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ-ই বলবে। কারণ, রাস্তা যদি গ্রামের দিকেই যায়, তা-হলে মিথ্যাবাদীকে যদি এ-কথা জিজ্ঞাসা করা হয় 'এই রাস্তা ওই গ্রামের দিকে গিয়েছে কি না,' সে অবশ্যই উত্তর দেবে 'না'। কিন্তু, দার্শনিক তাকে বিপাকে ফেলেছেন প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন করেই। দার্শনিকের প্রশ্ন হল এইরকম যে রাস্তা গ্রামের দিকে গিয়েছে এই প্রশ্ন করলে সে কি 'হ্যাঁ' বলবে? কিন্তু ওই প্রশ্নের উত্তরে সে বলত 'না'। অতএব, মিথ্যা বলতে হলে তাকে 'হ্যাঁ' বলতেই হবে। ঠিক উল্টো যুক্তি দিয়ে পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে যদি দার্শনিকের নির্দেশ করা রাস্তা গ্রামের দিকে না যায়, সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী — দু'জনেই কিন্তু দার্শনিকের প্রশ্নের উত্তর সে-ক্ষেত্রে দেবে 'না'। সুতরাং দার্শনিক যদি উপরোক্ত প্রশ্নটি করেন, তবে তাঁর নির্দেশিত রাস্তা ঠিক হলে তিনি দু'জনের কাছেই উত্তর পাবেন 'হ্যাঁ' আর ভুল হলে, 'না'। দার্শনিক কিন্তু আর একটা প্রশ্নও করতে পারতেন, যার উত্তর শুনেও তিনি বুঝতে পারতেন তাঁকে কোন্‌দিকে যেতে হবে। সেটা কি কেউ বলতে পার?

সমাধান - ২

নকল পয়সার সমস্যা

মাত্র একবার। শুনতে ভারি আশ্চর্য, তাই না? দশটি থলিকে ১ থেকে ১০ সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করে নাও, মনে মনে করলেও চলবে। এবার ১নং থলি থেকে ১টি, ২নং থলি থেকে ২টি.....এবং ১০ নং থলি থেকে ১০টি আধুলি নেওয়া হল। অর্থাৎ মোট ৫৫টি আধুলি নেওয়া হল। তাদের এবার ওজন করা যাক। এই ৫৫টি-ই যদি আসল পয়সা হত, তাদের ওজন কি হত, তা আমরা জানি। নকল আধুলির প্রতিটির ওজন আসল আধুলির চেয়ে এক গ্রাম করে বেশি। অতএব, ১নং থলিতে যদি নকল আধুলি থাকে, তবে এই ৫৫টি আধুলির প্রকৃত ওজন ৫৫টি আসল আধুলির ওজনের চেয়ে ১গ্রাম বেশি হবে। কারণ এই ৫৫টির মধ্যে মাত্র ১টিই আছে ১নং থলি থেকে। ২নং থলিতে যদি নকল আধুলি থাকে, তবে এই ৫৫টি আধুলির প্রকৃত ওজন ৫৫টি আসল আধুলির ওজনের চেয়ে ২ গ্রাম বেশি হবে ইত্যাদি।

সমাধান - ৩

এক মিনিটে উত্তর চাই

(এক) $১^২ = ১, ২^২ = ৪, ৩^২ = ৯, ৪^২ = ১৬, ৫^২ = ২৫, ৬^২ = ৩৬, ৭^২ = ৪৯, ৮^২ = ৬৪, ৯^২ = ৮১$ এবং $১০^২ = ১০০$ অতএব, যে সংখ্যার শেষে ১, তার বর্গ করলে শেষ অঙ্কটি হবে ১, যে সংখ্যার শেষে ২, তার বর্গ করলে শেষ অঙ্কটি হবে ৪ ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কোনও পূর্ণসংখ্যার বর্গের শেষ অঙ্কটি হতে পারে ১,৪,৫,৬,৯ অথবা ০। কোনও পূর্ণসংখ্যার বর্গ কখনও ২,৩,৭ বা ৮ দিয়ে শেষ হতে পারে না। প্রশ্নে সংখ্যাটি অতএব, পূর্ণবর্গ হতে পারে না।

(দুই) ঠিক দু'মিনিট আগে, কারণ পোকার সংখ্যা প্রতি দু'মিনিটে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

সমাধান - ৪

সুলতানী আমলের এক পথিক

মাত্র একটি লিঙ্ক। বাঁ অথবা ডান দিক থেকে তৃতীয়টি। তার ফলে পথিকের চেনটি তিন টুকরো হয়ে যাবে। একটি টুকরো হবে এই কাটা লিঙ্কটি (তৃতীয়), একটি টুকরোয় থাকবে দু'টি লিঙ্ক এবং আর একটি টুকরোয় থাকবে চারটি লিঙ্ক। প্রথম দিনের শেষে পথিক সরাই মালিককে দেবে একটি লিঙ্ক; দ্বিতীয় দিনের শেষে সেটি নিয়ে নিয়ে পথিক সরাই মালিককে দুটি লিঙ্ক-এর টুকরোটি দিয়ে দেবে। তৃতীয় দিনের শেষে সরাই মালিক আবার ওই

একটি লিচু পাবে, চতুর্থ দিনে পথিক আগের তিনটিই ফেরত নিয়ে চারটি লিচু-এর টুকরোটি নিয়ে নেবে সরাই মালিককে এবং তারপরে, পঞ্চম দিনের শেষে আবার একটি লিচু নেবে। ষষ্ঠ দিনের শেষে পথিক আবার ওই একটি লিচু ফেরত নিয়ে সরাই মালিককে দু'টি লিচু-এর টুকরোটি দেবে এবং শেষ দিনের (সপ্তম দিনের) শেষে ফের ওই একটি লিচু-এর টুকরোটি ফেরত নিয়ে নেবে।

সমাধান - ৫

যাদুকরের এক কারসাজি

যে কোনও সংখ্যা নাও ক খ। অতএব, সংখ্যাটির মান ১০ ক + খ। তার থেকে ক ও খ-এর যোগফল বাদ দিলে থাকে ৯ক। একে ৯ দিয়ে ভাগ করে ফেললে আসবে ক সংখ্যাটি। তাকে ১০ দিয়ে গুণ করলে পাব ১০ ক এবং তার থেকে খ বাদ দিয়ে আসবে ১০ ক - খ। যাদুকর এই সংখ্যাটি যেই জেনে গিয়েছেন, তাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন তার ঠিক পরবর্তী দশের গুণিতক থেকে, কারণ সেটা ১০ ক হতে বাধ্য (যেহেতু খ ০ থেকে ৯-এর মধ্যে একটি অঙ্ক হতে বাধ্য) এবং, তারপরে, সেই বিয়োগফলকে দ্বিগুণ করে বলা সংখ্যা (অর্থাৎ, ১০ ক - খ)-এর সঙ্গে যোগ করেছেন।

১০ক - (১০ক - খ) = খ

(১০ ক - খ) + ২খ = ১০ক + খ, যে সংখ্যা প্রথমে ভাবা হয়েছিল।

সমাধান - ৬

বিজোড় সংখ্যা

১ থেকে শুরু করে যে কোনও সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার যোগফল বার করা যায় নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে :

[১ ম (২ম +১)]/২ - ২ [ম (ম+১)]/২, যেখানে ম = ১, ২, ৩.....।

ব্যাপারটি আরও বিশদভাবে বলা যাক। ১ থেকে শুরু করে ম-সংখ্যক বিজোড় সংখ্যা হল ১, ৩, ৫, ৭,.....(২ম - ১)

অতএব, ১+৩+৫+৭+.....+ (২ম - ১) হল প্রথম ম-সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার যোগফল।

কিন্তু ১+৩+৫+৭+৯+.....+ (২ম - ১)

= (১+২+৩+৪+৫+৬+.....+ ২ম) - (২+৪+৬+৮+১০+.....+ ২ম)

= (১+২+৩+৪+৫+৬+.....+ ২ম) - ২ (১+২+৩+.....+ ম)

এখন, অঙ্কের সূত্র হল, যে-কোন প্রথম ম-সংখ্যক (অর্থাৎ ১ থেকে শুরু করে ম-পর্যন্ত) পূর্ণসংখ্যার যোগফল ম (ম+১)/২

অতএব, উপরের রাশিটির মান [২ম (২ম+১)]. ২ - [২ম (ম+১)]/২ = ২ম' + ম - ম' - ম = ম'। অতএব, সমস্যায় উল্লিখিত সূত্রটি শুধু প্রথম তিন-চারটে নয়, যে কোনও সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এই সমাধানটিও অন্যভাবে করা যেতে পারে।

সংখ্যার আরও মজা

পর পর চারটি পূর্ণসংখ্যাকে সব সময়ই (ম+১), (ম+২), (ম+৩) এবং (ম+৪) হিসাবে দেখানো যায় [ম = ০, ১, ২,.....যে কোনও পূর্ণসংখ্যা]।

অতএব, পরপর চারটি পূর্ণ সংখ্যার গুণফল এবং ১-এর যোগফল হল (ম+১) (ম+২) (ম+৩) (ম+৪) + ১ = [(ম+১) (ম+৪)] [(ম+২) (ম+৩)] +১ (যদি সংখ্যাগুলিকে একটু সাজিয়ে নেওয়া যায়) = [ম'+৫ম+৪] [ম'+৫ম+৬] +১

= [ক+৪] [ক + ৬] +১ [যদি ম'+৫ম = ক ধরে নেওয়া যায়]

= ক'+১০ক+২৪+১ = ক'+১০ক+২৫ = ক'+২x৫xক +(৫')

= (ক+৫)' = (ম'+৫ম+৫)' = একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা [কারণ, ম', ৫ম সবই পূর্ণসংখ্যা]।

With Best Compliments From

Phone : 55084

RAMPURHAT COOP. LARGE SIZED MARKETING SOCIETY LTD.

Estd. 1960, Regd. No. – 8/1960 Birbhum
H. O. : Samabaya Bhaban, Dhuladanga Road
P.O. Rampurhat, Dist. Birbhum

Branches :
● VIVEKANANDA ROAD ● NISCHINTAPUR

রামপুরহাট ব্লক ২ এগ্রিল. প্রাই. মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

ডঃ কুন্ডরং ও খোলা রোড (মাড়গ্রাম মোড়)
পোঃ রামপুরহাট :: জেলা - বীরভূম
রেজিঃ নং - ৫ :: তাং - ৭/১০/৭৪

অফিস ও দোকান :
ডঃ কুন্ডরং ও খোলা রোড
রামপুরহাট, বীরভূম

শাখা অফিস :
বিবেকানন্দ রোড
রামপুরহাট, বীরভূম

অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিজাত যন্ত্রপাতি ও সিমেন্টের ঘুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা।

কালীপ্রসাদ ঘোষ
চেয়ারম্যান

গোলাম আলী
সেক্রেটারি

সকলকে জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

রামপুরহাট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

রেজি. হেড অফিস : রামপুরহাট (টেলিফোন : ৫৫-১৮৪)
পোঃ রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম
শাখা অফিস : কোটাসুর (বর্তমানে মল্লারপুর)
সাব অফিস : মুরারই/নলহাটি

রামপুরহাট মহকুমার গ্রামীণ উন্নয়নে এই ব্যাঙ্ক ১৯৭৪ সাল থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে কৃষি, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও ক্ষুদ্র শিল্প, পরিবহন ও গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরল সুদে ঋণ দানের এক অগ্রণী ও সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া, এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে ১/২%, মেয়াদি আমানতের ক্ষেত্রে ১% বেশি সুদ দিয়ে থাকে।

WITH BEST COMPLIMNTS FROM

NORTH SUBURBAN WHOLESALE CONSUMERS' COOPERATIVE SOCIETY LTD.

(Regd. No. 288/24 Parganas, Dt. 29.2.64)

458/B, Jessore Road, Calcutta - 700 074
Phone No. : 551-3569

VISIT AND COLLECT YOUR DAILY NECESSITIES FROM OUR SAMABAYIKA SITUATED AT

Nagerbazar Samabayika	551-5169
2. Birati Samabayika	512-5435
3. Baranagar Samabayika	577-2638

L. B. Koirala	Benoy Bhusan Chanda	Ajit Kumar Ganguli
Chief Executive Officer	*Vice-Chairman*	*Chairman*

With Best Compliments From :

DURGAPUR FERTILIZER EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

FERTILIZER FACTORY (HFC)
DURGAPUR - 713 212

RADHA NATH CHATTERJEE
Chairman

SWAPAN MUKHERJEE
Secretary

MANIK KONER
Manager

NAREN MUKHERJEE
Accountant

ভাটপাড়া- নৈহাটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

প্রধান শাখা : ৩, মুখার্জি পাড়া রোড,
প্রশাসনিক কার্যালয় : ৩৭/১, পূর্ব বোসপাড়া রোড, ভাটপাড়া, ফোন : ৫৮১-৪৪৯৬
শাখা : নৈহাটি, নর্থ গরিফা, শ্যামনগর

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বৃহত্তম সমবায় ব্যাঙ্ক

জমা প্রকল্প

ফিক্সড ও ডবল ডিপোজিট ☆ রেকারিং, সেভিংস, পিগ্‌মি ও কারেন্ট ডিপোজিট ☆
ক্যাশ সার্টিফিকেট ☆ মাসিক আয় প্রকল্প ☆ গৃহবধূ জমা প্রকল্প ☆ ছাত্র বন্ধু জমা প্রকল্প

ঋণ প্রকল্প

গৃহ নির্মাণ ☆ ব্যবসা ☆ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ☆ ট্রান্সপোর্ট ☆ স্বনিযুক্তি ☆ আমানতের উপর ঋণ ☆ এন এস সি / কে ভি পি/ইউ টি আই/এল আই সি-র উপর ঋণ ☆ স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকি ঋণ ☆ ক্যাশ ক্রেডিট ☆ কনজিউমার ডিউরেবেল সার্ভিস সিকিউরিটি লোন ☆ মেডি-ইজ লোন ☆ স্ত্রী কল্যাণ ঋণ ও ফাস্ট-ফরওয়ার্ড

অন্যান্য সুবিধা

এম আই সি আর চেকের সুবিধা ☆ সেফ ডিপোজিট লকার ☆ পুরী, গ্যাংটক, সিমলা, হরিদ্বার ও দীঘায় হলিডে হোম ☆
গিফট চেক ☆ সকল শাখায় কম্পিউটার পরিষেবা

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

প্রকাশিত

পুস্তক ও ক্যাসেট তালিকা

লোকায়ন চর্চার ভূমিকা	অরুণকুমার রায় ।। ৩০ টাকা
লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব	পবিত্র সরকার ।। ২৫ টাকা
সাঁওতাল কাহিনী বনবীর গাথা	লোকনাথ দত্ত (অরুণ চৌধুরী) সম্পাদিত ।। ৫০ টাকা
লোককথা	দিব্যজ্যোতি মজুমদার ।। ৪০ টাকা
ছৌ	ইন্দ্রাণী দত্ত সৎপথী ।। ৪০ টাকা
ডোমনি	সুবোধ চৌধুরী ।। ৬০ টাকা
লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধপঞ্জি	পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত ।। ১০০ টাকা
লোকসংস্কৃতি বনাম উচ্চমার্গীয় শিল্প	প্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।। ৬০ টাকা
গ্রাম নামের উৎপত্তি ঃ বাঁকুড়া	রামশংকর চৌধুরী ।। ২৫ টাকা
ভাওয়াইয়া	সুখবিলাস বর্মা ।। ১২৫ টাকা
বস্তুবাদী বাউল	শক্তিনাথ ঝা ।। ২০০ টাকা
গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ	দিনেন্দ্র চৌধুরী ।। ২০০ টাকা
ঝুমুর	নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ।। ৭০ টাকা
টুসু	শান্তি সিংহ ।। ১৫০ টাকা
'লোকশ্রুতি' প্রবন্ধ সংকলন	মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত ।। ২০০ টাকা
সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ	মালিনী ভট্টাচার্য সম্পাদিত ।। ২০০ টাকা
লোকশ্রুতি - ১২, ১৩, ১৪	প্রতিটির দাম ।। ২৫ টাকা
লোকশ্রুতি ১৫	৪০ টাকা
Santhal Architecture	Rs. 200.00

** ক্যাসেট - ঝুমুর গান ১ ও ২, লালনের গান ১ও ২
মরমী গান, ভাওয়াইয়া **

প্রতিটির মূল্য - ৩৫ টাকা

ফাই সি ৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রবন্ধ

‘শেষ’-এর কবিতা

শান্তনু মিত্র

‘শেষ’-এর কবিতা শোনাতে চাইলে শ্রোতার বড় অভাব — তরুণ শ্রোতারা তারুণ্যের দর্পে সে-কবিতা শুনতে নারাজ, কচিকাঁচাদের বোধের দুয়ারেও সে-কবিতার করাঘাত ব্যর্থ আর বার্ধক্যে উপনীত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেও সে-কবিতা এবং কবি উভয়েই অভিশাপ কুড়িয়ে মরে, কারণ সে-মজলিসে এ-কবিতা অযোষ বিষাদ এবং অতি-নিকট এক অপ্রিয় ভবিষ্যতের ভাষ্য। তবু ‘শেষ’ আছে সুখের সময়ের ও দুঃখের দিনগুলির, স্বপ্নের এবং দুঃস্বপ্নের, প্রসববেদনার এবং মৃত্যুযন্ত্রণার, চলার পথের এবং থেমে থাকার, দিন এবং রাতের। অর্থাৎ, এক কথায় ‘শেষ’ হল জীবনের এক সত্য, শেষসত্য না-হলেও। সেই সত্যকে অস্বীকার করে জীবনের পথে চলা সম্ভব নয়, সেই অস্বীকার করার প্রলোভন যতই মোহময় হোক না কেন। ‘শেষ’-এর মধ্যেও প্রারম্ভের সেই সুর বাজে যা সমগ্র অস্তিত্বের মূলসুর — এই কথাটি আমরা ভুলে যাই বারে বারে। তাই কবিগুরু বলেছেন,

‘শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদন আনে।।’

‘শেষ’ শুধু শেষ নয়, সে যে বিশেষ এক ‘শেষ’-এর সুরেই আর-এক প্রারম্ভের আবাহনের সুরমূর্ছনা। তাই শেষ বেলাকার শেষের গানে যে-বেদনা, সেই বেদনার করুণ রাগেই ভোরের বেলার আবাহন, নূতন দিনের প্রথম সূর্য রশ্মিতেই গত দিনটির সমাপ্তির ঘোষণা আর অনাগত অথচ আগত-প্রায় এক উজ্জ্বল দিনের একথা।

‘শেষ’-ই যে এই বিশ্বসংসারের শেষ সত্য নয়, সে-কথা প্রকৃতি বলে চলেছে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাতে, প্রতিটি সকাল আর প্রতিটি সন্ধ্যায়। তবুও সংসারের সংকীর্ণতা আর কোলাহলে বন্দি মানব শুনতে পায় না সে-কথা — যন্ত্র মানবের দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে না শেষ হওয়ার সম্পূর্ণতা, সেই সম্পূর্ণতা যার ভিত্তিভূমিকে আশ্রয় করেই দাঁড়িয়ে থাকে পরবর্তী কোনও এক প্রারম্ভ — এ-পথেই আমরা চলেছি আদি-অন্তহীন সময়ের স্রোত বেয়ে, তবুও ‘শেষ’ কথাটিকে আমরা আজও ভয় পাই, মনের মধ্যে তার সম্পর্কে কোন ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করি না। কবিগুরুর মতো এ-কথা আমরা এখনও বলতে শিখিনি যে ‘শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?’

একই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে রবীন্দ্রনাথ আবারও বলেছেন,

‘ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।’

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুসম যে কালকণার একক মানব সভ্যতার সৃষ্টি, তার শেষ আছে, আছে আরম্ভ, তার আদি আছে, আছে অন্ত। কিন্তু, প্রকৃতির রাজ্যে যা-কিছু বৃহৎ, যা-কিছু মহৎ, তার না আছে আদি, না আছে অন্ত। তাই মহাকালের শুরু বা শেষ আমরা কল্পনাতেও আনতে পারি না। মহাবিশ্ব-মহাকাশও আমাদের কাছে অনাদি-অনন্ত। প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিটি নিয়ম অনাদি কাল থেকে পালিত হয়ে আসছে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ-ধরে পালিত হয়ে চলবে। মানবসভ্যতা তার নিজের সুবিধার জন্য সময়ের একক সৃষ্টি করেছে এবং সেই সসীম কালবিন্দুর নিরিখে শুরু এবং শেষ-এর হিসাব করে চলেছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির ক্ষেত্রে শেষ হওয়ার অর্থ নয় ফুরিয়ে যাওয়া, সবসময় চোখে থাকে ফুরিয়ে যাওয়া বলে মনে হয়, তা কেবলই অবস্থান্তর — ‘অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।’

সাধারণ দৃষ্টিতে মৃত্যুতেই একটি জীবনের ‘শেষ’, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের এই পৃথিবীতে উপস্থিতির সমাপ্তি। একটি ব্যক্তির দেহী অস্তিত্ব সম্পর্কে এ-কথা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য। কিন্তু, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার দেহী অস্তিত্বই কি পরম প্রাপ্তি বা চরম পূর্ণতা? সোজা কথায়, মানুষ কি একমাত্র তার দেহী অস্তিত্বের মধ্যেই বেঁচে থাকে? আমরা অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখলে, মৃত্যুতে আত্মার মুক্তি — নূতন পথে যাত্রার স্বাধীনতা, জীর্ণ পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে। অন্য সন্দেহবাদী মন যদি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখতে না পারে, অন্তত এ-টুকু স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে একটি ব্যক্তির দেহী অস্তিত্বের পরিসমাপ্তিতে শেষ নয় তার স্মৃতির, তার কীর্তির। আর তা-ছাড়া, পৃথিবীর বৃহত্তর স্বার্থে, এক জীবনের সমাপ্তিতে আর-এক জীবনের জন্য আবাহনী শূন্যতা।

‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ড) ‘শেষ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি অভিনব উপমা দিয়েছেন যা উদ্ধৃত না করলে ‘শেষ’ সম্পর্কে তাঁর ধারণার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। তিনি লিখেছেন, ‘বস্তুত, কবিতা যখন শেষ হয়ে যায় তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা, কোনো ভালো কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না — যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে — এই নিঃশেষে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।’ একটি ব্যক্তির জীবনও

পরম শক্তিমান ঈশ্বরের স্বহস্ত-রচিত, স্বকপোল-কল্পিত একটি কবিতা। জীবনের 'শেষ' বলে যে মৃত্যুকে আমরা জানি, সেই মৃত্যুর মধ্যে ওই কবিতার শেষের রেশ, নিঃশব্দ ছন্দব্যঞ্জনা। একটি কবিতার মধ্যে শব্দ চলে ছন্দের দোলায় চেপে, একটি নির্দিষ্ট ভাবের পথে — প্রথম হতে শেষ অবধি তার একই প্রধান সুরের খেলা প্রারম্ভ থেকে পরিণতির অভিমুখে। কবিতার প্রারম্ভে প্রথম ছত্রের অস্তিত্ব নিরালম্ব নয়, এই বিপুলা বিশ্বের জল-স্থল-আকাশ-বাতাস-প্রকৃতি-প্রাণ-এর কোনও এক অন্তস্তলই তার অবলম্বন, তার উৎসমুখ। ঠিক তেমনই, কবিতার শেষ ছত্রটির শেষ শব্দটিও 'শেষ'-কথা নয় — তার গতিমুখ সে-রকমই আর-একটি সৃষ্টিকোণ। জীবন-কবিতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সৃষ্টিকোণ আমাদের চোখের আড়ালে পড়ে যায় কারণ চোখে ঠুলি পরা থাকলে পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড় যে সূর্য সে-ও দৃষ্টিপথে ধরা দিতে অস্বীকার করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তির জীবন-কবিতার যে বিশেষ ব্যঞ্জনা আপনাকে প্রকাশ করে নিঃশব্দে, তা ওই 'শেষ' মুহূর্তের রেণুটুকুতেই সম্ভব। শুধুই কি তাই? একটি জীবন তার কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে এ-বিশ্বের চিরন্তন জীবন-প্রবাহে যে ছন্দের অনুরণন সৃষ্টি করে, তারও কি 'শেষ' হয় মৃত্যুতে? সে অনুরণন বেঁচে থাকে তার কীর্তিগাথায়, সুরের ও নিকটের মানুষের উপর তার প্রভাবে এবং সর্বোপরি এই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলার লক্ষ্যে সন্ধানের জন্মদানে।

'শেষ' হওয়ার অর্থ নয় অবসান। যা শেষ হল, তা শুধু থামল — নূতন করে নূতন পথে চলার লক্ষ্যে। এই থামারও প্রয়োজন আছে, যেমন প্রয়োজন আছে কাজের পরে বিশ্রামের, দিনের ক্লান্তির পর রাত্রের নিদ্রার এবং বাক্য অথবা বাক্যাংশের পর যতিচিহ্নের। থামতে হয় বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য, থামতে হয় লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পুরাতনকে বিশ্লেষণ করে নূতনকে নূতনভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং থামতে হয় যাত্রাপথে সঠিক দিক্‌নির্দেশ পাওয়ার জন্য। এই থামার মধ্যে কোন অগৌরব নেই, নেই লজ্জা, নেই পরাজয়ও — এ শুধু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে মেনে নিয়ে নিজেকে পূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে চলা। কোনও থামা সামান্য সময়ের জন্য, কোনও থামা একটু বেশি সময়ের জন্য, কিন্তু কোনও থামাই চিরকালের জন্য থামা নয়। কোনও থামার উদ্দেশ্য কোনও একটি কাজে পূর্ণতার লক্ষ্যে চলতে গিয়ে সাময়িক বিশ্রামের জন্য বা সঠিক দিক্‌নির্দেশ পাওয়ার জন্য থামা আর কোনও থামা ক্ষুদ্রতর লক্ষ্যে পূর্ণতা লাভের পর বৃহত্তর লক্ষ্যে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে থামা। তাই থামতে অস্বীকৃত হওয়ার অর্থ পূর্ণতাকে অস্বীকার করা। পূর্ণতাকে অস্বীকার করার এই শূন্যতা সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কোনো-একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে এ-কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে, তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিস বলে মনে করে। ভোগ যা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।' এদের সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, 'থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না ; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।'

আমাদের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি', অর্থাৎ, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। কিন্তু, সে-চলা শুধু চলার জন্যই নয়, সে-চলা এক লক্ষ্যের অভিমুখে — নদী যেমন এগিয়ে চলে মোহনার অভিমুখে, যে মোহনায় তার পূর্ণতা। পূর্ণতার সাধনাই সাধনা কারণ সে-সাধনার লক্ষ্য আছে, লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রান্তির আনন্দ আছে আর আছে হয়ে ওঠার অভিব্যক্তির প্রকাশ। কিন্তু যে-চলা শুধুমাত্র চলার জন্যই, তাতে সেই সহজ আনন্দ ও অভিব্যক্তির প্রকাশ নেই, তাতে আছে শুধুই অপ্রাপনীয়কে না পাওয়ার বেদনা, খেদ ও হতাশা। তাই এগিয়ে চলতে হবে, কিন্তু লক্ষ্যকে স্থির রেখে এবং সাধনা করতে হবে, কিন্তু কিছু হওয়ার লক্ষ্যে। দিনের পর দিন চলতে চলতে সম্পদ ও ক্লান্তির সঞ্চয়ই শুধু বেড়ে ওঠে, তাকে ব্যয় করার সময় পাওয়া যায় না — অবশেষে সেটা মদের নেশার মতো পেয়ে বসে মানুষকে, আচ্ছন্ন করে ফেলে তার মনুষ্যত্বকে, প্রভুর দিয়ে বাড়িয়ে তোলে তার কার্পণ্যকে। তাই, চলার পথে থামতে হবে, সঞ্চয় অহেতুক বেড়ে উঠলে তাকে ত্যাগ করতে জানতে হবে, নচেৎ সেই সঞ্চয়ের চাপে মনুষ্যত্ব মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মূঢ় মানবের সমস্যা এইখানেই যে তার চোখের সামনে তার সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা এমন মাথা-উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, তার চোখে এই সমস্যাটা অনেক সময়ই ধরা দেয় না। তার কাছে 'ত্যাগ' একটি হাস্যকর কথা, দুর্বলের দুর্বলতা ঢাকার এক অক্ষম প্রয়াস মাত্র।

কিন্তু ত্যাগ রিক্ততা নয়। রিক্ত মানুষের ত্যাগ করার ক্ষমতা নেই, তাই ত্যাগের কথা বলার অধিকারও নেই। ত্যাগ করতে পারে একমাত্র সে-ই যার কিছু আছে। সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা আমাদের এই ত্যাগের মাহাত্ম্য শিখিয়েছে, জীবনে ভোগ এবং ত্যাগের সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলেছে। তাই যে-সভ্যতা কামকলাকে শাস্ত্রের অভিধায় অভিহিত করেছে, সেই সভ্যতাই বলেছে 'পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ'। সংসার থেকে প্রথম থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার শিক্ষা নয় ভারতবর্ষের — সে বার-বার বলেছে যে সংসারের মধ্যে যারা রয়ে গিয়েছে তাদেরও মুক্তির পথ আছে, সংসারের অজস্র ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতেও তাদের দীক্ষিত হতে হবে ত্যাগধর্মে আর তারই মাধ্যমে তারা উচ্চতর চিন্তার জগতে উন্নীত হবে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েছেন, 'আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এইজন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এইজন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।' সোজা কথায়, চলার পরিণতি হওয়ায় এবং হয়ে ওঠার মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব নিহিত ; সেই হয়ে ওঠাতেই মানুষের 'সমাপ্ত ভাবটি', 'স্থির রূপটি' দেখতে পাওয়া যায় এবং তার জন্য থামার প্রয়োজন আছে, ত্যাগ করতে জানার প্রয়োজন আছে।

আর, ত্যাগের এই মাহাত্ম্য থামার এই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন না হলেই মৃত্যু সেখানে বিভীষিকাময়, 'শেষ' সেখানে 'চির-শেষ' হিসাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, হেয় এবং অপাংক্তেয়। আর, সেই জন্যই, সেখানে সম্পূর্ণতা নেই, সম্পূর্ণতার বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র সেখানে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বললেই হয়, সেখানে কেবলই প্রসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে জায়গায় আসে সে জায়গায় কিছুই পায় না, কেবল লজ্জা পায় —

সেখানে কাজ একটা মনের মতো, ফুরোলেই অবসাদ সেখানে উত্তরাধে মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ বাসনা নেই ; সেখানে মৃত্যুর জন্য অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।'

তাই 'শেষ' হয়ে যাওয়ার প্রশ্নে যদি মন আকুল হয়ে ওঠে, মনকে জানাতে হবে 'শেষ' মানে 'শেষ' নয় — আর-এক প্রারম্ভের গোপনা অন্তরিত সেই 'শেষ'-এ আর সেই গোপনাকে খুঁজে নেওয়াতেই জীবনের সার্থকতা। পরম শক্তিময় ঈশ্বর হলেন 'অন্তহীন ইতি' আর সেই অনন্ত ইতিকে উপলব্ধি করতে হবে শেষযাত্রার পূর্ব মুহূর্তেও। তবেই বুঝতে পারব যে তাঁর ইচ্ছাই **শেষ কথা, জীবনের শেষেও তাই, শুরুতেও তাই।** অতএব, পৃথিবীতে আসার সময় যেমন এসেছি পরম নির্ভরে মানব পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে, তেমন যাওয়ার সময়েও যেতে হবে পরম নির্ভরে পরম শক্তিময় পিতার উপর নির্ভর করে — সে-পরলোক আমাদের পরিচিত না হতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে সবই চেনা, সবই জানা। মৃত্যুতে আমরা শুধু আর করে চলেছি অনন্তের পুরাতন লীলাভূমি যেখানে এতদিন, সারাটি জীবন ধরে, আমরা অধিকার পেয়েছি, পেয়েছি এবং ভুল করে ভুলেছি। কিন্তু কোনও অধিকারই চিরস্থায়ী নয়, না মানুষের রাজ্যে, না ভগবানের রাজ্যে। অতএব, একদিন অধিকার ত্যাগ করতেই হবে এবং যাবার দিনের বেলা কম করতে গেলে সে-তাগের প্রস্তাব আগে থেকে করতেই হবে। খুঁটিয়ে নিতে হবে শেষ আর শুরুর মধ্যে মানুষের মনে তৈরি করে রেখা মানসিক পার্থক্য — জেনে নিতে হবে যে এরা একই সৃষ্টিলীলার দুটি কল এবং সেই সৃষ্টিলীলার নাম হল অস্তিত্ব। তবেই দেখতে পাব,

ফেরার ফেরায় যে কথাখানি
চোখে চোখে যেত কিরকি হানি
সেই প্রভাতের লীন বাণী
চলেছে তারার স্বপন-পানে

পরের পৃষ্ঠায়

শারদীয় শুভেচ্ছা সহ

জলপাইগুড়ি কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লি.

জলপাইগুড়ি

প্রদ্যুৎ বিশ্বাস
সভাপতি

ভবতোষ রায়
সম্পাদক

Enjoy Your Holidays At Gangtok, Puri
&
Stay in our Holiday Home

* Attractive Location
* Newly constructed Building
* Sophisticated Amenities
* Cable T.V. Facility
* Generator / L.P. Gas facility (at Puri)
* Moderate Rate

For Details Please Contact

COAL MINES AUTHORITY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

"COAL HOUSE"
13, R. N. Mukherjee Road, Calcutta - 700 001
Phone : 248 6266

অগ্রগতি ও সংহতির ২৩ বছর

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২৩ বছরে যুগান্তকারী ভূমিকা নিয়েছে। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত ও সুস্থায়ী করতে রাজ্য সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ গড়েছে সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

- শিল্পের পুনর্জাগরণে রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত
- বিদ্যুৎ সড়ক যোগাযোগ সহ প্রতিটি পরিকাঠামোর অভাবনীয় উন্নতি
- জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকরী ও নিয়মিত উদ্যোগ
- পর্যটন শিল্পের প্রসারে সুপরিকল্পিত ভূমিকা
- কৃষিজ উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও প্রাণীসম্পদ বিকাশে আশাতীত সাফল্য
- ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমিসংস্কারে নজিরবিহীন কৃতিত্ব
- গ্রামীণ জীবনের মান উন্নয়ন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি
- শিক্ষা, সংস্কৃতি ও লোককৃষ্টির সার্বিক বিকাশ
- নগর উন্নয়ন ও আবাসন ক্ষেত্রে জনমুখী প্রয়াস
- পরিবেশ উন্নয়নে আশাব্যঞ্জক ভূমিকা
- আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ
- জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় নিরলস উদ্যোগ

সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াস নিরন্তর

আই সি এ-৩৩৭২/২০০০

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION
GIVES YOU SAFETY
AND SECURITY

HENCE GROW YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 80 years by a net work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH
BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK
FOR
YOUR SAFETY

(0342) 62-163 / 169 / 165
63-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OPERATIVE MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

☎ (০৩৩) ৬৮০-২৪০০
৬৮০-২৯৪৯

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড ঃ চুঁচুড়া ঃ হুগলি - ৭১২ ১০১

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — হুগলি ও [illegible]
দুই পুরীষের মহামিলনে তিন দশক আগে (১৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের।
তারপরের ইতিহাস শুধু সংগ্রাম ও সাফল্যের।

(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

তারিখ	সমবায় সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায়ভুক্ত শাখা সংখ্যা	অংশগত মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
৩০-০৬-১৯৯৬	৪৫৯	৩৮	৪	৫.৩৮	১২.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
[illegible]	৮৪৭	১০৬	১৩	১০৮.১১	১১০৫.৪২	৪৭৫.১২	(-) ২৩.৩৩
[illegible]	১১৮৩	১৮৭	১২	৩৯২.২২	১৩১৭.১৪	৭৫০৫.০০	(-) ১৯৪.৭৭

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, ভাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খানারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, [illegible]পুর, চণ্ডীতলা ও শ্রীরামপুর শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষিঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী [illegible]নিযুক্তি ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণে ঋণ দাদন করে থাকে। গ্রামীণ সহযোগী সমিতির মাধ্যমে সমাজের দীনের থেকে দীন, নিঃস্বম্বল মানুষদের জন্য স্বাবলম্বনের দিশা জ্ঞানানতবিহীন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ঋণ। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার আরও বারোটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করতে চলেছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

সুবল দাস
সহ সভাপতি

দিলীপকুমার ঘোষ
সভাপতি

এখানে থাকার জন্য পুরীতে মনোরম পরিবেশে অতিথি নিবাসের সুব্যবস্থা আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক : [illegible], পত্রিকাটি [illegible] সমবায় ই ইন্ডিয়ার পক্ষে মহিলা প্রিন্টার্স কর্তৃক ২১৫, নেতাজি সুভাষ রোড (এস্টপ্লানেড), কলিকাতা - ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত ও [illegible] প্রিন্টার্স, ১৮৬ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা - ১২ থেকে মুদ্রিত। মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র